চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৮

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
৭.২—২০।৪।১৯৫১

চন্দ্রনাথ বসু

১৮৪৪—১৯১০

মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিজের জীবনকথা নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনীর উপকরণ-হিসাবে উহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য। এই আত্মকথা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

"সন ১২৫১ সালের ১৭ই ভাদ্র [৩১ আগষ্ট ১৮৪৪] হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা ৺সীতানাথ বসু, পিতামহ ৺কাশীনাথ বসু। ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ হিন্দু বলিয়া সে অঞ্চলে আমার পিতামহের বড় প্রসিদ্ধি ছিল। পিতৃদেবকে পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিতে দেখিয়াছি। আমি তাঁহাদের কাহারও পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারি নাই।

"হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি ভাগীরথীর পশ্চিমকূলস্থিত জেলা সকল তখন অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলিকাতায় পীড়া হইলে আমরা গ্রামে চলিয়া যাইতাম, এবং বিনা চিকিৎসায় তথায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতাম। এবং মহোল্লাসে খাইয়া খেলাইয়া বেড়াইতাম।

স্কুল-কলেজের ছুটি হইলেই দেশে যাইতাম, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত না, ছুটি ফুরাইলে এক মাস দেড় মাস পরে কলিকাতায় আসিতাম—তাও এক রকম কাঁদিতে কাঁদিতে। আমার পুত্র পৌত্রাদি সে গ্রামও দেখিল না, সে গ্রাম্য সুখের আস্বাদও পাইল না। তাহাদের জীবন অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হইল। সে গ্রাম্য-জীবন যাহাদের হইল না, বঙ্গদেশ কি জিনিস তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। তাহারা যথার্থই হতভাগ্য।...

শিক্ষা

"পঞ্চম বর্ষে যথারীতি হাতে খড়ি হইলে পর আমি পাঠশালায় প্রবেশ করি। আমাদের বাড়ীতেই পাঠশালা ছিল।...আমার বয়স যখন আট বৎসর, তখন আমার পিতামহের চারি পুত্রের মধ্যে কেবল কনিষ্ঠ, আমার পিতৃদেব, বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে লইয়া কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন। ইংরেজী শিখাইবার জন্য তিনি আমাকে হেদোর স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন। তখন আমাদের বাসা শিমলার বাজারের প্রায় সম্মুখে। সুতরাং ঐ স্কুলের অত্যন্ত নিকটে ছিল বলিয়াই বোধ হয় তথায় পাঠাইয়াছিলেন। খৃষ্টানদিগের স্কুল, হয়ত আমাকে খৃষ্টান করিয়া ফেলিবে, আমার সর্ব্বদা এই ভয় হইত। আমাদের মাষ্টার নস্য লইতেন, তাঁহার হাতে একটি নস্য-দান থাকিত। আমি মনে করিতাম, উহাতে গোমাংস আছে, কবে জোর করিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিবে। আমার স্বর্গীয় পিতামহীর নিকট এই কথা বলিয়াছিলাম। ছয় মাস মাত্র হেদোর স্কুলে রাখিয়া পিতা আমাকে ওরিয়েন্টল সেমিনরির শাখা-স্কুলে ভর্ত্তি

করিয়া ...ছিলেন। ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরি স্বর্গীয় গৌরমোহন আঢ্যের প্রতিষ্ঠিত, তখন বড়ই প্রসিদ্ধ, এখন খর্ব্ব হইয়াও সুন্দর ভাবে পরিচালিত। তখন উহার দুই তিনটি শাখা ছিল—একটি কলিকাতায়, উহারই নিকটে, আর একটি ভবানীপুরে, আর একটি বেলঘরিয়ায়। মূল ও শাখা-স্কুল কয়টিতে বোধ হয় দেড় হাজার বালক শিক্ষা লাভ করিত। মূল স্কুলে ইংরাজী সাহিত্যের বড়ই আদর ছিল। তজ্জন্য উহার যেরূপ প্রসিদ্ধি ছিল, বোধ হয় কলিকাতার আর কোন স্কুল বা কালেজের সেরূপ প্রসিদ্ধি ছিল না। অঙ্ক ও বাঙ্গালায় তত মনোযোগ ছিল না। এনট্রান্স ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্ব্বে শাখা-স্কুল হইতে মূল স্কুলে গিয়াছিলাম। তাহার কারণ, হেড মাষ্টার মহাশয়কে দুই চারিটা কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি অর্থ জানিতেন না, আমাকে নিরস্ত করিবার জন্য চড় মারিয়াছিলেন। তখন আমার Pope's *Iliad* পড়া হইয়া গিয়াছিল। মূল স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় ('বিবাহ বিভ্রাট'-প্রণেতা আমার স্নেহাস্পদ অমৃতলালের পিতা) আমাকে এত ভালবাসিতে লাগিলেন যে, আমার ক্লাসের কয়েকটি ছেলে আমাকে তাড়াইবার জন্য প্রতি দিন টেবিল চাপড়াইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিয়া গান গাহিত। আমি চুপ করিয়া শুনিতাম—একটি কথাও কহিতাম না, কৈলাস বাবুকেও কিছু বলিতাম না। গানের গোড়াটা মনে আছে—'চতুরঙ্গের কিবা ছিরি মরি হায় হায়। পেট মোটা গলা সরু, বেটা যেন বামণের গরু।' তাহারা দিন কতক এইরূপ করিয়া আপনারাই পলাইয়া গেল। তখন স্কুলের স্থাপয়িতা গৌরমোহন আঢ্য লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ৺হরেকৃষ্ণ আঢ্য মহাশয় স্কুলের অধিকারী ও অধ্যক্ষ—জ্যেষ্ঠের কীর্ত্তি রক্ষণে বড়ই যত্নশীল। উচ্চ শ্রেণীতে তিনি বড় বড় ইংরাজ ও

ইউরোপীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন। প্রসিদ্ধ কাপ্তান রিচার্ডসন, হার্মান জেফরয়, কাপ্তান পামার, উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক, রবার্ট ম্যাকেঞ্জি— এইরূপ লোকে উপরে অধ্যাপকতা করিতেন। আর নিম্নতম শ্রেণীর শিক্ষকতার যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, সেরূপ বোধ হয় আর কোন স্কুলে কখন হয় নাই। বাঙ্গালী বালকের ইংরাজী উচ্চারণ প্রায়ই অশুদ্ধ হয় বলিয়া ওরিয়েণ্টল সেমিনরির নিম্নতম শ্রেণীতে এক জন ফিরিঙ্গি শিক্ষক নিযুক্ত হইতেন। তাহাতে ছোট ছোট ছেলেরা প্রথম হইতেই শুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ শিখিত এবং সংখ্যায় অধিক হইলেও সুশাসনে থাকিত।

"যখন জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ preparatory ক্লাসে পড়ি তখন রিচার্ডসন সাহেব আমাদিগকে দুই এক দিন পড়াইয়াছিলেন। এন্‌ট্রান্সের পাঠ্যের মধ্যে Rogers's *Pleasures of Memory* নামক কাব্য ছিল। প্রথম দিন সাহেব Rogers, Goldsmith, Campbell, Akenside, Thomson প্রভৃতি descriptive কাব্য-প্রণেতাদিগের দোষ-গুণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তেমন কথা আর কখন শুনি নাই। দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহার কাছে দুই চারি দিনের বেশী পড়া হয় নাই—তিনি বিলাতে [?] চলিয়া গেলেন। দুই দিনেই কিন্তু বুঝিয়াছিলাম যে, ইংরাজী সাহিত্যের তাঁহার মতন অধ্যাপক বঙ্গে আর আসেন নাই।

"আমাদের একটি ক্লব ছিল—নাম ওরিয়েণ্টল ডিবেটিং ক্লব। কেবল ছাত্রদিগের ক্লব। আমরা আপনারাই পর্য্যায়ক্রমে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতাম এবং আপনারাই তর্ক-বিতর্ক করিতাম। বার্ষিক অধিবেশনেও আমরাই প্রবন্ধ পাঠ করিতাম।...

"ইং ১৮৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই। কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি

নাই, অঙ্কে ও বাঙ্গালায় এতই কাঁচা ছিলাম। উত্তীর্ণ হইবার পর স্থির হইল যে, আমাকে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে হইবে, পিতৃদেব মাসে দশ টাকা করিয়া বেতন দিয়া আমাকে প্রেসিডেন্সী কালেজে পড়াইতে পারিবেন না। কিন্তু বিধাতা একটু অনুকূল হইলেন। Atkinson সাহেব তখন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষ। তিনি উদারচেতা ছিলেন। হরেকৃষ্ণ বাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ একটি ছাত্রকে আট টাকা মূল্যের একটি ছাত্রবৃত্তি দিবেন। হরেকৃষ্ণ বাবু আমাকে তাঁহার বাটীতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং সাশ্রুলোচনে ঐ কথা বলিলেন। ১৮৬১ সালের প্রারম্ভেই আমি প্রেসিডেন্সী কালেজে ভর্ত্তি হইলাম। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ৺প্যারীচরণ সরকার আমাদিগকে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়াইতেন। অতি অল্প অধ্যাপককেই তাঁহার ন্যায় যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পড়াইতে দেখিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন করিয়া তিনি আমাদিগকে ইতিহাসের প্রশ্ন দিতেন, আমরা বাড়ী হইতে উত্তর লিখিয়া লইয়া যাইতাম, তিনি সেই সত্তর আশী খানা উত্তর সাবধানে সংশোধন করিয়া ফিরাইয়া দিতেন। Carnduff নামক এক জন অধ্যাপকও মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে লেখাইতেন। শুনিতে পাই, ঐরূপ লেখাইবার প্রথা এখন আর নাই। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যাপক কাউয়েলের নিকট পড়িয়াছিলাম। তেমন অধ্যাপক বুঝি আর হয় না—পাণ্ডিত্য যেমন বহুবিষয়ব্যাপক তেমনি প্রগাঢ়, ছাত্রের প্রতি স্নেহ ও যত্ন বর্ণনাতীত। ১৮৬২ সালে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছিলাম, প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন রাসবিহারী। যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন ওরিয়েণ্টল ডিবেটিং ক্লবের ন্যায় প্রেসিডেন্সী

কালেজেও আমাদের একটি ক্লব ছিল। এই ক্লবেও আমরা আপনারাই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতাম, আপনারাই তর্কবিতর্ক করিতাম, বাহিরের লোক আনিতাম না। যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমরা *Calcutta University Magazine* নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলাম। আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ হোসেন বেলগ্রামি, যিনি এখন নিজামের রাজ্যে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ, উহার এক জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ঐ পত্রে **On the importance of the study of history** নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে *Englishman*-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন —**We trust this article is from a native pen, though we doubt it.** আর বলিয়াছিলেন যে, উহাতে খুব **originality of thought** ছিল। এ কথা এত দিন কাহাকেও বলি নাই। এখন বলিতে হইল। কাগজখানি পনের মাসের অধিক স্থায়ী হয় নাই। তাহাও কেবল ৺প্যারীচরণ সরকারের অনুগ্রহে হইয়াছিল। তিনি কাগজখানি আপনার প্রেসে ছাপাইয়া দিতেন।...

"১৮৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে বি. এ. পরীক্ষা দিয়া আমি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম, রাসবিহারী এবং মৃত অধ্যাপক ব্লকমান সাহেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু একবার আমাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি পরীক্ষায় ব্লকমান অপেক্ষা বড় হইয়াছিলে, কিন্তু ব্লকমান আইন-ই-আকবরীর ন্যায় গ্রন্থখানা অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন, তুমি কি কাজ করিলে?" বঙ্কিম বাবু ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন—আমরা কেবল পরীক্ষা দিতে পারি। ১৮৬৬ সালে এম. এ [ইতিহাসে অনার্স] এবং ১৮৬৭ সালে বি. এল পরীক্ষা

দিয়াছিলাম। শেষোক্ত পরীক্ষায় রাসবিহারী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি।

অন্নসংস্থানে

"বি. এল পাস করিয়া সকলে যেমন আদালতে ছোটে, আমিও তেমনই ছুটিয়াছিলাম। চাকরি করিয়া স্বাধীনতা নষ্ট করিব না, তখন মনের ভাব এইরূপ ছিল। কিন্তু হাইকোর্টে গিয়া দেখিলাম, সেখানকার হাওয়া ভাল নয়। মামলা-মোকদ্দমা আমার ভালও লাগিত না। শীঘ্রই বুঝিলাম, অনেকে ন্যায় অন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বৈরসাধনার্থ অথবা জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থনাশ করে, এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হয়, এবং সমাজে বিষম অসদ্ভাব এবং মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। মফস্বল হইতে আমার নিকট মোকদ্দমা পাঠাইবার লোকও ছিল না। মোক্তারদিগের খোশামোদ করিতেও পারিতাম না। ওকালতিতে কিছু হইল না দেখিয়া অগত্যা চাকরির চেষ্টা করিতে হইল। অধ্যাপকতা করিবার ইচ্ছা হইল। তখন উড্রো সাহেব শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি বড় সহৃদয়তা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখন বিদায় গ্রহণ করণার্থ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—'আমি যদি তোমার পিতা হইতাম, তাহা হইলে তোমাকে এ বিভাগে আসিতে নিষেধ করিতাম, এ বিভাগে কাহারও কিছু হয় না।' তেমন করিয়া কথা তাঁহার ন্যায় কর্ম্মচারীরা এখন কহেন কি না জানি না। তিনি পাঁচ সাত দিন পরেই আমাকে কটক কালেজে দুই শত টাকা বেতনের একটি অধ্যাপকতা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু

যখন শুনিলেন যে, আমার একটি ডিপুটী মেজেষ্টরী পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তখন আপনিই বলিলেন—না, অধ্যাপকতা লইও না, ডিপুটী মেজেষ্টরীই লও। ১৮৭৮ সালে ঢাকায় ডিপুটীগিরি করিতে যাই। ডিপুটীগিরি ভাল চাকরি বোধ হইল না। ছয় মাস পরে ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিলাম। আসিবা মাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাকে বলিলেন—জয়পুর কালেজের প্রিন্সিপাল নাই, কান্তিবাবু আপনাকে চান, যাইবেন কি? আমি যাইলাম। জয়পুরের ন্যায় সুন্দর শহর ভারতবর্ষে আর নাই। এক জন ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ছাডিয়া দিলে, জয়পুরের ন্যায় সুন্দর শহর পৃথিবীতে আর নাই। জয়পুর মহারাজ জয়সিংহের স্থাপিত। উহার গঠন-প্রণালী বিদ্যাধর নামক এক জন বাঙ্গালীর উদ্ভাবিত। বিদ্যাধরের গলী বলিয়া জয়পুরে এখনও একটি রাজপথ আছে। জয়পুরের দেবালয়ে বাঙ্গালী পুরোহিতের সংখ্যাই অধিক। জয়পুরের রাজকার্য্যে অনেক দিন হইতে বাঙ্গালীরই প্রাধান্য। দেখিলাম কান্তি বাবুই জয়পুরের প্রকৃত রাজা। জয়পুরে বিস্তর বাঙ্গালী দেখিলাম। ৺যদুনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে একটি বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। বালক-বালিকাসুদ্ধ প্রায় দেড শত বাঙ্গালী ভোজনে বসিয়াছিলাম। জয়পুরে থাকিলে অনেক টাকা করিতে পারিতাম। যেদিন সেখানে যাই তাহার পরদিনই কান্তি বাবু বলিয়াছিলেন—কালেজের কর্ম্মে কিছুই হইবে না, শীঘ্রই আপনাকে শাসন-বিভাগে আনিব। কিন্তু দেখিলাম, রাজসভার হাওয়া বড ভাল নয় এবং আপন স্বাধীনতা রক্ষা করাও কঠিন। শহরটাও দেখিলাম বড় শুষ্ক ও রুক্ষ-দর্শন। তিন দিকে তৃণশূন্য পাহাড়, সমতল স্থান তৃণশূন্য, বারিশূন্য, বালুকাময়। আমি বাঙ্গালার ন্যায়

বিশাল উদ্যানবিহারী, 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং' বঙ্গের বাঙ্গালী, জয়পুরের দৃশ্য আমার ভাল লাগে নাই। তিন মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিলাম—বিধাতাকে বলিতে বলিতে আসিলাম, ঘরেই যেন আমার যৎকিঞ্চিৎ হয়। বিধাতা কৃপা করিলেন। ছুটি ফুরাইবার অগ্রেই বেঙ্গল লাইব্রেরির অধ্যক্ষের পদ খালি হইল। কয়েক জন ঐ পদের প্রার্থী হইলেন। স্যর আল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌ট বলিলেন—চন্দ্রনাথ যদি প্রার্থনা করেন, আর কেহ এ কর্ম্ম পাইবে না। তাঁহার কাছে আমি পড়ি নাই। তাঁহারা কিন্তু উপাধিধারীদের সংবাদ রাখিতেন। তাঁহাদের ন্যায় শিক্ষা-বিভাগের পদস্থ সাহেবেরা এখন রাখেন কি? ১৮৭১ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে আমি ঐ কর্ম্ম পাই। পাইয়া ৭ বৎসর কয়েক মাসে বিস্তর বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়াছিলাম। তাহার পর আমার সহোদর সদৃশ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অতি অকালে স্বর্গারোহণ করায় ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে আমি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হই। অনুবাদকের কাজ যেমন কঠিন, তেমনই অপ্রীতিকর, পরিমাণে প্রায় অসীম। বড় অনিচ্ছায় এই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু গ্রহণ করিবার পর ইহাকে ধর্ম্মচর্য্যার তুল্য ভাবিয়া প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিয়া বিগত ১লা জানুয়ারিতে [১৯০৪] অবসর গ্রহণ করিয়াছি।

মাতৃভাষার সেবা

"গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে বাঙ্গালা শেখা হয় নাই। প্রেসিডেন্সী কালেজে প্রথম দুই বৎসর যাঁহার কাছে বাঙ্গালা পড়িয়াছিলাম তিনি বাঙ্গালী বটে, কিন্তু বাঙ্গালা জানিতেন না। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরীক্ষায় আটক পড়িতে হয় নাই। বাঙ্গালার পরীক্ষা শব্দ-গত না হইয়া এত অর্থ-গত হইত। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে পণ্ডিতবর কৃষ্ণকমল বাঙ্গালা পড়াইয়াছিলেন। ভালই পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু গোড়া কাঁচা ছিল, তাঁহার অধ্যাপনায় বিশেষ ফল পাই নাই। তিনিও সংস্কৃতে বেশ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমাদিগকে সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত আমাদের পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সুতরাং উহাতে তত মনোযোগী না হইয়া, পাঠ্য নয় এমন ইংরাজী পুস্তক বহুল পরিমাণে পড়িতাম। ইংরাজীতে বেশী আকৃষ্ট হওয়ায় মনটাও কতক ইংরাজী-ভাবাপন্ন হইয়াছিল। এক দিকে যেমন দেব-দেবীতে বিশ্বাস ঘুচিয়া গিয়াছিল, অন্য দিকে তেমনই বাঙ্গালা লিখিতে অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। তখন ইংরাজী লিখিয়া বড় সুখ হইত। যখন বি. এ পাস করি নাই তখন ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের *Bengalee* কাগজে লিখিতাম। এম্. এ পাস করিয়াই On the Life and Character of Oliver Cromwell নামক একটি প্রবন্ধ পড়িয়া ছাপাইয়াছিলাম। এইরূপ যাহা লিখিতাম, ইংরাজীতেই লিখিতাম। 'বঙ্গদর্শন' পড়িতে ভাল লাগিত, ইচ্ছা হইত উহাতে লিখি ; কিন্তু লিখিতে সাহস হইত না। তাহার পর বাঙ্গালায় মন গেল, এবং কলিকাতা রিবিউ নামক ত্রৈমাসিক ইংরাজী পত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা [1879, No. 137, pp. xix—xxiv] পড়িয়া বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালা লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন 'বঙ্গদর্শন' সঞ্জীব বাবুর হাতে। 'বঙ্গদর্শনে' অভিজ্ঞান-শকুন্তলের আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করিলাম [জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭···]। কিন্তু লিখিবার পূর্ব্বেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বাল্মীকি প্রেস যে-বাড়ীতে ছিল বাল্মীকির

রামায়ণের অনুবাদক আমার ঋষিতুল্য বন্ধু পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সেই বাসায় থাকিতেন। তাঁহার অনুবাদকার্য্য তখন চলিতেছিল। প্রায় প্রতি দিন সন্ধ্যার সময় আমরা দুই চারি জন তাঁহার নিকট যাইতাম এবং রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত সাহিত্যশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতাম। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের আলোচনাও হইত। শকুন্তলাতত্ত্ব লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরাজী লিখি নাই—লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই—এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃভাষায় লেখার ন্যায় অন্য কোন ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নয়। যখন বাঙ্গালায় লিখি তখন যাহা লিখি সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখি; যখন ইংরাজীতে লিখি, তখন যাহা লিখি তাহার এবং আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে যেন একখানা পর্দ্দা বিলম্বিত দেখি।

"যখন কালেজে পড়ি, তখন আমার দেব-দেবীতে বিশ্বাস ছিল না, আমি সত্যধর্ম্ম খুঁজিতাম। তখন কেশব বাবুর ধর্ম্মান্দোলনের ধুম পড়িয়াছিল; অনেক যুবক তাঁহার চেলা হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কালেজে আমার সঙ্গে তাঁহার কয়েক জন উদ্যমশীল চেলা পড়িতেন। আমি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজে যাইতাম—কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিতাম। কিন্তু তাহাতে Reed, Hamilton, Kant, Victor Cousin প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের কথাই অধিক থাকিত, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। তাহার পর অগস্ত কোমতের দুই একখানা গ্রন্থ পড়ি এবং স্বর্গীয় মহাপুরুষ দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত বন্ধুত্ব হয়। দেখিলাম কোমতের প্রণালীতে আমাদের সমাজ-প্রণালীর অনেক সমর্থন আছে। বড় আহ্লাদ হইল, কিন্তু কোমতের ঈশ্বর নাই দেখিয়া তাঁহাতে আমার তৃপ্তি হইল না। দ্বারকানাথকে বলিলাম।

মহামনা মহাপুরুষ বলিলেন,—তবে জোরে ঈশ্বরকে ধরিয়া থাক। আবার সত্যধর্ম্ম খুঁজিতে লাগিলাম। ইংরাজীতে দেখিতাম, ইংরাজের মুখে শুনিতাম, Religion কেবল ঈশ্বর লইয়া, আর কিছু লইয়া নয়। ভাবিতাম—তবে ঈশ্বর ছাড়া এই যে এত বস্তু ব্যাপার রহিয়াছে ইহাদের সহিত তবে কি মানুষের কোন ধর্ম্মমূলক সম্বন্ধ নাই? বঙ্কিম বাবুর বাসায় প্রতি রবিবার আমরা এই সকল আলোচনা করিতাম। সেই সময় পূজনীয় শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির নাম শুনা গেল। ইন্দ্রনাথকে বলিয়া বঙ্কিম বাবু চূড়ামণি মহাশয়কে এক দিন আপন বাসায় আনাইলেন। চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মকথা কহিলেন। তিনি যেমন বলিলেন—ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম্ম, অর্থাৎ, যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম—অমনি আমার সকল সংশয় দূর হইল, বিশ্বে যাহা কিছু আছে সকলই ধর্ম্মের অন্তর্গত দেখিলাম, বিশ্বে যাহা কিছু আছে বিশ্বনাথ হইতে তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় না বুঝিলাম, কারণ বিশ্ব তাহা হইলে আমাদিগকে রক্ষা না করিয়া বিনাশই করে; যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। পূর্ব্বে যখন দেব-দেবীতে বিশ্বাস ছিল না ইংরাজী-ভাবাপন্ন ছিলাম, তখন আমাদের সবই মন্দ মনে হইত। ঠিক মনে নাই, বোধ হয় ১৮৭৭ সালে [২৫ এপ্রিল ১৮৭৮] Bethune Society নামক সভায় High Education in India নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমাদের জাতিভেদ প্রণালীর নিন্দা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর শাস্ত্রের কথা শুনিয়া এবং সামাজিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐ প্রণালীর যৌক্তিকতা বুঝিয়াছিলাম। বুঝিয়া অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবনে' জাতীয় চরিত্র ও বর্ণভেদ প্রণালী শীর্ষক একটি প্রবন্ধ [মাঘ ১২৯২] লিখিয়াছিলাম।

উহা পড়িয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন—'আমিও জাতিভেদটাকে অতি জঘন্য জিনিস মনে করিতাম, কিন্তু তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মত উল্টাইয়া গিয়াছে।' 'নবজীবনে'র ঐ প্রবন্ধটি মৎপ্রণীত 'ত্রিধারা' নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার প্রায় সমস্তই ক্রমে ক্রমে পুস্তকাকারে শকুন্তলাতত্ত্বে, ফুল ও ফলে, ত্রিধারায়, হিন্দুত্বে, সাবিত্রীতত্ত্বে প্রকাশিত করিয়াছি। কঃ পন্থাঃ শ্রীমান্ গোবিন্দলাল দত্তের সাবিত্রী লাইব্রেরির অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম। হিন্দু সভ্যতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টি মনুষ্যোচিত, উহাতে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি নামক একটি প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পাঠ করিয়াছিলাম। পরিষৎ তখন রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাটীতে ছিল এবং দ্বিজেন্দ্র বাবু উহার সভাপতি ছিলেন। কি জন্য উহা পরিষৎ পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই বলিতে পারি না। আমি উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছি। সাধু ও অসাধু দুই প্রকার বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে বঙ্গের সকল স্থানের সুবিধা ও উন্নতির জন্য এবং বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রকার একতা বর্দ্ধনার্থ সাধু ভাষাই অবলম্বনীয়, এই প্রবন্ধে এই মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। একখানি জাত মাত্র মৃত মাসিক পত্র ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কোথাও এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ দেখি নাই। উক্ত পত্রের প্রতিবাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। অথচ বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা তখনও যেমন অসাধু ভাষার ব্যবহার করিতেন এখনও তেমনই করিতেছেন। হিন্দুত্বে হিন্দুর মানসিক বিশেষত্বের এবং সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং জাতিভেদ প্রথা, হিন্দু বিবাহ প্রণালী, সাকার পূজা প্রভৃতির যৌক্তিকতা বুঝাইবার চেষ্টা

করিয়াছি। যে সকল স্থানে এই সকল মতের প্রতিবাদ দেখিব মনে করিয়াছিলাম সে সকল স্থানে এ পর্য্যন্ত প্রতিবাদ দেখি নাই। অথচ এই সকল মত গৃহীত হইবার লক্ষণ কোথাও দেখি না। 'বেতালে বহুরহস্য' সম্বন্ধে এখন কোন কথা বলিতে পারি না—আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।"*

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

পরিষদের শৈশবাবস্থায় চন্দ্রনাথ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩০২ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই বৎসরের মধ্যভাগে স্থায়ী সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত কমিশনার পদে উন্নীত হইয়া উড়িষ্যা গমন করিলে চন্দ্রনাথ বর্ষের বাকী ছয় মাস অস্থায়ী ভাবে সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পর-বৎসর ১৩০৩ সালে তিনি পরিষদের স্থায়ী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

মৃত্যু

১৩১৭ সালের ৬ই আষাঢ় (২০ জুন ১৯১০), ৬৬ বৎসর বয়সে, চন্দ্রনাথ পরলোক গমন করিয়াছেন।

* 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' (১৩১১ সাল), পৃ. ৬৮১-৯২। চন্দ্রনাথ 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ' পুস্তকেও জীবনের অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী

মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক চন্দ্রনাথ যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইল, উহা সরকারের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **শকুন্তলাতত্ত্ব**। ১২৮৮ সাল (১১ নবেম্বর ১৮৮১) পৃ. ১৫১।

"অভিজ্ঞানশকুন্তল শীর্ষক যে কয়টি প্রবন্ধ সম্প্রতি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই সংশোধিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। এই পুস্তকে অভিজ্ঞানশকুন্তলের কেবল মাত্র নাটকত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সচরাচর যাহাকে কবিত্ব বলে তাহা বুঝাই নাই।"—বিজ্ঞাপন।

২। **পশুপতি-সম্বাদ** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। চৈত্র ১২৯০ (২৫-৩-১৮৮৪)। পৃ. ৬২।

"সংশোধিত হইয়া [১২৯০ সালের] বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত।" গ্রন্থের আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নাই; ইহা পরেশনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"উপন্যাসের আকারে ইতিহাস লিখিতে হইল। পদ্ধতি ঠিক নয়। কিন্তু উপায়ান্তর নাই। বঙ্গে এখন উপন্যাস বই আর কিছুই বড় একটা চলে না।"—বিজ্ঞাপন।

৩। **ফুল ও ফল**। বৈশাখ ১২৯২ (১৫-৫-১৮৮৫)। পৃ. ৮৪।

"গ্রন্থের সকল প্রবন্ধই বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। কেবল আনুষঙ্গিক-কথা. নামক প্রবন্ধটি প্রচার হইতে গৃহীত। পুনর্মুদ্রাঙ্কনে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছি।"

সূচী : ফুলের বৃন্ত (ধ্যান) ; ফুল (কোকিল) ; ফল (অদৃষ্ট) ; ফুল (ফুলের ভাষা : ১—মন্দাকিনী, ২—সুরধুনী, ৩—ভোগবতী) ; ফল (জীবন ও পরলোক, ইহলোক ও পরলোক, আনুষঙ্গিক কথা—ভালবাসা, পরলোক কোথায় ?)

৪। **গার্হস্থ্য পাঠ**। চৈত্র ১২৯২ (ইং ১৮৮৬)। পৃ. ১০১।

"আমাদের গার্হস্থ্য প্রণালী সম্বন্ধে সকল প্রকারের কথা এ গ্রন্থে বলি নাই। যে সকল কথা বলিতে বাকি রহিল তাহা আর একখানি গ্রন্থে বলিব।"—অবতরণিকা।

সূচী : গৃহ পরিষ্কার রাখিবার কথা, গৃহসামগ্রীর কথা, রান্না-ঘরের কথা, অন্নব্যঞ্জনের কথা, ভোজনের কথা, শয়ন করিবার কথা, গৃহকর্ম্ম করিবার কথা, গার্হস্থ্য পাঠের তত্ত্বকথা।

৫। **গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি**। ১২৯৪ সাল (১৫ জুলাই ১৮৮৭)। পৃ. ৩৮।

সূচী : স্নান করিবার কথা, কাপড় পরিবার কথা, রান্নাঘরের কথা, অন্নব্যঞ্জনের কথা, ভোজনের কথা, শয়ন করিবার কথা।

৬। **হিন্দু বিবাহ**। পৌষ ১২৯৪ (২৭-১২-১৮৮৭)। পৃ. ৫৪।

"সাবিত্রী লাইব্রেরির অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে…যে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, নবজীবন হইতে তাহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল। পুনর্মুদ্রাঙ্কনে প্রবন্ধটির স্থানে স্থানে কিছু কিছু সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে।"—প্রকাশক

৭। **ত্রিধারা**। মাঘ ১২৯৭ (৯-২-১৮৯১)। পৃ. ১৫১।

সূচী।—১ম ধারা : অনন্ত মুহূর্ত্ত, পাখিটি কোথায় গেল ? ছায়া, বউ কথা কও, দুইটি হিন্দু পত্নী, সুখের হাট ও সৌন্দর্য্যের মেলা, ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা।

২য় ধারা : কেতাব কীট, ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা, জীবনের কথা।
৩য় ধারা : সিদ্ধিদাতা গণেশ, বাঙ্গালির প্রকৃত কাজ, বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র, দেব-ধর্ম্মী মানব, পাপ-পুণ্য।
পরিশিষ্ট : জন্তু-ধর্ম্মী মানব।

৮। **হিন্দুত্ব** [হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস]। ইং ১৮৯২ (২৪ ডিসেম্বর)। পৃ. ৪০৫।

৯। **কঃ পন্থাঃ**। ইং ১৮৯৮ (১ মে ১৮১১)। পৃ. ৬৮।

"সাবিত্রী লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইবার পর পরিবর্দ্ধিত হইল।"

১০। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি। ১৩০৬ সাল (১০ জুলাই ১৮৯৯)। পৃ. ৫৯।

১১। **সাবিত্রীতত্ত্ব**। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ (৫-৭-১৯০০)। পৃ. ২১৫।

১২। **"বেতালে" বহু রহস্য**। ইং ১৯০৩ (১২ জুন)। পৃ. ৪১।

"সাহিত্য সভার ১৩০৯ সালের ২১এ চৈত্রের অধিবেশনে পঠিত।"

১৩। **সংযম-শিক্ষা বা নিম্নতম সোপান**। ১৩১১ সাল (২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৪)। পৃ. ১২৪।

সূচী : ১। সংযম, ২। সংযমের সূত্রপাত, ৩। শৈশবে সংযম, ৪। আহারে সংযমশিক্ষা, ৫। পরিধানে সংযমশিক্ষা, ৬। আমোদে সংযমশিক্ষা, ৭। ঔৎসুক্য, উৎকণ্ঠা, উল্লাসাদিতে সংযমশিক্ষা, ৮। সভাসমিতিতে সংযমশিক্ষা, ৯। উপসংহার, ১০। পরিশিষ্ট।

১৪। **পৃথিবীর সুখ দুঃখ।** ফাল্গুন ১৩১৫ (১৬-৩-১৯০৯)।
পৃ. ১১৪ + ১৪।

"সাহিত্য পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।"

"গত বৎসর রোগশয্যায় পড়িয়া যখন এই পুস্তকের লিখিত কথা মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলাম, তখন স্থির করিয়াছিলাম, ইহার নাম দিব 'আমার শেষ কথা'। সেই জন্য এই পুস্তকের ভিতরে ঐ তিনটি শব্দ আছে।...১০৯ পৃষ্ঠার ত্রয়োদশ পংক্তি হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমার পুত্র প্রকাশনাথের লিখিত।"—পূর্ব্বভাষ।

পাঠ্য পুস্তক ঃ চন্দ্রনাথ 'প্রথম নীতিপুস্তক,' 'নূতন পাঠ' প্রভৃতি কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন।

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চন্দ্রনাথের অনেকগুলি পত্র 'সবুজ পত্র' (আশ্বিন ১৩২৫) ও 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাহিত্য সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সময়ে মতবিরোধ ঘটিলেও উভয়ের মধ্যে আগাগোড়াই একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। আমরা চন্দ্রনাথের দুইখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

কলিকাতা

১লা কার্ত্তিক, ১২৯১

সবিনয় নিবেদন—

আনন্দমঠ সম্বন্ধে আপনি যে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহারি একটু আলোচনা করিব। বোধ হয় তাহাতেই অনেকটা গোল মিটিয়া

যাইতে পারে। তবে একটা কথা এই যে, বোধ হয় আনন্দমঠ আপনি যে চক্ষে দেখিয়াছেন আমি ঠিক সেই চক্ষে দেখি নাই—বোধ হয় কোন গ্রন্থই দুই জন এক চক্ষে দেখে না। অতএব আপনি যে spiritএ আনন্দমঠ পড়িয়াছেন, আমি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি কি না বলিতে পারি না। অতএব বুঝিবার দোষে যদি কোন গোল থাকিয়া যায় তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পরে করিব।

আনন্দমঠের কার্য্য সচরাচর সংসারধর্ম্মের কার্য্য নয়—আনন্দমঠের ছবি সংসারধর্ম্মের ছবি নয়। আনন্দমঠের কার্য্য একটি বিশেষ কার্য্য, সচরাচর বা every-day lifeএ মানুষ যে কার্য্য করে না সেই কার্য্য। অর্থাৎ প্রবল স্বদেশানুরাগে প্রধাবিত হইয়া স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা—এই কার্য্য। আনন্দমঠের পাত্রগণের আর কোন কার্য্য নাই—তাহারা যত ক্ষণ আমাদের সামনে আছে, তত ক্ষণ তাহাদের সেই একমাত্র কার্য্য—সেই কার্য্যই তাহাদের ধ্যান, জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা, আরাধনা, চেষ্টা, চরিত্র, চিন্তা ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই একমাত্র কার্য্য তাহাদের সমস্ত জীবনের পরিধি পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে—সে কার্য্যও যা, তাহাদের জীবনও তাই। সেই একমাত্র কার্য্য তাহাদের একমাত্র জীবন, একমাত্র ব্রত। যদি অনেকগুলি ব্যক্তির এই রকম একমাত্র জীবন একমাত্র ব্রত হয়, তাহা হইলে সেই অনেকগুলি ব্যক্তি কি একটিমাত্র ব্যক্তিস্বরূপ হইয়া উঠে না? ইতিহাসে তো তাহাই দেখিতে পাই। স্পার্টাবাসীরা এই উদ্দেশ্যে জীবনধারণ করিত। তাই সমস্ত স্পার্টাবাসীকে একটিমাত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে হইত। তাহাদের ব্যক্তিগত প্রভেদ সব সেই এক উদ্দেশ্যের কাছে বলি দেওয়া হইয়াছিল। রোমের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সামরিক প্রাধান্য। অতএব প্রত্যেক রোমানকে সেই এক উদ্দেশ্যের প্রতিকৃতি বলিয়া

মনে হইত—যেন সকল রোমানই এক ছাঁচে ঢালা। কার্থেজ যখন রোমের সহিত সাংঘাতিক সমরে নিযুক্ত তখন সমস্ত কার্থেজবাসী একটি ব্যক্তিস্বরূপ—একমন, একপ্রাণ, এক-নিশ্বাস, এক-উদ্দেশ্য। যেন সকলেই এক ছাঁচে ঢালা। ইংরাজের প্রধান উদ্দেশ্য বাণিজ্য—অতএব সকল ইংরাজই যেন একমাত্র বাণিজ্যের প্রতিমূর্ত্তি—সকলেই এক ছাঁচে ঢালা। হিন্দুর জীবন ধর্ম্ম-ময়—সকল হিন্দুই যেন এক ছাঁচে ঢালা। ইউরোপের নানা দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ ইউরোপবাসী ক্রুজেডে যাইতেছে—যেন সেই লক্ষ লক্ষ লোক সব এক দেশের লোক—এক-মনা লোক—এক ছাঁচের লোক। ক্রম্‌ওয়েলের অসংখ্য Ironsides সবই এক ছাঁচে ঢালা—যেন তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদ কিছুমাত্র নাই। এক-ব্রতীরা যতই এক-ব্রত হইতে থাকে তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদ ততই লোপ পাইতে থাকে। শেষে যখন সমস্ত এক-ব্রতীরা এক-ব্রতী হইয়া পড়ে তখন তাহারা একটি regiment-এর সৈন্যগণের ন্যায় একটি ব্যক্তিস্বরূপ হইয়া পড়ে—তখন নাম ও নম্বর ভিন্ন তাহাদিগকে চিনিবার অন্য উপায় নাই। অতএব আমি এইরূপ বুঝি যে, আনন্দমঠের পাত্রগণকে যদি আপনার কেবলমাত্র নাম ও নম্বর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে তবে এক-ব্রতীরা যথার্থই এক-ব্রতী হইয়াছে—বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য যথার্থই সিদ্ধ হইয়াছে! দ্বিতীয় কথা—এক উদ্দেশ্যবিশিষ্ট অথবা এক-ব্রতী লোকদিগের কার্য্যের একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাহারা যে সকল কার্য্য করে তাহা তাহারা নিজে করে না—কে যেন তাহাদিগকে সেই সব কার্য্য করায়। যে করায় সে হয় একটি idea, নয় একটি ব্যক্তি। স্পার্টাবাসীরা যে সব কার্য্য করিত তাহা তাহারা নিজে করিত না, Lycurgus নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইত। ক্রমওয়েলের Ironside সৈন্যগণ

যাহা করিত, তাহা তাহারা নিজে করিত না, ক্রমওয়েল নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইত। নেপোলিয়নের সৈন্য যাহা করিত তাহা নেপোলিয়ন নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইত। হিন্দুরা যেরূপে সংসারধর্ম্ম করে তাহা তাহারা নিজে করে না, মনু নামক জাদুকর তাহাদিগকে করান। আজিকালি জার্ম্মাণেরা যাহা করিতেছে তাহা তাহারা নিজে করিতেছে না, বিসমার্ক নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইতেছে। সকল মহৎ কর্ম্মই জাদুকরে করে, মানুষ নিজে করে না। বিশেষ যখন এক-ব্রতীরা একত্র হইয়া কোন মহৎ কর্ম্ম করে তখন তাহারা নিজে তাহা করে না, কোন জাদুকর তাহাদিগকে করায়। অতএব আপনাকে যে বোধ হইয়াছে যে আনন্দমঠের পাত্রগণ নিজে কিছু করিতেছে না, কোন জাদুকর তাহাদিগকে করাইতেছে, ইহাই আমার মতে আনন্দমঠের success-এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সত্যানন্দ যথার্থই ভেল্কী। হানিবল, আলেক্জন্দার, ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ন, মায়রাবো, পেরিক্লিস, লাইকরগস্, খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, মনু—সকলেই তাই। আমারও সত্যানন্দকে ভেল্কী বলিয়া মনে হইয়াছে এবং সেই জন্যই আমি বলি যে আনন্দমঠ অতি চমৎকার success.

তবে একটি কথা আছে। আনন্দমঠ এত successful বলিয়া আমার মনে হইলেও, আমার এমনটা বোধ হয় যে আনন্দমঠের ব্যাপারটা যেন কিছু সুদূরস্থাপিত ব্যাপার। এরূপ বোধ হইবার কারণ এই যে, সে ব্যাপার মানুষের নিত্য সাংসারিক জীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। যে কার্য্য মানুষ সর্ব্বদা করে না, বিশেষ বাঙ্গালি যাহা স্বপ্নেও মনে করে না, তাহা বাঙ্গালিকে কিছু ফাঁকা ফাঁকা রকম ঠেকিবারই কথা। কিন্তু আনন্দমঠের কবি ভয়ানক স্বদেশভক্ত এবং স্বদেশের উদ্ধার তাঁহার বড় সাধের চির-সঞ্চিত সুখ-স্বপ্ন।

অতএব আনন্দমঠের ব্যাপার তাঁহার কাছে সুদূর-স্থাপিত বা devoid of human interest নয়। এবং আমরাও যখন তাঁহার ন্যায় প্রকৃত স্বদেশানুরাগ অনুভব করিব তখন আনন্দমঠের ব্যাপার আমাদিগকেও সুদূরস্থাপিত বা devoid of human interest বলিয়া বোধ হইবে না। এখনও আমি যখন বঙ্কিম বাবুর মনের ভাব কল্পনা করিয়া আনন্দমঠ পড়ি তখন আনন্দমঠে প্রভূত human interest দেখিতে পাই। তখন আনন্দমঠের কবি এবং আনন্দমঠ উভয়কেই বঙ্গের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ideal জিনিস বলিয়া আমার মনে হয়। অথচ human interest-এ পরিপূর্ণ। স্বদেশ কি human interest-এর জিনিস নয়?

শান্তি ব্যতীত আনন্দমঠ হয় না। স্ত্রী patriot এবং বীর না হইলে পুরুষ বীর এবং patriot হয় না। তাই শান্তির সৃষ্টি। অতএব শান্তি স্ত্রী—প্রকৃত স্ত্রী—যেমন দুর্গাবতী, জয়াবতী, মীরাবাই ইত্যাদি। তবে আনন্দমঠের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট। সে নির্দ্দিষ্টরূপে শান্তি শান্তিরূপে বই অন্যরূপে দেখা দিতে পারে না। তাই বলিয়া কি তাহাকে সে রূপে দেখিব না? সকলের সকল রূপই দেখিতে হয়, নইলে দেখাই হয় না, সংসারও বুঝা হয় না। পারিবারিক জীবন আনন্দমঠের উদ্দেশ্য হইলে, আনন্দমঠে শান্তিকেও নিমাইমণির মতন ঘরের জিনিস দেখিতাম এবং সন্ন্যাসিনী শান্তিতে যেরূপ অগাধ প্রেম, পতিভক্তি, আত্মোৎসর্গপ্রবৃত্তি এবং চপলতা, হাস্যময়ভাব, রসাধিক্য, sprightliness প্রভৃতি গুণ মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে আনন্দমঠ পারিবারিক উপন্যাস হইলে তাহাতে শান্তিকে বঙ্কিম বাবুর সূর্য্য-মুখী, ভ্রমর, মৃণালিনী, কমলমণি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর রমণীর এক অদ্ভুত, অনুপম ঐন্দ্রজালিক সংযোগরূপে দেখিতাম। তবে আপনি

যেমন বলিয়াছেন আমারও তেমনি বোধ হয় যে বঙ্কিম বাবু শান্তিকে লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু যখন হস্তলিপি হইতে আমাকে আনন্দমঠ পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন তখন আমিও তাঁহাকে এ কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি শুনেন নাই। বোধ হয় তাঁহার মত আমার মতের সহিত মিলে নাই।...”

কলিকাতা

৫ নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।

৩০এ শ্রাবণ, ১৩০৭

রবীন্দ্রনাথ

তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই—তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমার প্রতিভার পরিমাপ নাই—উহার বৈচিত্র্যও যেমন, প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত। ‘কণিকা’, ‘কথা,’ ‘কল্পনা,’ ‘ক্ষণিকা’—বলিতে গেলে চারি মাসের মধ্যে চারিখানা—পারিয়া উঠিব কেন? প্রকৃতপক্ষেই পারি নাই। ‘কণিকা’ ছাড়িতে না ছাড়িতে ‘কথা’ আসিল—‘কথা’ দিয়া তুমি আমার হইতে ‘কণিকা’ কাড়িয়া লইলে—‘কণিকা’র ভোগ ত আমাকে পূর্ণ করিতে দিলে না। এমনি করিয়া ‘কল্পনা’ দিয়া ‘কথা’ কাড়িয়া লইয়াছিলে আমার ভোগে আবার বাধা দিয়াছিলে! এবার ‘ক্ষণিকা’য় চমকিত করিয়াছ। আবার ভোগে বিবাদী হইয়াছ। আমি ক্ষুদ্র—সুতরাং আমার গতি বড় ধীর—আমি তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। পিছাইয়া পড়িতেছি—কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি—ও গতি যথার্থই বিদ্যুতের গতি,—যেমন দ্রুত, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়,

ঊর্দ্ধদেশের—মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।

যে চারিখানির নাম করিলাম, সকলগুলিই মিষ্ট, হৃদয়স্পর্শী, সুগভীর, সুললিত, (অনেক স্থলে) সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ণ। কিন্তু 'ক্ষণিকা'য় বঙ্গের পল্লী-জীবনের, পল্লী-প্রকৃতির যে অনির্ব্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি—পল্লীপ্রিয় পাড়াগেঁয়ে—মুগ্ধ হইয়াছি। এ সৌরভ তোমার আর কোন কাব্যে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় এ সৌরভ শিলাইদহ-জনিত। প্রকৃতির প্রাণের সৌরভ পল্লীতেই পাওয়া যায়। কোন্‌টার কথা বলিব? অনেকগুলাতে এ সৌরভ পাইয়াছি। কিন্তু কি জানি কেন, 'বিরহের' সৌরভে বড়ই মজিয়াছি। তুমি যে উহা প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দিয়াছ।

ক্ষণিকার একটা বড় গুণপনা দেখিলাম—উহার আকৃতিও ক্ষণিকার ন্যায়। ক্ষণিকার প্রতি পৃষ্ঠায় দেখি ক্ষণিকা আঁকা রহিয়াছে। তাই বলি তোমার প্রতিভার পরিমাণ হয় না। ইতি

চন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-সাহিত্যে চিন্তাশীল সাহিত্যরসোত্তীর্ণ প্রবন্ধ-লেখকের সংখ্যা অল্প; বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব, বঙ্কিম এবং পরবর্ত্তী কালে রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহাদের মধ্যে ভূদেব-শিষ্য চন্দ্রনাথ বসুও এক জন। তাঁহার 'শকুন্তলাতত্ত্ব' ও 'সাবিত্রীতত্ত্ব' একদা শিক্ষিত বাঙালী সমাজকে আনন্দ দিয়াছিল এবং ইঁহার 'সংযম-শিক্ষা' তরুণ বাঙালীদের নৈতিক আদর্শ দৃঢ় করিয়াছিল। 'সংযম-শিক্ষা'র

চমৎকার রচনা-গুণে তিনি আজিও স্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি তাঁহার 'পৃথিবীর সুখ দুঃখে' লিখিয়াছেন :—

"আমার বাঙ্গালা লিখিবার এই একটা রীতি বা নিয়ম আছে যে, বাঙ্গালায় যাহা কেহ কখনও লেখে নাই এমন ভাল কথা বলিবার থাকিলেই আমি লিখি, নহিলে লিখি না। এই জন্য আমি লিখিয়া গেলাম বড় অল্প, কিন্তু যাহা লিখিয়া গেলাম এ দেশে তাহা আর কেহ লেখেন নাই।"

ইহাতে কথঞ্চিৎ অত্যুক্তি ও অহমিকা প্রকাশ পাইলেও চন্দ্রনাথ সত্য সত্যই যে গতানুগতিকতা বর্জ্জন করিয়া চলিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমালোচনা-সাহিত্যেই তাঁহার উৎকর্ষ সমধিক লক্ষিত হয়। হাল্‌কা নিন্দাধর্ম্মী 'পশুপতি-সম্বাদ' লিখিয়া তিনি যদিও তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের আদর্শচ্যুত হইয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন, তথাপি রস-রচনাতেও যে তাঁহার হাত ছিল, 'পশুপতি-সম্বাদ' তাহাই প্রমাণ করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাবিত্রী লাইব্রেরিতে পঠিত তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্য" বক্তৃতায় সমালোচক চন্দ্রনাথকে ইউরোপীয় সমালোচকদের সহিত তুলনা করিয়া গৌরবের আসন দিয়াছিলেন। আমরাও মনে করি, সূক্ষ্মদর্শী সাহিত্য-সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু চিরদিন বাংলা-সাহিত্যে স্মরণীয় থাকিবেন। তাঁহার সমালোচনা-শক্তির একটু নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"সংসার একটি ঘোর দুর্ভেদ্য রহস্য। তথায় কিছুরই স্থিরতা নাই, সকলই অনিশ্চিত। আজ যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কাল তিনি পথের ভিখারী। এই মুহূর্ত্তে যিনি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্ত, পর-মুহূর্ত্তে তিনি বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত। প্রতি দণ্ডে প্রতি মুহূর্ত্তে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে। সেই সকল বিভিন্ন অবস্থাতে

কোন একটি নির্দ্দিষ্ট চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই চরিত্রের গুণে যেমন যেমন কার্য্য করিলে তাঁহার চরিত্রের সার্থকতা হয়, নাটককার তাঁহাকে সেই রকম কার্য্য করান। অর্থাৎ তাঁহার যে রকম চরিত্র, তাহাতে যে অবস্থায় তাঁহার যে রকম কার্য্য করা, কথা কওয়া, বা ভাব প্রকাশ করা সম্ভব এবং সঙ্গত, নাটককার তাঁহাকে তাহাই করান। নাটকের পাত্রের প্রত্যেক কার্য্যে এবং প্রত্যেক কথাতে তাঁহার চরিত্র প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। তিনি নানাবিধ অবস্থায় নানাপ্রকার কার্য্য করিবেন এবং নানাপ্রকার কথা কহিবেন। কিন্তু তিনি যদি প্রকৃত নাটকের পাত্র হন, তবে তাঁহার প্রতি কার্য্য তাঁহারই কার্য্য এবং তাঁহার প্রতি কথা তাঁহারই কথা বলিয়া পাঠকের বুঝিতে পারা চাই। বুঝিতে পারা চাই যে, তিনি যে অবস্থায় পতিত, সে অবস্থায় তিনি যে কার্য্য করিতেছেন বা কথা কহিতেছেন, সে কার্য্য এবং সে কথা তিনি যে চরিত্র-বিশিষ্ট সেই চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তির ভিন্ন অপর কাহারো হইতে পারে না। অর্থাৎ, কোন একটি জ্যামিতি-সূত্র হইতে যেমন অপরাপর জ্যামিতি-সূত্র অবশ্য নিঃসৃত হয়, তেমনি নাটকের পাত্রের সমস্ত কার্য্য এবং সমস্ত কথা তাহার চরিত্র হইতে অবশ্যনিঃসৃত বলিয়া উপলব্ধি হওয়া চাই। এবং প্রকৃত নাটকের তাহাই হইয়া থাকে। হ্যামলেটের কথা হ্যামলেটের ভিন্ন আর কাহারও কথা বলিয়া বোধ হয় না; ইয়াগোর কথা ইয়াগোর ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; দুষ্মন্তের কথা দুষ্মন্তের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; শাঙ্গরবের কথা শাঙ্গরবের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; প্রিয়ম্বদার কথা প্রিয়ম্বদার ভিন্ন আর কাহারও কথা বলিয়া বোধ হয় না। এই কারণেই

আকার-গত বা প্রত্যক্ষ নাটকত্ব। অধিকন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রকৃত নাটককার সামান্য চরিত্র চিত্রিত করেন না। যে-চরিত্র চিত্রিত করিলে মনুষ্য জাতির শিক্ষালাভ হইতে পারে, তিনি সেই চরিত্রই চিত্রিত করিয়া থাকেন। কিন্তু চরিত্র শুধু গুরুত্বগুণবিশিষ্ট হইলেই হয় না। এক জন উন্নতচরিত্র ব্যক্তিকে বসিয়া থাকিতে অথবা ভোজন করিতে অথবা পুস্তক পাঠ করিতে দেখিলে কোন শিক্ষালাভ হয় না। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে বিপদ্জনক অবস্থায় কার্য্য করিতে দেখিলে শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। সেই নিমিত্তই নাটককার কোন গুরুত্বগুণবিশিষ্ট চরিত্রকে কোন অসামান্য অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া তাহার ছবি তুলিয়া দেন। সে ছবি তদ্রূপ-চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কার্য্যে এবং প্রতি কথায় আঁকা থাকে। কত ক্ষমতা থাকিলে তবে সে রকম ছবি তুলিতে পারা যায়! আমাদের মধ্যে এ কথা সকলে বুঝেন না বলিয়া, প্রতি বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় রাশি রাশি পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত হয়।" ("শকুন্তলাতত্ত্ব," পৃ. ১৪৭-৪৮)
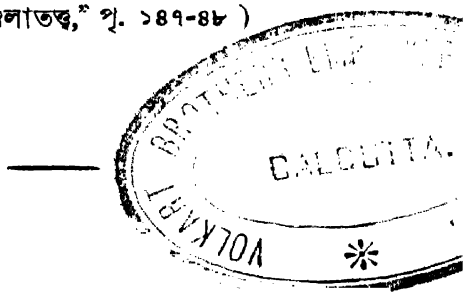
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

১৮৫৯—১৯৩৯

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীন নারিট গ্রামে প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য-বংশে ১৮৫৯ সনের ২১এ এপ্রিল (৯ বৈশাখ ১২৬৬) নবকৃষ্ণের জন্ম হয়। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা। নবকৃষ্ণের পিতা—রাজনারায়ণ তর্কবাচস্পতি (মৃত্যু : কার্ত্তিক ১২৬৯); মাতা—পদ্মাবতী দেবী (মৃত্যু ঃ আশ্বিন ১২৮২)। তিনি পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান।

বিদ্যাশিক্ষা ঃ বিবাহ

নবকৃষ্ণ প্রথমে স্বগ্রামস্থ ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ও পরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। সেখান হইতে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করিয়া এনট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন; শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁহার আর পড়া হয় নাই। ব্যাকরণে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

নবকৃষ্ণের বিবাহ হয়—আমতা থানার ইসলামপুর গ্রামের ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীসুশীলা দেবীর সহিত অপেক্ষাকৃত

অধিক বয়সে।* নবকৃষ্ণের তিন পুত্র (সুকুমার, সুপ্রভাত ও গোকুলেশ্বর) ও দুই কন্যা। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ সকলেই জীবিত।

সাহিত্যানুরাগ

পঠদ্দশা হইতেই মাতৃভাষার প্রতি নবকৃষ্ণের প্রবল অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 'সোমপ্রকাশ,' 'এডুকেশন গেজেট,' 'নববিভাকর' প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রে এবং ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'পাক্ষিক সমালোচকে' প্রথমে কবিতা লিখিতে সুরু করেন। আমরা তাঁহার কয়েকটি প্রাথমিক রচনার উল্লেখ করিতেছি :—

১২৮৪, ৯ জ্যৈষ্ঠ ... 'সোমপ্রকাশ' ... ভারত-গান
২৭ আশ্বিন ... 'এডুকেশন গেজেট' ... শারদীয়া চিন্তা (কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল)
১২৮৬, ২৮ আশ্বিন ... 'নববিভাকর' ... ষষ্ঠী-উদ্বোধন
১২৯০, ১৯ আশ্বিন ... 'উদ্বোধন' ... আবাহন
১২৯১, ভাদ্র ... 'পাক্ষিক সমালোচক' ... বর্ষার মেঘ

মাসিক পত্রে রচনা প্রকাশ সম্বন্ধে নবকৃষ্ণ এইরূপ লিখিয়াছেন :—

> "মাসিক পত্রের মধ্যে সুবিখ্যাত 'ভারতী' পত্রিকাতেই আমার কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন আমি কলিকাতা সংস্কৃত

* নবকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র জানাইয়াছেন, "অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, পিতৃদেবের বিবাহ হইয়াছিল বাংলা ১৩০১ সালের ১২ই বৈশাখ" (২৪ এপ্রিল ১৮৯৪)। কিন্তু ২৬ এপ্রিল ১৯০০ তারিখে নবকৃষ্ণকে লিখিত 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির একখানি পত্রে প্রকাশ :—'কাহাকে উদ্বন্ধনসূত্রে বাঁধিয়া চিরসুখী করিলেন ?'

কলেজিয়েট স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতাম—নিজের লেখার উপর নিজের বিশ্বাস ছিল না। এজন্য প্রথম কয়েকটি লেখা কবিবর (অধুনা বিশ্বকবি) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাই। তিনি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উহাতে সংশোধনের কিছুই নাই এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া 'ভারতী'র সম্পাদিকা মহাশয়ার নিকট পাঠাইয়া দেন।" ('পুষ্পাঞ্জলি' : নিবেদন)

'ভারতী'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নবকৃষ্ণের প্রথম কবিতা—'ধরা-সুন্দরী' ১২৯২ সালের বৈশাখ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ৭ এপ্রিল ১৮৮৫ তারিখে নবকৃষ্ণকে লিখিয়াছিলেন :—"আপনার কবিতাটি আমার বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। সংশোধন করিবার কিছুই দেখিলাম না। আপনার অভিপ্রায় অনুসারে সে কবিতাটি ভারতীর সম্পাদিকার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছি। তাঁহারও ভাল লাগিয়াছে শুনিয়াছি।" পুনরায় ১৭ এপ্রিল ১৮৮৬ তারিখে লেখেন :—"আপনার কবিতা সুন্দর হইয়াছে—ভারতীতে পাঠাইয়া দিব।"

এই সময়ে নবকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তিনি সাহিত্য-সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় তখন 'প্রচার' প্রকাশিত হইতেছে। নবকৃষ্ণ এই মাসিক-পত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—"প্রচার বাহির হইলে দ্বিতীয় বর্ষ [১২৯২] হইতে আমি তাহাতেও কবিতা লিখিতে থাকি। রাখাল বাবু আমার কবিতার বড়ই আদর করিতেন, ইহাতে আমি যথেষ্ট উৎসাহিত হই। এই উপলক্ষে পূজ্যপাদ সাহিত্য-সম্রাটের নিকট অনেক উপদেশ লাভ করিয়াও আমি কৃতজ্ঞ

হইয়াছিলাম।" 'প্রচারে'র প্রচার রহিত করা সাব্যস্ত হইলে নবকৃষ্ণ সত্য সত্যই ব্যথিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সুপরিচিত "শেষ" কবিতাটি সেই ব্যথারই ব্যক্ত রূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দ্দেশে উহা 'প্রচারে'র সর্ব্বশেষ সংখ্যার (চৈত্র ১২৯৫) শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছিল। কবিতাটি উদ্ধারযোগ্য :—

গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল, আঁধার আজি কুঞ্জবন।
(আর) গাহে না পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি-গুঞ্জরণ।
দুলাতে মৃদু লতিকা বনে, খেলিতে নব কলিকা সনে,
মধুরতর নাহি সে আর সমীর-ধীর-সঞ্চরণ॥
কাননে ঢালি জোছনারাশি, ভাসে না চাঁদ গোকুলে আসি,
নাহি সে হাসি প্রমোদরাশি, নাহি সে সুখ-সম্মিলন।
জলদে শশি-মাধুরী ঢাকা, বিষাদ যেন সকলে মাখা,
শ্রীহীন তরু, শ্রীহীন লতা, শ্রীহীন চারু পুষ্পবন॥
অমিয় স্বর-লহরে মাখি স্তবধ করি পশু-পাখী,
মধুরভাষী আর সে বাঁশী গাহে না গীত সম্মোহন।
যমুনা পানে চাহিলে ফিরে, কপোল ভাসে নয়ন-নীরে,
পরাণে শুধু উছলি উঠে সুনীল জলে সন্তরণ॥
নিবিড় বনে তমাল-ছায়, কোকিল-বধূ গীত না গায়,
সারিকা-শুক বিরস-মুখ বিগত প্রেমসম্ভাষণ।
অধীর ব্রজ-বালক দল, না খায় ধেনু তৃণ কি জল,
সজল আঁখি ঊরধ মুখে করিছে কি যে অন্বেষণ॥
প্রেমিক কে সে মধুরভাষী বধিয়ে গেল গোকুলবাসী,
ব্রজে কি আর বাঁশরী তার গা'বে না গীত সঞ্জীবন?

অধীর প্রাণে বিষম ক্লেশ, কেমনে করি এ দুখ শেষ,
বিনে শ্রীহরি কেমনে করি নয়ন-বারি সম্বরণ ॥

সুকবি নবকৃষ্ণের বহু কবিতা 'ভারতী,' 'প্রচার,' 'কল্পনা,' 'জন্মভূমি,' 'ভারতবর্ষ,' 'প্রবাসী,' 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় সাদরে স্থান পাইয়াছিল। 'সাহিত্যে' তিনি একাধিক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন।* কিন্তু তিনি সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—শিশুসাহিত্য-রচনায়।

গ্রন্থাবলী

নবকৃষ্ণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **বাঙালির ছবি** (শিশুপাঠ্য কবিতা-সমষ্টি)। ১ আশ্বিন ১৮০৭ শক (৮-১১-১৮৮৫)। পৃ. ১২

ইহা "শ্রীযুক্ত 'আমার' অঙ্কিত।" দ্বিতীয় সংস্করণটি (আশ্বিন ১৩১২) পরিবর্দ্ধিত। পরবর্ত্তী কালে পুস্তিকাখানি 'রং-চং' নামে লেখকের স্বনামে প্রকাশিত।

২। **শিশুরঞ্জন রামায়ণ** (সচিত্র)। জানুয়ারি ১৮৯১। পৃ. ৬০

* ৫-১২-৯৯ তারিখে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি নবকৃষ্ণকে লিখিতেছেন :—"সাহিত্যের জন্য এবার যে রচনাটি পাঠাইয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার। এবার সুপ্রবন্ধের বড় অভাব ছিল।" "দশমী, ১৩১৯" তারিখযুক্ত অপর একখানি পত্রে তিনি লিখিতেছেন :—"পূজার 'সাহিত্যে' আপনার যে রচনাটি ছাপা হইয়াছে, তাহা পড়িয়া পাঠকবর্গ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন।" প্রবন্ধ দুইটি নবকৃষ্ণের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয় নাই।

ইহা পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন :—"তোমার প্রণীত 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ' দেখিয়া প্রীত হইলাম, কিন্তু ইহা বালকদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত না হইলে, 'প্রীত হইলাম' বলা সার্থক হয় না। এখনকার শিশুরা রুশিয়ার পিটর বা স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের ইতিহাস বেশ জানে, কিন্তু দশরথ বা জনক রাজার নাম শুনিলে আকাশ হইতে পড়ে। যাঁহারা বিদ্যালয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন করেন, তাঁহারা তাহাতে ক্ষতিবোধ করেন না। না করুন, কিন্তু রামায়ণে যে উচ্চ নীতি আছে, তাহার শিক্ষায় যে বালকেরা বঞ্চিত হয়, ইহা দুঃখের বিষয় বটে। ভরসা করি, তোমার ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে সে অভাব মোচন হইবে। ইহা বালকদিগের শিক্ষার উপযোগী বটে। ইতি তাং ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৯১।"

বঙ্কিমচন্দ্রেরই উপদেশে গ্রন্থকার এই পুস্তকের পরবর্ত্তী সংস্করণে শিশুদের পক্ষে কঠিন ও দীর্ঘ পদগুলির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন।

৩। **ছেলেখেলা** (শিশুপাঠ্য পদ্য, সচিত্র)। কার্ত্তিক ১৩০৫ (৫-১০-১৮৯৮)। পৃ. ৬০

৪। **টুক্‌টুকে রামায়ণ** (সচিত্র)। আশ্বিন ১৩১৭ (৮-১০-১৯১০)। পৃ. ৬৮

"বাল্মীকির মূল রামায়ণের প্রধান কোনও কথাই যাহাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অজ্ঞাত না থাকে, ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে 'বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ের' প্রকাশিত মূল রামায়ণই আমার প্রধান অবলম্বন।"

এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণটি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত; দ্বিতীয় সংস্করণের "নিবেদনে" প্রকাশ :—"লঙ্কাকাণ্ড অসঙ্গত সংক্ষিপ্ত

হইয়াছিল—সুন্দর ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অনেক কথা বাদ পড়িয়াছিল। এবার সে সকল ত্রুটি সংশোধিত হইল।...এই সংস্করণেও আমি লঙ্কাকাণ্ডেই গ্রন্থ শেষ করিয়াছিলাম। ঐ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইবার পর তিনিই [সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়] অনুরোধ করিয়া আমাকে দিয়া উত্তরকাণ্ডটি লেখাইয়া ইহাতে সংযোজিত করিলেন।...১০ই শ্রাবণ, সন ১৩৩০।"

৫। **পুষ্পাঞ্জলি** (কবিতা-সমষ্টি)। কার্ত্তিক ১৩৪১ (ইং ১৯৩৪)। পৃ. ১২৮

বিক্ষিপ্ত নূতন-পুরাতন কবিতার নির্ব্বাচিত সংগ্রহ। "কয়েকটি কবিতার স্থলবিশেষ পরিবর্জ্জিত এবং কোন কোনটির কোন কোন স্থান কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেকগুলি লেখা অর্দ্ধ শতাব্দীর বা তাহারও পূর্ব্বের রচিত, ...।"

৬। **ছবির ছড়া** (ছোটদের পদ্য-সমষ্টি, সচিত্র)। অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ (ইং ১৯৩৬)।

পাঠ্য পুস্তক: নবকৃষ্ণ অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকেরও রচয়িতা। সেগুলি—বালকপাঠ, কবিতাকুসুম, লেখা-পড়া (১ম ও ২য় ভাগ), শিশুপাঠ (১ম ও ২য় ভাগ), সেকালের ইতিকথা, সুখবোধ ব্যাকরণ, বালকবোধ ব্যাকরণ, বর্ণ ও বানান, বর্ণবোধ, নীতিপাঠ, ছড়া ও কবিতা, ছবি ও ছড়া। শেষোক্ত দুইখানি তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

সম্পাদিত গ্রন্থ: নবকৃষ্ণের সম্পাদনায় এই গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল:— ১। 'সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত (বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ. ৫৯১), ২। 'সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত'

মহাকবি কাশীরাম দাস বিরচিত (ফাল্গুন ১৩৩৫, পৃ. ১২২৫), ৩। ১৩৪৫ সালে পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে সিটি বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত সঙ্কলন-গ্রন্থ—'আগমনী'; ইহা যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও নবকৃষ্ণের যুগ্ম-সম্পাদনায় তাঁহাদের মৃত্যুর পরে প্রচারিত হয়।

সাময়িকপত্র-সম্পাদন

সাময়িকপত্র-সম্পাদনেও নবকৃষ্ণের কৃতিত্ব কম নহে। তিনি যে-সকল পত্র-পত্রিকা-পরিচালনায় সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি—

'সখা': ১৮৮৩ সনের জানুয়ারি মাসে প্রমদাচরণ সেন 'সখা' নামে একখানি শিশুপাঠ্য সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর (জুন ১৮৮৫) পর 'সখা' প্রায় দশ বৎসর জীবিত ছিল। নবকৃষ্ণ ইহার সহিত দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; তাঁহার লেখা ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী বহু পদ্য 'সখা'তে স্থান লাভ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে শেষ তিন-চার বর্ষের—বিশেষ করিয়া ১১শ-১২শ বর্ষের (ইং ১৮৯৩-৯৪) 'সখা' তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তিনি বিদ্যাসাগরের একাধিক অপ্রকাশিত শিশুপাঠ্য রচনা সংগ্রহ করিয়া 'সখা'য় মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

'মাসিক বসুমতী': 'মাসিক বসুমতী'র সূচনা হইতে সহকারী সম্পাদক-রূপে নূতন লেখকগণের রচনা মনোনয়নের ভার বহু বৎসর যাবৎ নবকৃষ্ণের উপর ন্যস্ত ছিল; গৃহে বসিয়াই তিনি এই কার্য্য করিতেন।

'বার্ষিক শিশুসাথী': ১৩৪০ সালে তিনি 'বার্ষিক শিশুসাথী'র (৮ম বর্ষ) সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মৃত্যু

১৯৩৯ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৮ ভাদ্র ১৩৪৬), ৮০ বৎসর বয়সে, নবকৃষ্ণ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে নানা রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। এই অসুস্থতার মধ্যেও তাঁহার সাহিত্য-চর্চা অব্যাহত ছিল।

নবকৃষ্ণ ও বাংলা-সাহিত্য

ভাষা ও ছন্দের উপর অসাধারণ দখল নবকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। এই ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যই তাঁহাকে শিশুসাহিত্যে অতখানি কৃতিত্ব দান করিয়াছে। তাঁহার শুচিতাবোধও বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের যে সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংস্করণ নবকৃষ্ণের হাত দিয়া বাহির হইয়াছে, অভিভাবক-সম্প্রদায় নিশ্চিন্তে সেগুলি ছেলেমেয়েদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়াছেন। সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁহার পরিচয় স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু যত দিন 'টুকটুকে রামায়ণ' থাকিবে, তত দিন বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা তাঁহাকে স্মরণে রাখিবে।

আমরা নবকৃষ্ণের শিশুপাঠ্য রচনার কিছু নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

আগমনী

বর্ষা গেলো আকাশ ধুয়ে, ফর্‌সা হলো দিক্।
কেঁদে কেটে, হেসে ধরা উঠ্‌লো যেন ঠিক্॥
সকালবেলা চারিদিকে শিশির-ভিজা ঘাস।
শিউলি-তলা ছেয়ে পড়ে' শিউলিফুলের রাশ॥

পুকুর-ডোবায় জল থৈ-থৈ, কানায় কানায় উঠে।
শালুক শুঁদি রক্তকমল ভাসচে তাতে ফুঠে'॥
ক্ষেতে আকের গাছ বেড়েছে, ঝুলচে শশা গাছে।
খাল-বিল আর নদী ভরে' গেছে নূতন মাছে॥
নবীন নধর সবুজ ধানে ভরে' গেছে মাঠ।
বসুন্ধরা বসিয়ে যেন দেছে শোভার হাট॥
বর্ষাকালের মেঘে ঢাকা স্যাৎসেতে সেই প্রাণ।
ফর্‌সা ফিকে রোদ দেখে আজ উঠ্‌ছে গেয়ে গান॥...

সপ্তমী-পূজা

ষষ্ঠী-নিশি পুইয়ে আসে, পূর্ব্বদিকে ঊষা হাসে,
কাক পক্ষী দুই একটি ডাক্‌লো গাছে গাছে।
ললিত, বিভাস, ভয়রোঁ ভেজে, সানাইগুলো উঠ্‌লো বেজে,
ধীর-গম্ভীর নাগ্‌রা কাড়া তাল দিলে তার পাছে॥
চৌদিকেতে সজাগ হয়ে, সবাই না কি ছিলো শুয়ে,
বাজ্‌না শুনেই 'দুর্গা' বোলে উঠ্‌লো শয়ন ছেড়ে।
ক্রমে ক্রমে বাড়্‌লো বেলা, উঠ্‌লো বেড়ে লোকের মেলা,
তা'র সঙ্গেই পূজোবাড়ীতে গোল উঠ্‌লো বেড়ে॥
বাজ্‌লো কাঁসর, ঘণ্টা, ঘড়ী, সপ্তমে প্রাণপণে চড়ি'
বাজ্‌লো সানাই, কাঁসি কাড়া, বাজ্‌লো তারি সনে।
তার মাঝেতে আড়ম্বরে, যায় 'কলাবউ' স্নানের তরে,
পুরুত ঠাকুর ডুবিয়ে জলে তুল্লে পরক্ষণে॥
বাজ লো কাঁসর ঘণ্টা ঘড়ী, সপ্তমে প্রাণপণে চড়ি'
বাজ্‌লো সানাই, কাঁসি কাড়া উঠ্‌লো বেজে তথা।

হাতেক দু-হাত ঘোম্‌টা দিয়ে, বারকোসেতে দাঁড়ান গিয়ে,
আড়ষ্ট ভাব কলাবউটি—লজ্জাবতী লতা ॥
পরক্ষণেই বাজ্‌নাগুলো বাজিয়ে খানিক, থেমে গেলো,
পূজক পুরুত এই দু-জনার পড়্‌লো এখন কাজ।
ইনি বলান, উনি বলেন, প্রতিধ্বনির মত চলেন,
গতিক যা, তায় তন্ত্রমন্ত্র শেষ বা না হয় আজ ॥
ফুল বিল্বপত্র গুলি, চন্দনেতে ডুবিয়ে তুলি'
ঘটের উপর দিচ্চে পূজক মন্ত্র পড়ি' পড়ি'।
ধূপের গন্ধ, ধুনার বাসে, ভক্তি যেন এগিয়ে আসে,
মণ্ডপে আর চারি পাশে ভক্তি ছড়াছড়ি ॥ ('রং-চং')

যায় ব'য়ে সরযূ—কালো কাকের চক্ষুজল।
তায় ভাসে আকাশের ছায়া সুনীল সুবিমল ॥
শাদা শাদা পাল তুলে তায় নৌকা সোঁ-সোঁ চলে।
হর্ষে যেন রাজহংস খেলা করে জলে ॥
নদীর তীরে শ্যামল তরু, পাশে সবুজ মাঠ।
বসুমতীর বক্ষে যেন শোভে শোভার হাট ॥
অযোধ্যা নগরী ছিলো এই সরযূর তীরে।
শোভা কি তার! দেখ্‌লে পরে নয়ন নাহি ফিরে ॥
বাগান পুকুর অট্টালিকার শোভা বলিহারি।
সুন্দর পথ—পথের পাশে বৃক্ষ সারি সারি ॥
ধর্ম্মশালা, চতুষ্পাঠী, রম্য দেবালয়।
দোকান পসার শোভায় ভরা নানা দ্রব্যময় ॥

ধন-ধান্যে পূর্ণ পুরী—সবাই থাকে সুখে।
শিল্পী চাষী ব্যবসায়ী   হাসি সবার মুখে॥

('টুকটুকে রামায়ণ')

ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত

১৮৪৬—১৯১৮

সংসারে মাঝে মাঝে আমরা এমন এক-একজন কর্ম্মীর সন্ধান পাই, যিনি ঝালে ঝোলে অম্বলে সর্ব্বত্র আছেন, যাঁহাকে না হইলে আমাদের এক দণ্ড চলে না, অথচ শেষাশেষি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বেলায় যাঁহাকে আমাদের মনে থাকে না। বাংলা সাময়িকপত্র-সংসারে ক্ষেত্রমোহন এমনই একজন একান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্মী এবং শেষাশেষি সম্পূর্ণ বিস্মৃত ব্যক্তি। জীবনের শেষ বিয়াল্লিশ বৎসর তিনি বাংলা দেশের সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং এই কার্য্যে এত অধিক-সংখ্যক শিক্ষার্থীর গুরুগিরি করিয়াছিলেন যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি ছাইয়া গিয়াছিল। তিনি সংবাদবিষয়ক কাজে এতই অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে চলন্ত অভিধান আখ্যা দেওয়া হইত; বিশেষ করিয়া রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক সংবাদ ও মন্তব্য সরবরাহে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তি কালের ঝোড়ো হাওয়ায় দৈনিক পত্রের সঙ্গেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। মুদ্রিত যে তিনখানি মাত্র পুস্তক তাঁহার কীর্ত্তির খাতে জমা আছে তাহাতে তাঁহার আংশিক পরিচয় মাত্র আছে, সম্যক্ পরিচয় নাই। ইহা তাঁহারও দুর্ভাগ্য, আমাদেরও দুর্ভাগ্য। শুধু কৃতী শিষ্যদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা আজ সেই অক্লান্তকর্ম্মী সাধককে স্মরণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছি।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১৮৪৬ সনে বঙ্গের পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীর বৈকুণ্ঠপুর পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-বংশে ক্ষেত্রমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—পীতাম্বর সেনগুপ্ত প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন না বটে, কিন্তু পিতামহ রামমোহন সেনগুপ্ত বিচক্ষণ কবিরাজ বলিয়া তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাশিক্ষা ঃ বিবাহ

গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া সাত বৎসর বয়সের পর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ক্ষেত্রমোহন কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি "পৌষ মাসে সপ্তমের অতিক্রম করিয়া, মাঘে অষ্টমে প্রবৃত্ত হইয়া, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে চতুর্থ দিবসে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন।" কৃতী ছাত্র হিসাবে বিদ্যালয়ে তাঁহার বিলক্ষণ সুনাম হইয়াছিল। তিনি যথারীতি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত কলেজে ক্ষেত্রমোহনের স্থিতিকাল ১৪ বৎসর, ইহার মধ্যে ৬ বৎসর বৃত্তি ভোগ করিয়াছেন, কলেজের সকল বৃত্তিই তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়াছিলেন।

পঠদ্দশায় ১৮৬৫ সনে বারাসত মহকুমার বারাসাত শহর-নিবাসী রামরতন রায়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

সাময়িকপত্র সম্পাদন

কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া ক্ষেত্রমোহন ১৮৬৯ সনে মেদিনীপুরে ডেপুটি ইন্‌স্পেকটরের পদ লাভ করেন। কিছু দিন পরে—১৮৭৩ সনে তিনি সরকারী চাকরির মোহ কাটাইয়া সাংবাদিকের জীবন বরণ করিয়াছিলেন।

১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৭৪) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'আর্য্যদর্শন' মাসিকপত্র প্রকাশ করিলে ক্ষেত্রমোহন কিছু দিন তাঁহার সহকারিতা করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদক, বন্ধুবর দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'প্রভাত সমীর' নামে একখানি দৈনিকপত্র প্রকাশ করেন; ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৫ মাঘ ১২৮১ (জানুয়ারি ১৮৭৫)। অর্থাভাব-হেতু পত্রিকাখানি মাস-চারেক পরেই বন্ধ হয়।

"এই 'প্রভাত সমীরে'ই ক্ষেত্রমোহন সংবাদপত্রের ভাষায় যে প্রাঞ্জলতা, ওজস্বিতা এবং বাগ্মীসুলভ বর্ণনাপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাই পরে সকল সংবাদপত্রে পরিগৃহীত হয়। 'প্রভাত সমীরে'র অন্তর্ধান হইবার পর ক্ষেত্রমোহন সংবাদপত্র-পরিচালনেই জীবিকার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে অনেকের পক্ষে যাহা সখের কার্য্য বলিয়া পরিচিত ছিল, ক্ষেত্রমোহনের পক্ষে তাহাই জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্য হইয়া উঠিল। এই জন্যই অনেক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রই ক্ষেত্রমোহনের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। নববিভাকর, সহচর, সাধারণী, সাপ্তাহিক সমাচার, প্রভাতী, সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতি পত্রের সহিত ক্ষেত্রমোহনের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। নববিভাকর ও সহচরের সম্পাদন-

তারই কার্য্যতঃ বহুকাল যাবৎ ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নকে লইয়া থাকিতে হইয়াছিল। প্রভাতী, সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতির সহিতও তাঁহার সম্পাদকীয় সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। দৈনিকবার্ত্তা, প্রজাবন্ধু প্রভৃতি পত্রেও ক্ষেত্রমোহনের হাত পড়িয়াছিল। ফলতঃ এক সময়ে ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের সম্বন্ধ না থাকিলে যেন সংবাদপত্রই চলিত না। বঙ্গবাসীর বয়স যখন প্রায় এক বৎসর [১২৮৯] সেই সময়ে ক্ষেত্রমোহনের সহিত বঙ্গবাসার ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সেই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়া, প্রায় ২১ বৎসর বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বঙ্গবাসীর দৈনিক প্রায় আদ্যন্ত কালই ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের হস্তে ছিল। অল্প দিন অন্য হস্তে থাকিয়া দৈনিক প্রায় ১৪ বৎসর ক্ষেত্রমোহনের সম্পাদকীয় হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল।

"এখন [ইং ১৯০৪] 'বঙ্গবাসী'র সহিত ক্ষেত্রমোহনের সম্বন্ধ নাই, তিনি 'বসুমতী' পত্রের সম্পাদন পক্ষে সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্যে যে 'বঙ্গবাসী' অনেক দিন অনেক উপকার পাইয়াছে, ক্ষেত্রমোহনের নানাবিধ প্রবন্ধে যে কিছুকাল 'বঙ্গবাসী' অনেক গৌরব-লাভ করিয়াছে, এ কথা 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী মহাশয় এখনও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। রাজনীতি এবং অর্থনীতির আলোচনায় ক্ষেত্রমোহনের সমকক্ষ পাওয়া দুর্ল্লভ।...সংবাদপত্রসম্পাদনেই তিনি জীবন অতিবাহিত করিলেন। এ কার্য্যে তাঁহার শিষ্য-সংখ্যাও কম নহে। এ পক্ষে তিনি অনেকেরই গুরুস্থানীয়।" ('বঙ্গভাষার লেখক,' পৃ. ৯১৩-১৪)।

রচনাবলী

ক্ষেত্রমোহন আমরণ সংবাদপত্রেরই সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মাসিকপত্রেও মাঝে মাঝে তাঁহার গল্প-উপন্যাস প্রবন্ধাদি সাদরে স্থান লাভ করিয়াছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ 'প্রদীপে'র (১৩০৮-১০) উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্ষেত্রমোহন পুস্তকাকারে বিশেষ কিছুই রাখিয়া যান নাই। আমরা তাঁহার মাত্র তিনখানি পুস্তকের কথাই জানি; সেগুলি—

১। **মদনমোহন** (উপন্যাসে প্রকৃত ঘটনা)। ১২৯৬ সাল (২৫-২-১৮৯০)। পৃ. ১১৯

"মদনমোহন দৈনিকের জন্য দিন দিন লিখিত হইয়াছিল; দিন দিন দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

২। **শিক্ষা এবং উপদেশ।** (১ এপ্রিল ১৮৯৬)। পৃ. ১৫২

'দৈনিকে' প্রকাশিত প্রবন্ধ-সমষ্টি। ইহা বিদ্যালয়ের বৃত্তি-পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছিল।

৩। **সচিত্র বয়ন-বিদ্যা** বা তাঁত-শিক্ষা। ১৩১৩ সাল (২১ আগষ্ট ১৯০৬)। পৃ. ৭২

বয়নশিল্পের ইতিহাস স্বল্প কথায় সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত।

মৃত্যু

২৩ মে ১৯১৮ তারিখে ক্ষেত্রমোহন পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে জলধর সেন তৎসম্পাদিত 'ভারতবর্ষে' (আষাঢ় ১৩২৫) যে শোক-সংবাদ লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"৺ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, আমাদের পূজনীয় দাদা মহাশয়, গত ২৩শে মে রাত্রিতে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি সংবাদপত্র-লেখকগণের সকলেরই দাদা মহাশয় ছিলেন। আমরা তাঁহারই চরণতলে বসিয়া সংবাদপত্র সম্পাদনের প্রথম পাঠ লইয়াছি। তিনি প্রথমে স্কুলের ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন; তাহার পর সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্রে যোগদান করেন। প্রভাতী, দৈনিক-চন্দ্রিকা ও দৈনিক-বঙ্গবাসীর তিনি সম্পাদক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন সহচর, নববিভাকর, সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী প্রভৃতি পত্রের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়েই দাদা মহাশয়ের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। দাদা মহাশয়কে Encyclopaedia বলিতাম; ইংরাজ-রাজত্বের আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এমন কোন ঘটনা নাই, যাহার সঠিক বিবরণ, মায় সন তারিখ তিনি মুখে মুখে বলিয়া দিতে না পারিতেন। সংবাদপত্র-সম্পাদনকালে তাঁহাকে, যত বড় কঠিন বিষয়ই হউক না কেন, প্রবন্ধ লিখিতে বলিলে, পুথিপত্র না দেখিয়া তখন-তখন এমন প্রবন্ধ লিখিয়া দিতেন যে, আর কেহ মাসাধিক কাল পরিশ্রম করিয়াও তত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। অমন জলদ্ লিখিয়ে আমরা দেখি নাই, অমন বহুদর্শী সম্পাদকও আর ছিল না।"*

---

* ক্ষেত্রমোহনের প্রতিকৃতি—'প্রদীপ,' মাঘ ফাল্গুন ১৩০৮ ও 'ভারতবর্ষ,' শ্রাবণ ১৩২৫ দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৮৪

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক, ১৩৫৮

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
৭.৫—২৪।১০।১৯৫১

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৮৪২—১৯১৬

উনবিংশ শতকের গোড়ায় বাংলা-গদ্যের আবির্ভাব-কাল হইতে গল্পপিপাসু বাঙালীর মনের খোরাক জুটিয়াছিল প্রধানতঃ সংস্কৃত, ফার্সী, হিন্দী ও ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণের মধ্যে। বাংলা-গদ্যের আদি লেখকেরা সকলেই অল্পবিস্তর এই কার্য্য করিয়াছিলেন। ফলে বাংলা ভাষায় হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎ-সাগর, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, হাতেমতাই, বেতালপঞ্চ-বিংশতি, কাদম্বরী, রাসেলাসের আমদানি হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে পাশ্চাত্য মতে উপন্যাস বা নভেলের প্রবর্ত্তন হয়। কিন্তু লেখকদের সংখ্যাল্পতা হেতু বিপুল পাঠক-সাধারণের মনের চাহিদা ঐ পথে নিবৃত্ত হয় না। অনুবাদ-অনুসরণের প্রবাহ বহিতেই থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে কয় জন ভগীরথ এই প্রবাহ বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন, ভুবনচন্দ্র তাঁহাদের অগ্রণী ও প্রধান। তাঁহার অক্লান্ত লেখনী বাঙালীকে অনেক বৈদেশিক গল্প একান্ত দেশী রূপ দিয়া শুনাইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির প্রকাশ্য সাহিত্য-সাধনার আমরা খবর রাখি; কিন্তু গুপ্তকথা ও রহস্য-গল্পের বিপুল গোপন ধারা আমাদের অগোচরে রহিয়া গিয়াছে। যাহা এককালে আমাদের অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজকে ও অন্তঃপুরকে মাতাইয়াছিল, কালের প্রচণ্ড আঘাতে তাহা আজ বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এগুলির সাহায্যে আমাদের

মাতৃভাষা যে পুষ্ট হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে আমাদের প্রত্যবায় হইবে। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা মধুসূদন-কালীপ্রসন্ন সিংহের উত্তর-সাধক রহস্যোপন্যাসের রাজা ভুবনচন্দ্রকে স্মরণ করিলাম। তাঁহার নিজের দাবি খুব অধিক ছিল না। ১৯০০ সনে প্রকাশিত 'ঠাকুরবাড়ীর দপ্তরে'র ১ম খণ্ডে "অগ্রপত্রে আমন্ত্রণ" অংশে তিনি লিখিয়াছেন :—

"বিষয়-সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি আমি সবিশেষ আগ্রহে মাতৃভাষায় বাঙ্গলীয় কাব্যসাহিত্যের সেবা করিতেছি। সংবাদপত্র পরিচালন ব্যতীত সমাজস্পর্শী পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়নেও আমার আন্তরিক অনুরাগ। কৃতকার্য্য হইতে পারি আর নাই পারি, অনুরাগের মায়া কাটাইতে পারি না। ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র জন্ম। সেই রহস্যোপন্যাসখানি আমার লেখনী-লতিকার প্রথম ফুল—প্রথম ফল। তদবধি উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া, স্বদেশীয় জনরঞ্জনার্থ বিবিধ উপন্যাসে, নবন্যাসে, খণ্ডকাব্যে, ধর্ম্মপ্রসঙ্গে এবং সামাজিক চিত্রে আমি বহু শ্রম, বহু যত্ন ও বহু সময় অর্পণ করিয়া আসিতেছি। পাঠগুলি সারশূন্য না হয়, সমাজ তাহা হইতে কিছু কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হন, সর্ব্বথা সর্ব্বদা তাহাই আমার লক্ষ্য।"

তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, এইটুকুই আমাদের বক্তব্য।

জন্ম : শৈশব-শিক্ষা

১৮৪২ সনের ২০এ জুলাই (৬ শ্রাবণ ১২৪৯) ভুবনচন্দ্রের জন্ম হয়। চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ-বারুইপুরের সন্নিহিত শাসন গ্রামে তাঁহার মাতামহাশ্রম।

ভুবনচন্দ্র প্রধানতঃ মিশনরী স্কুলেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই তাঁহাকে অন্নসংস্থানে সচেষ্ট হইতে হয়। শিক্ষা-সমাপ্তির পর তিনি বারুইপুর সরকারী-সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে ৮ মাস প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন; মাঝে মাঝে গৃহশিক্ষকের কাজও করিয়াছেন। শৈশবাবধি মাতৃভাষায় ভুবনচন্দ্রের গভীর অনুরাগ ছিল, সুতরাং উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

সাময়িকপত্র সম্পাদন

'পরিদর্শক' : ১৮৬১ সনের জুলাই মাসে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনগোপাল গোস্বামীর সম্পাদনায় 'পরিদর্শক' নামে একখানি ক্ষুদ্রকলেবর দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়। ভুবনচন্দ্র তাহাতে মাঝে মাঝে কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার কবিতা তর্কালঙ্কারকে আনন্দ দান করিত। পর-বৎসর ১৪ই নবেম্বর হইতে বর্দ্ধিত কলেবরে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ 'পরিদর্শকে'র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হন। এই সময়ে ভুবনচন্দ্র হঠাৎ এক দিন ডাকযোগে তর্কালঙ্কারের একখানি পত্র পান; পত্রে অবিলম্বে চিৎপুরের 'সারস্বত আশ্রম' উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইয়া সিংহ-মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নির্দ্দেশ ছিল। সাক্ষাতের ফল ভালই হইয়াছিল। ভুবনচন্দ্র 'পরিদর্শক'-সম্পাদনে তর্কালঙ্কারের সহকারী নিযুক্ত হন। কিন্তু তিন মাস যাইতে না যাইতেই প্রধানতঃ গ্রাহকবর্গের অনাদরের জন্য কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শকে'র প্রচার রহিত করিলেন। তিনি ভুবনচন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন থাকায়, শীঘ্রই ভাল চাকরি

করিয়া দিবেন এই আশ্বাস দিয়া তাঁহাকে নিকটেই রাখেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' ১ম খণ্ড প্রচারের অব্যবহিত পরেই ভুবনচন্দ্র তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। বছর-দুই পরে তিনি নিজে কালীপ্রসন্নের 'হুতোমে'র আদর্শে 'সমাজ কুচিত্র' নামে একখানি সামাজিক নক্শা প্রকাশ করিয়া উহা "সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয় অনরেবল হুতোম"কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ছদ্ম নামে প্রচারিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ-প্রকাশে ইহাই তাঁহার প্রথম উদ্যম।

'সোমপ্রকাশ' : দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' পত্রের জন্য এক জন সুযোগ্য সহকারী অন্বেষণ করিতেছেন,—কালীপ্রসন্ন-নিয়োজিত মহাভারতের অনুবাদক এক পণ্ডিতের নিকট এই সংবাদ পাইয়া প্রার্থী হিসাবে ভুবনচন্দ্র চাংড়িপোতা গ্রামে গিয়া বিদ্যাভূষণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভুবনচন্দ্র এই পদে যোগ্যতার সহিত দেড় বৎসর কাজ করিয়াছিলেন।

'সংবাদ প্রভাকর' : অতঃপর ভুবনচন্দ্র সহকারী সম্পাদক-রূপে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে যোগদান করেন (ইং ১৮৬৮?)। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত তখন 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক। ভুবনচন্দ্র ২২ বৎসর এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

'সংবাদ প্রভাকরে'র সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালে ভুবনচন্দ্র দুইখানি স্বল্পায়ু মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন; সেগুলি—

'বিদূষক' : "যাঁহারা প্রকৃতির গতি ও মানুষের স্বভাব জানিতে আমোদ বোধ করেন, তাঁহাদিগের জন্য এই রহস্য-পত্রিকার জন্ম।" প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (ডিসেম্বর ১৮৭০)।

'পূর্ণ শশী' : ইহা প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ১২৮০ (নবেম্বর ১৮৭৩)।

'বসুমতী' ঃ ১৩০৩ সালের ১০ই ভাদ্র (২৫ আগষ্ট ১৮৯৬) সাপ্তাহিক-রূপে 'বসুমতী'র প্রথম আবির্ভাব। ইহার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে পর-বৎসর ভুবনচন্দ্র 'বসুমতী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ১৩০৫ সালের ৬ই ফাল্গুন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইলে ভুবনচন্দ্র বসুমতীর গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগে যোগদান করেন। এই সময় তাঁহার সহিত 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় বিভাগের যে কোন যোগ ছিল না, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। ১৩০৬ সালে ভুবনচন্দ্রের 'ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর' প্রকাশিত হয়; উপেন্দ্রনাথ পুস্তকের নিবেদনে লিখিয়াছিলেন :— "শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার মহাশয় আমাদের 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক-সমিতির সভাপতি, সেই গৌরব স্মরণ করিয়া, আমি আহ্লাদপূর্ব্বক এই পুস্তকখানির প্রকাশকের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।" ভুবনচন্দ্র দীর্ঘকাল 'বসুমতী'র সহিত যুক্ত ছিলেন। বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে তাঁহার জীবিতকালে—এমন কি মৃত্যুর পরেও অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল।

'জন্মভূমি' ঃ ১৩০৭ সালে এই মাসিক পত্রিকার নব পর্য্যায় প্রকাশিত হয়। ভুবনচন্দ্র ইহার সহিত ওতপ্রোত ছিলেন। 'জন্মভূমি'র পৃষ্ঠায় তাঁহার বহু রচনা—কবিতা, গল্প, প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ১১শ ভাগের (১৩০৯ সাল) প্রথম কয়েক সংখ্যার সম্পাদক-রূপে সরকারী বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় তাঁহার নাম মুদ্রিত আছে। 'জন্মভূমি'র দত্ত-পরিবারের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ছিল। গঙ্গাস্নানের সুবিধা হইবে বলিয়া ১৩০৩ সাল হইতে মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি দত্ত-পরিবারের ৩৯ মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

মৃত্যু

প্রৌঢ়াবস্থার পূর্ব্বেই ভুবনচন্দ্র বিপত্নীক হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী একটি পুত্র (শশিভূষণ) ও একটি কন্যাসন্তান রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। ভুবনচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় তাঁহার জামাতা, 'রেজিষ্টারী দর্পণ' প্রভৃতি প্রণেতা, সাব-রেজিষ্টার (কাঁটালপাড়া-নিবাসী) অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছিল। রোগ, শোক, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ—সকলই ভুবনচন্দ্র নীরবে সহ্য করিয়াছেন; কোন কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ১৩২৩ সালের ২রা শ্রাবণ (১৮ জুলাই ১৯১৬) তারিখে, ৭৪ বৎসর বয়সে, তিনি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তৎ-সম্পাদিত 'নায়কে' (২০ ভাদ্র) বড় দুঃখেই লিখিয়াছিলেন :—

"একটা কথা সাহিত্য-পরিষদ্, সাহিত্যসভা প্রভৃতি মোড়লদের জিজ্ঞাসা করিব, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মরিয়াছেন, তোমাদের সে খবর আছে কি? আলালের সময় হইতে যিনি বাঙ্গালার গদ্য পদ্য লেখক, মাইকেলের সহচর, যাঁহার লিখিত পুস্তকরাশির সংখ্যা করা যায় না, যাঁহার পাঠকগণেরও সংখ্যা হয় না—সেই সরল, সোজা, দেশী বাঙ্গালা গদ্যের লেখক ভুবনচন্দ্রের মতন অনুবাদক বাঙ্গালায় আর ছিল না—বোধ হয় আর হইবে না। আর ......, তুমি ভুবনচন্দ্রের মনীষা বেচিয়া এত অর্থ পাইয়াছ, তুমি সেই বুড়ার মরণে কি করিলে? কি করিবে? নাটুকে রামনারায়ণের সময় হইতে যে ভুবনচন্দ্রের প্রতিভা একটানা গঙ্গাস্রোতের মত সমান ভাবে ষাট বৎসরকাল বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বহিয়া গিয়াছে,

সেই ভুবনবাবুর দলের একজন ছিল না বলিয়া আজ বিস্মৃতিসাগরে ডুবিল।"

গ্রন্থাবলী

ভুবনচন্দ্রের গ্রন্থের সংখ্যা মোটেই অল্প নহে। তিনি কাব্য, গল্প-উপন্যাস, সামাজিক নক্‌শা, প্রহসন, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী —এক কথায় বাংলা-সাহিত্যের সকল বিভাগেই কিছু না কিছু লিখিয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহাকে দ্বিতীয় রাজকৃষ্ণ রায় বলা যাইতে পারে। রাজকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও বাংলা-সাহিত্যকে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাভঙ্গী ছিল সরল ও সুন্দর। অনুবাদেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট; ইংরেজী ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। বর্ত্তমানে ভুবনচন্দ্রের সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করা সুকঠিন। আমরাও সবগুলি দেখি নাই, কতকগুলির উল্লেখমাত্র পাইয়াছি। অসম্পূর্ণ হইলেও তাঁহার গ্রন্থগুলির একটি তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশ-কাল সরকারী বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। **সমাজ কুচিত্র**। জানুয়ারি ১৮৬৫। পৃ. ৬৮।

ইহা "নিশাচর প্রণীত, Published by B. Mook. Pen and Co." এই "B. Mook." "ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" নামেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। "স্বয়ং ভুবনচন্দ্রের মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ" করিয়া, তাঁহারই জীবিতকালে যতীন্দ্রনাথ দত্ত তৎসম্পাদিত 'জন্মভূমি'তে (ভাদ্র ১৩১০)

তাঁহার যে জীবনী প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি লেখেন :—"১৮৭০-৭১ সনে খণ্ডশ: প্রকাশিত গুপ্তকথা লিখিবার অগ্রে সমাজ কুচিত্র নামে তিনি একখানি সামাজিক নক্‌শা প্রণয়ন করেন, সেখানি হুতোমের ভাষার অনুকরণ, বিজ্ঞ লোকে তাহা পাঠ করিয়া প্রকৃত চিত্র বলেন, হুতোম নিজেও প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ২৩ বৎসর পরে—১৮৮৯ সনের জানুয়ারি মাসে অংশ-বিশেষ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া তাঁহার জামাতা অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সমাজ কুচিত্রে'র ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'সমাজ কুচিত্র' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র সহিত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২। এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! ইং ১৮৭০-৭৩। পৃ. ৮৭০।

রেনল্ডসের *Joseph Wilmot*এর ছায়াবলম্বনে। 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র (দ্র° ৩৩ নং) গোড়ার পর্ব্ব ও আদি রূপ। ১৮৭০ সনের ডিসেম্বরে সংখ্যানুক্রমে ৮ পৃষ্ঠা করিয়া প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৭৩ সনের বসন্তকালে সমাপ্ত হয়। গ্রন্থশেষে প্রকাশকের [শোভাবাজারস্থ নবীনকৃষ্ণ বসু] লিখিত "কৌতূহল পরিতৃপ্তি" অংশে (পৃ. ৮৬৯-৭০) প্রকাশ :—

"কলিকাতা শোভাবাজারের রাজকুল-কিশোর স্বজাতীয় কাব্য সাহিত্যের অকপট অকৃত্রিম মিত্র, শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এতৎ উপাখ্যানের মূল গ্রন্থি, মূল মর্ম্ম, মূল বৃত্তান্ত এবং মূল মূল সমস্ত আখ্যানকাণ্ড আখ্যান করেন। তাঁহার উপদেশে, তাঁহার সাহায্যে, এবং তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে, তাঁহার অকৃত্রিম পরম মিত্র সংবাদ প্রভাকর পত্রের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপযুক্ত অলঙ্কারাদি যোগে উক্ত রাজকুমার বাহাদুরের নামে (আর এই আখ্যানের অঙ্গীভূত যা কিছু থাকা সম্ভব, উক্ত রাজকুমার বাহাদুরের সহায়ে, উৎসাহে, অধ্যবসায়ে, উত্তেজনায় আর মনোনিবেশে) এই আখ্যানটি রচনা করেন।”

৩। **তুমি কি আমার?** (নবন্যাস)। ইং ১৮৭৩-৭৯। পৃ. ৪৯৬।

“আমার গুপ্তকথা!—অতি আশ্চর্য্য!!!’ নামে যে নবন্যাস দুই বৎসরাবধি প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা সমাপ্ত হইয়া আসিল।...অদ্য ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায়, সম্বৎসৃষ্টির আদি দিবসে (১৯৩০ অব্দে) ‘তুমি কি আমার?’ আখ্যা দিয়া এই নবীন দ্বিতীয় আখ্যায়িকা প্রকাশ করিলাম।...ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় প্রকাশ হইবে।” গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ; ১ম খণ্ডের প্রকাশকাল—৩১-৮-৭৩, পৃ. ১-১২০; ৩য় বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সম্বতে (ইং ১৮৭৯), পৃ. সংখ্যা ২৩৭-৪৯৬।

৪। **মধু-বিলাপ** (অমিত্রাক্ষর কাব্য)। ১৯৩০ সম্বৎ (২৫ জুলাই ১৮৭৩)। পৃ. ১২।

“মাইকেল মধুসূদন দত্ত-বিয়োগ-বিলাপ।”

৫। **রহস্য-মুকুর** আশ্চর্য্য গুপ্তকথা!! (উপন্যাস):

আট-পেজী ১ ফর্ম্মা করিয়া প্রতি সপ্তাহে সংখ্যানুক্রমে প্রচারিত।

১ম পর্ব্ব (১-৩০ সংখ্যা): ইং ১৮৭৭। পৃ. ১-২৩৬।

২য় পর্ব্ব (৩১-৬৬ সংখ্যা): ইং ১৮৭৮। পৃ. ২৩৭-৫২০।

৬। বঙ্গোপন্যাস: **চারুশীলা**। ইং ১৮৮১।

৭। **আমি রমণী** (কাব্য)। ১২৮৮ সাল (৯ জুলাই ১৮৮১)। পৃ. ৯১।

৮। **হীরাপ্রভা** (উপন্যাস)। (২৮ মে ১৮৮৩)। পৃ. ৬০।

৯। আশা-চপলা (নবন্যাস):

আট-পেজী ৮ ফর্মা করিয়া প্রতি মাসে।০ মূল্যে প্রচারিত।

১ম ভাগ। ইং ১৮৮৪। পৃ. ১-৭৬২।

২য় ভাগ। ইং ১৮৮৫। পৃ. ৭৬৩-১২৮৬।

১০। ছোট বউ (উপন্যাস)। (১৫ অক্টোবর ১৮৮৫)। পৃ. ৫৯।

১১। ঠাকুরপো (প্রহসন)। (২০ অক্টোবর ১৮৮৬)। পৃ. ৭৮।
"প্রজাপতি"-প্রণীত।

১২। যাত্রা-বিলাস। বঙ্গের যাত্রার আসরের নক্সা। ১২৯৩ সাল (১ জানুয়ারি ১৮৮৭)। পৃ. ১৯।

১৩। তুমি কে? (অমিত্রাক্ষর কাব্য)। শকাব্দা ১৮০৮ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭)। পৃ. ২৪।

১৪। ভারতীয় রহস্য, ১ম খণ্ড: আমার মহিষী (উপন্যাস)। ১২৯৪ সাল (৫ আগষ্ট ১৮৮৭)। পৃ. ৪০৬।

১৫। বিলাতী গুপ্তকথা, ১ম-২য় খণ্ড। ইং ১৮৮৮-৮৯। পৃ. ৭৪৫ + ৭৮৪।

রেনল্ডসের *Joseph Wilmot*এর বঙ্গানুবাদ।

১৬। কুঞ্জবালা কাশ্মীর-কুসুম (উপন্যাস)। ১২৯৭ সাল (২৯ জুলাই ১৮৯০)। পৃ. ২৮২।

১৭। বঙ্কিম বাবুর গুপ্তকথা (উপন্যাস):

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি কর্তৃক প্রণীত।

১ম খণ্ড। ইং ১৮৯০। পৃ. ৩৩৬।

২য় খণ্ড। সম্বৎ ১৯৪৭। পৃ. ৩৩৭-৬৪৪।

১৮। কমলকুমারী ও রাজা সন্ন্যাসী (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৮১৩ শক (২৭-১২-১৮৯১)। পৃ. ১৫০।

১৯। স্বদেশ বিলাস (সন্দর্ভ)। ইং ১৮৯৩। পৃ. ৫৩।

২০। পারুল বা সেই কি তুমি? (উপন্যাস)। (১৭ জুলাই ১৮৯৩)। পৃ. ২০১।

২১। অগ্নিকুমারী (উপন্যাস)। ১৩০০ সাল (২৯-১-১৮৯৪)। পৃ. ১৯৬।

২২। আনন্দ-লহরী (উপন্যাস)। ১৩০১ সাল (২৯ আগষ্ট ১৮৯৪)। পৃ. ১৩৯।

২৩। মার্কিন পুলিস কমিশনর:

১ম খণ্ড…হারাধনের অনুসন্ধান…(১৬-৬-৯৬)। পৃ. ৬৪।
২য় খণ্ড…মেয়ে চুরি…(২৫-৭-৯৬)। পৃ. ৬০।
৩-৫…অপূর্ব্ব নারী ডিটেকটিভ…(১২-১০-৯৬)। পৃ. ২৬৮।
৬ষ্ঠ খণ্ড…জাল বিবি…(১২-১০-৯৬)। পৃ. ৬০।

২৪। গুপ্তচর (ডিটেকটিভ উপন্যাস)। (২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৮)। পৃ. ১৯১।

২৫। মহাদেবের মাদুলী (রঙ্গরচনা)। ?। পৃ. ৪২।
"দোক্তাভক্তের বক্ত্রলীলা"।

২৬। ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর। অভিশপ্ত য়িহুদী, ১-৪ খণ্ড। (অক্টোবর ১৯০০)। পৃ. ৮০০।
ইউজিন সু-লিখিত 'ওয়াণ্ডারিং জু' অবলম্বনে।

২৭। **ধর্ম্মরাজ** (সচিত্র সমাজ-রহস্য)। ১৩০৭ সাল (১৮ মার্চ ১৯০১)। পৃ. ৮৮।

ভুবনচন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। "ধর্ম্মরাজ বসুমতীতে নিয়মিত প্রকাশিত হইত, আমাদের কতকগুলি পৃষ্ঠপোষক গ্রাহকগণের অনুরোধে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের কয়েকটি রসাত্মক কবিতা ইহার শেষাংশে সংযোজিত হইল।"

২৮। **রামকৃষ্ণ-চরিতামৃত**। ২০ ভাদ্র ১৩০৮ (৭-১০-১৯০১)। পৃ. ৯২।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী। জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ কর্ত্তৃক স্তুতিগীতি সহ।

২৯। **রজতকুমারী** (গলিভাস ট্রাভল্‌স)। (১০ জুলাই ১৯০২)। পৃ. ২৫৪।

ইহাই চারি খণ্ডে সচিত্র আকারে পর-বৎসর 'আমার অপূর্ব্ব ভ্রমণ !' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

৩০। **আমিনা বাই** (উপন্যাস)। (১৭ জুলাই ১৯০২)। পৃ. ২৯৬।

৩১। **চন্দ্রমুখী** (ডিটেকটিভ গল্প)। ১৩০৯ সাল (২ সেপ্টেম্বর ১৯০২)। পৃ. ২৪৩।

নন্দন-কানন—৩য় বল্লরী।

৩২। **সন্তপ্ত সয়তান** (নন্দনকানন উপন্যাস সিরিজ)। ১৩১০ সাল, ইং ১৯০৩-৪। পৃ. ৮৯৯।

মারী কোরেলীর *Sorrows of Satan*এর বঙ্গানুবাদ।

৩৩। আর এক নূতন! **হরিদাসের গুপ্তকথা** (নবন্যাস)। ফাল্গুন ১৩১০ (২৭-৩-১৯০৪)। পৃ. ৬৪৪।

"চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। (নূতন লিখিত—আধুনিক বঙ্গের সমাজ-চিত্র)।" গ্রন্থকার "নিবেদনে" লিখিয়াছেন, "ইহার আদ্যোপান্ত নূতন অলঙ্কারে সজ্জিত ;—সমস্তই নূতন, সর্ব্বাংশেই নূতন, সম্পূর্ণরূপেই নূতন।"

৩৪। **বঙ্গরহস্য,** ১ম-২য় খণ্ড (নক্সা)। ১৩১১ সাল, ইং ১৯০৪। পৃ. ৪৪২।

৩৫। **বাবু-চোর** (উপন্যাস)। ইং ১৯০৬ (১৬ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ১৮২।

৩৬। **সয়তানী** (নন্দনকানন উপন্যাস সিরিজ)। ১৩১৩ সাল (১২ আগষ্ট ১৯০৬)। পৃ. ১২০।

৩৭। **সিপাহী-বিদ্রোহ** বা মিউটিনী (ইতিহাস)। ১৩১৪ সাল (২৩ নবেম্বর ১৯০৭)। পৃ. ৫৩৪।

৩৮। **ভবের খেলা** (সংসার-চিত্র)। ১৩১৫ সাল (১ সেপ্টেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ৩৭৩।

৩৯। **বিলাতী স্বর্ণবাই** (সাহেব বিবির গুপ্তকথা)। ১৩১৭ সাল (ইং ১৯১০)। পৃ. ২৫৬।

৪০। **শ্রীমন্ত সওদাগর.** (পৌরাণিক আখ্যান)। ১৯৬৯ সংবৎ (২৩ জানুয়ারি ১৯১২)। পৃ. ১৭০।

"পূর্ব্বতন সামাজিক ইতিহাসের এক অংশ—জনৈক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সুলেখকের লেখনী-প্রসূত।" বটকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪১। **লণ্ডন রহস্য,** ১ম স্তবক। ইং ১৯১২-১৪। পৃ. ৫৫৬।

রেনল্ডসের *Mysteries of the Court of London* অবলম্বনে লিখিত। খণ্ডশঃ প্রকাশিত; ১ম খণ্ডের প্রকাশকাল—৫ জুলাই ১৯১২; ১৫শ খণ্ডের—১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪। ১৬শ খণ্ড হইতে দ্বিতীয় স্তবকের আরম্ভ, উহা অনুবাদ করেন—দীনেন্দ্রকুমার রায়।

৪২। **সংসার-সাগর** (উপন্যাস)। ১৩১৮ সাল (১৭ আগষ্ট ১৯১২)। পৃ. ১৯০।

৪৩। **প্রেমের বাজার** (উপন্যাস)। ১৩১৯ সাল (১ অক্টোবর ১৯১২)। পৃ. ৪২।

এইচ. ডি. মান্না এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

৪৪। **বিলাতী ভুত** (উপন্যাস)। (৮ মার্চ ১৯১৫)। পৃ. ১৫৫।

৪৫। **জেলখানা** (উপন্যাস)। ? (২০ অক্টোবর ১৯১৯)। পৃ. ১৫৮।

৪৬। **ডিউক তারাচাঁদ** (ডিটেকটিভ উপন্যাস)। (২০ জুন ১৯২০)। পৃ. ৮৮।

৪৭। **রাণী ইউজিনীর বৈঠক** (উপন্যাস)। ? (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪)। পৃ. ৩২১।

জর্জ রেনল্ডসের গ্রন্থ হইতে অনূদিত।

ভুবনচন্দ্রের আরও কতকগুলি পুস্তক-পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; সেগুলি—

১৮৮৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত 'তুমি কে?' পুস্তকের মলাটে অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্বশুরের এই পুস্তকগুলির বিজ্ঞাপন দিয়াছেন :—

১। বুড়ী-প্রণীত 'বাসর-ঘর' ✓০

২। 'আদর্শ-দর্পণ' (দলিল রেজেষ্টারী বিষয়ক), ২য় সং…।✓০।

যন্ত্রস্থ :—মহরম ১৲, দারোগা-বিলাস ॥০, কামিনী-বিলাস ॥০, ডাকিনী-বিলাস ।০।

১২৯৪ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা (ইং ১৮৮৭) 'ভারতী'তে ভুবনচন্দ্রের এই "নূতন পুস্তকগুলির" বিজ্ঞাপন আছে :—

বাঁশরী, নবদুর্গা, সর্ব্বনাশী, গোস্বামীর সাগর যাত্রা বা বাঙ্গালা বই।

যতীন্দ্রনাথ দত্ত তৎসম্পাদিত 'জন্মভূমি'তে (ভাদ্র ১৩১০) ভুবনচন্দ্রের এই কয়খানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন :—

নেপোলিয়ন, রত্নগিরি, ভারতবিলাস, বঙ্গবিলাস, পারস্য উপন্যাস ও তুরস্ক উপন্যাস।

চৈতন্য লাইব্রেরির পুরাতন পুস্তক-তালিকায় ভুবনচন্দ্রের এই বইগুলির নাম পাওয়া যাইতেছে :—

রাজা আদিত্যনারায়ণের গুপ্তকথা, গোয়েন্দার গল্প (মাইকেল মোহনচাঁদ), উপন্যাস ভাণ্ডার ১ম-২য় ভাগ, উপন্যাস ভাণ্ডার (১৫টি সম্পূর্ণ গল্প)।

ভুবনচন্দ্র মোটেই নামের কাঙাল ছিলেন না; তাঁহার কোন কোন গ্রন্থে প্রকাশকেরা তাঁহার নামটিও গ্রন্থকার-হিসাবে মুদ্রিত করেন নাই! তিনি ছিলেন সাহিত্যরসিক—বহু লেখকের রচনার সংস্কার করিয়া দিয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষার সেবায় উৎসাহিত করিয়াছেন।

"হুগোলকুড়িয়া-নিবাসী স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ রায় নামক এক মহানুভব ব্যক্তি 'শ্রীশ্রীহরিবংশ' গ্রন্থ প্রকাশ করিতে অভিলাষী হওয়ায়, ভুবনচন্দ্র বিশেষ উৎসাহের সহিত সেই কার্য্যে যোগদান করেন। কুইন্স কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন অনুবাদ করেন, ভুবনচন্দ্র বিশেষ যত্ন সহকারে তাহার ভাষা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বাওয়ালির জমিদার স্বর্গীয় বাবু কালীকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয় কাশীখণ্ড প্রকাশে ব্রতী হইলে নবদ্বীপের একজন পণ্ডিতের সাহায্যে ভুবনচন্দ্র প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় তাহার অধিকাংশের বঙ্গানুবাদ করেন।...'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদন সময়ে কুষ্টিয়া-নিবাসী সৈয়দ মীর মশারফ হোসেন নামক একজন মুসলমান যুবক দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতে আনেন, ভুবনচন্দ্র তাহা উত্তমরূপে সংশোধন করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সুসজ্জিত করেন, একখানির নাম 'বসন্তকুমারী'—দ্বিতীয় খানির নাম 'বিষাদসিন্ধু'। শেষোক্ত পুস্তকখানি মহরমের শোকসূচক ঘটনার মূল...।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় ['মায়াকানন'] নাটকখানি লিখিতে লিখিতে অসম্পূর্ণ রাখিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, নাটকের একটি অঙ্ক লেখা বাকি ছিল, সেই অঙ্কেই উপসংহার কি হইবে, ভাবিয়া থিয়েটারের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ব্যাকুল হন, শেষ অঙ্কে কি কি থাকিবে, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বুদ্ধিপ্রভাবে মৃত্যুশয্যাশায়ী নাট্যকারের মুখ হইতে তাহার স্থূল ভাব শুনিয়া রাখিয়াছিলেন, শরৎবাবুর নিকটে তাহার মর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ভুবনচন্দ্র সেই নাটকখানি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।" ("স্বর্গীয় ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" : যতীন্দ্রনাথ দত্ত।—'প্রবর্ত্তক,' ভাদ্র ১৩৪৩)

———

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

১৮৫১—১৯০৩

জন্ম : শিক্ষা : বিবাহ

১২৫৮ সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৮৫১) খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন কপোতাক্ষী-তীরবর্ত্তী সারসা গ্রামে ঠাকুরদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নবকুমার মুখোপাধ্যায়। সারসারই পরপারে সাগরদাঁড়ি, মাইকেল মধুসূদনের জন্মভূমি।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাসের পাঠারম্ভ হয়। তিনি ২৪-পরগণা গোবরডাঙ্গার ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়ন করেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে স্কুলে তাঁহার সুনাম ছিল। এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, ফলে তাঁহার পরীক্ষাও দেওয়া হয় নাই, পড়াশুনাও বন্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ১৮ বৎসর। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও ঠাকুরদাসের অধ্যয়ন-স্পৃহা চিরদিন বলবতী ছিল। তিনি বলিতেন, "পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও কবিগণের মধ্যে আমি মেকলে কার্লাইল এমার্সন বায়রন ও স্কট এবং দেশীয়গণের মধ্যে মুকুন্দরাম মাইকেল হেমচন্দ্র দীনবন্ধু কেশব বঙ্কিম কালীপ্রসন্ন এবং অক্ষয়চন্দ্রের নিকট ঋণী।"

পিতার মৃত্যুর অল্প দিন পরেই ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়। সংসারের গুরুভার নিঃস্ব ঠাকুরদাসের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে, অন্নচিন্তায় তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয়।

অন্নসংস্থানে

ঠাকুরদাসের প্রথম চাকরি—স্বগ্রামস্থ মাইনর-স্কুলের হেডমাষ্টারি; ইহা বোধ হয় ১৮৭১ সনের কথা। কিছু দিন পরে স্বাস্থ্যলাভের আশায়—কতকটা কাজকর্ম্মের চেষ্টাতেও বটে—তাঁহাকে বিহার অঞ্চলে গমন করিতে হয়। তথায় অবস্থানকালে তিনি ছাপরা স্কুলের শিক্ষকের পদ লাভ করেন। অবশেষে ১৮৭৬ সনে দ্বারভাঙ্গা মহারাজের কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের অধীনে তাঁহার একটি ভাল চাকরি জুটিয়া যায়। এই পদে তিনি ১৮৯১ সনের শেষ পর্য্যন্ত বহাল ছিলেন। অতঃপর তিনি 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করেন।* আড়াই বৎসর কৃতিত্বের সহিত সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিবার পর 'বঙ্গবাসী'র সহিত তাঁহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। আনুমানিক ১৮৯৮ সনে তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ষ্টেটে একটি চাকরি লাভ করেন, কিন্তু সে অতি অল্প দিনের জন্য।† ঠাকুরদাস

* ১৮৯২, ২৩এ ডিসেম্বর তারিখে নবীনচন্দ্র সেন একখানি পত্রে ঠাকুরদাসকে লেখেন: "I am indeed sorry to hear that you have left your late service and turned on a new leaf since. On which paper staff are you serving now and what are your prospects?" ঠাকুরদাসকে লিখিত নবীনচন্দ্রের পত্রাবলী—দ্র° 'ভারতবর্ষ,' জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক ১৩২৪।

† ১৩০৬, ৭ই কার্ত্তিক তারিখে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে ঠাকুরদাসকে লেখেন: "আমাদের সম্বন্ধ পরিত্যাগের পর হইতে আপনার আর কোনও চিঠিপত্র পাই নাই।" ১৩০৩ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'জন্মভূমি' (পৃ. ১১৭) পাঠে জানা যায়, ঠাকুরদাস তখন বেকার। তিনি সম্ভবতঃ ১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ঠাকুর-বাড়ীতে একটি কর্ম্ম পান। ঠাকুরদাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী—দ্র° 'ভারতবর্ষ,' বৈশাখ ও কার্ত্তিক ১৩২৪; শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র-সম্পাদিত 'কবি-প্রণাম' (ইং ১৯৪১)।

কিছু দিন 'বঙ্গনিবাসী' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ চাকরি—যশোহর চৌগাছার ঘোষবাবুদের বাটীতে ম্যানেজারি।

মৃত্যু

যশোহরে কর্ম্মকালে ঠাকুরদাস পীড়াক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়া কাঁটাপুকুরে সপরিবারে অবস্থান করিতেছিলেন। এইখানেই ১৩১০ সালের ১১ই কার্ত্তিক (২৮ অক্টোবর ১৯০৩) তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

গ্রন্থাবলী

ঠাকুরদাসের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বেশী নহে। আমরা যে কয়খানির সন্ধান করিতে পারিয়াছি, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিলাম। বন্ধনী-মধ্যে ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত :

১। **দুর্গোৎসব** ;—উদ্ভটকাব্য। ১২৯০ সাল (৩০-৯-১৮৮৩)। পৃ. ৪৬।

ইহা "ষড়ানন্দ শর্ম্মা প্রণীত সহজ ভাষায়, সরল কথায়, সতেজ গাথায়, বঙ্গের দুর্গোৎসব-বর্ণন।" পরবর্ত্তী কালে ঠাকুরদাসের 'শারদীয় সাহিত্যে' প্রধানতঃ দশম স্তবকরূপে ইহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২। **সাহিত্যমঙ্গল** (সন্দর্ভ)। ১২৯৫ সাল (৫-১২-১৮৮৮)। পৃ. ৮৮।

এই মৌলিক প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য বিষয়—কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা এবং সাহিত্য ও ধর্ম্মমত-বিবৃতি।

৩। **সাত-নরী** (খণ্ডকাব্য)। ? (ইং ১৮৮৮*)। পৃ. ৩৬।

ইহা "প্রবীণ কারিকর কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত ও অঘোরনাথ কুমার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।"

৪। **শারদীয় সাহিত্য**। ১৩০৩ সাল (২-৯-১৮৯৬)। পৃ. ২০২।

ইহা "শারদ মহোৎসবের সর্ব্বাঙ্গীণ চিত্র;—সাময়িক ও সামাজিক 'ফটো'। পদ্য ও গদ্য কবিতাময় ও কোমল গল্পময় ১৪টি স্তবকে

৫। **সহর-চিত্র** (কৌতুক চিত্রাবলী—১)। ১৩০৮ সাল (১৫-৭-১৯০১)। পৃ. ৭০।

সূচী: শীতসুন্দরী, বিডন্‌বালা, ফাল্গুনের হাওয়া, বঙ্গান্ধ বিলাপ, শৈবাল বিধবা, সহর-বধূ ও গ্রাম্য-বধূ।

ইহার প্রথম ও তৃতীয়টি ১৩০৩ সালের পৌষ ও চৈত্র সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

* 'সাত-নরী'র অন্তর্ভুক্ত 'কুলীনপত্নী' কবিতাটি ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'নবজীবনে' প্রথমে স্থান পাইয়াছিল, সুতরাং ইহার পরে—কিন্তু ১২৯৫ সালের পৌষ মাসে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে পুস্তিকাখানি প্রকাশিত তাহার প্রমাণ, ১২৯৫ সালের পৌষ-সংখ্যা 'মালঞ্চে' ইহার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছে। ১২৯৬ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা 'কর্ণধারে' পুস্তিকাখানি সমালোচিত হইয়াছে।

৬। **সোহাগ-চিত্র** (কৌতুক চিত্রাবলী—২)। ১৩০৮ সাল (১৫-৭-১৯০১)। পৃ. ৪৬।

সূচী: সুইট হার্ট, শেফালি-বালা, রাসে—রসবতী, সামার-সুট, বড়দিনে—বিরহিণী, সহর গুল্‌জার, সোহাগ-সাহিত্য।

সাময়িকপত্র-সম্পাদন

দ্বারভাঙ্গায় অবস্থানকালে পত্রিকা-সম্পাদন-কার্য্যে ঠাকুরদাসের হাতে খড়ি হয়। তাঁহার অবসরকালটুকু মাতৃভাষার অনুশীলনেই ব্যয়িত হইত। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকাগুলির পরিচয় দিতেছি।

'পাক্ষিক সমালোচক': ইহা একখানি "সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থব্যবহার, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন।" প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল —ফাল্গুন, প্রথম পক্ষ, ১২৯০ (ইং ১৮৮৪)। ইহা সুদূর দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রকাশিত হয়। প্রথম কয়েক সংখ্যা কলিকাতায় মুদ্রিত হইবার পর 'পাক্ষিক সমালোচক' দ্বারভাঙ্গা ট্রেডিং কোম্পানির ইউনিয়ন যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুল সমেত) ছিল ৪৲ টাকা।

১৩২৩ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' মুদ্রিত ঠাকুরদাসের "পাক্ষিক সমালোচক" প্রবন্ধে পত্রিকাখানির বিস্তৃত পরিচয় আছে;* উহা হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল:—

* ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণে' মুদ্রিত ঠাকুরদাসের "স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধেও 'পাক্ষিক সমালোচকে'র একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

"১৮৮৩-৮৪ খ্রীঃ অব্দে আমরা ভিন্ন ভিন্ন আপিসের কয়েকটি কেরাণী মিলিয়া এক কেরাণীদুর্লভ কঠিন কাজে হাত দিয়াছিলাম। সে বড়ই দুঃসাহসের কাজ,—কাগজ। আমরা বঙ্গদেশের বহির্ভাগে বিদেশে বসিয়া এক বাঙ্গালা কাগজ বাহির করিয়াছিলাম।...কাজে কেরাণী ও শক্তিতে শফরী হইলেও, সাহিত্যে 'ছোট নজর' ছিল না। অসমসাহসিক কার্য্য,—আমরা বাহির করিয়াছিলাম এক বৃহৎ কাগজ, সাহিত্যাদি সমালোচনা বিষয়ক এক পাক্ষিক পত্রিকা। সেরূপ আকৃতির এবং প্রকৃতির পাক্ষিক পত্র এ দেশে তাহার পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই; তাহার পরেও অদ্যাবধি হয় নাই। সামান্য ও নগণ্য কেরাণী-কুলে জন্মিয়াও আমাদের ঐ পাক্ষিক সাহিত্য পত্র, কি জানি সৌভাগ্যের কি সিদ্ধিযোগে বা অনুকূল নক্ষত্রে, নেহাত কেরাণী-কলমের পরিচয় দেয় নাই। উহা সুবিজ্ঞ সমীচীন লোকের শ্রদ্ধা ও সাহিত্যসিংহদিগের সম্যক্ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তখনকার সংবাদ-পত্র ও সাময়িকপত্র-নিচয়ে উহা উচ্চ শ্রেণীর সন্দর্ভ বলিয়া স্বীকৃত ও সমালোচিত হইয়াছিল।...আমাদের ঐ পাক্ষিক পত্র বেশ চলিয়াছিল; বহুকাল বেশ চলিতও বোধ হয়। কিন্তু, অনুষ্ঠাতৃদিগের মধ্যে বাঙ্গালীসুলভ একটি আত্মবিরোধ উপস্থিত হইয়া উহার ভাবী অস্তিত্বের উপর আঘাত করে। আট মাস কাল সতেজে ও সম্মানের সহিত চলিয়া, সাহিত্যের সু-আহার্য্য অভাবে উহা এক বৎসর পরে এ দেশীয় অনেকানেক পত্রিকারই মত পিতৃলোকে বিলীন হয়। পিতৃ-লোক-প্রস্থানের পথে উঠিবার পূর্ব্বেই আমি উহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলাম। অতিকষ্টেই সে কার্য্যটা করিতে হইয়াছিল। প্রথম আট মাসের অধিক কাল উহার সঙ্গে আমার লেখনীর ও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের সংস্রব ছিল না।

বঙ্গীয় ১২৯০ সালের ফাল্গুন মাসে ঐ পাক্ষিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং প্রতি পক্ষে সুন্দর রঙ্গিন-মলাটযুক্ত সুবৃহৎ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে।...পাক্ষিক প্রকাশিত হইবার পরবর্ত্তী শ্রাবণ মাসে 'নবজীবন' ও 'প্রচার' প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যে পরিচিত না হইয়াও সৌভাগ্যক্রমে আমরা তাহার সমালোচনার্থ কিয়ৎপরিমাণে প্রস্তুত ছিলাম। সমালোচনা করিয়াছিলাম প্রচুর ; এবং সে সমালোচনা নেহাত ছেলে-খেলাও হয় নাই। আমাদের তখনকার সম্পাদকীয় ইচ্ছার মূলে একটি অপ্রকাশিত উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। সে উদ্দেশ্য বাঙ্গালা ভাষায় একটি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সমালোচন-সাহিত্যের সৃষ্টি করা। ইংরেজীতে যাহাকে Critical Literature বলে, তাহারই জন্য আমরা তখন মাতিয়া উঠিয়াছিলাম, এবং 'সমালোচকে'র অনুষ্ঠানে অন্যান্য বন্ধুদিগকে জুটাইয়া আমি তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম।...

পত্রের প্রত্যেক সংখ্যার উদ্বোধন হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত (প্রুফ দেখা ব্যতীত) প্রায়ই সবই আমায় করিতে হইত। পত্র-পরিচালনার পথ খোদিত করার ভার পাইয়াছিলাম ; কার্য্যতঃ তাহার সম্পাদনও করিতাম। কিন্তু সম্পাদকীয় ভার শাফ্ ও সটান ভাবে আমার উপর অর্পিত হয় নাই। অবতরণিকায় লিখিত হইয়াছিল,—সহযোগিবৃন্দের সাধ মিটাইবার জন্য আমি নিজেই লিখিয়াছিলাম ;—

> '* * এই পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের হস্তে অর্পিত নহে। সম্পূর্ণ সাধারণ-তন্ত্র প্রণালীতে একটি সমিতি কর্ত্তৃক 'সমালোচক' সম্পাদিত হইবে।'

বলা বাহুল্য, সমিতি দ্বারা পত্র-সম্পাদন সম্ভবপর হয় নাই। তবে তাহার জন্য আমাকে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ কষ্টভোগ ও কর্ম্মভোগ করিতে হইয়াছিল।...

'পাক্ষিকে'ই বোধ হয়, আমার প্রবন্ধ লেখার প্রথম 'হাতে-খড়ি'। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও বড় কিছু লিখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে ইংরেজী কাগজে কিছু কিছু মক্স করিতাম বটে। বাঙ্গালা প্রবন্ধ উহার পূর্ব্বে আর কখনও লিখি নাই।...গদ্য লেখা সহজ ভাবিয়া বাল্যকাল হইতে বুড়া বয়স পর্য্যন্ত আমি তাহার গাত্র স্পর্শ করি নাই।...পূর্ব্বাবধি আমি পদ্য ঠাকুরাণীর কিঞ্চিৎ প্রণয়ে পড়িয়াছিলাম। কেরাণীগিরির কার্য্য হইতে কিছুমাত্র বিশ্রাম পাইলেই কাগজ পেন্সিলে কবিতা দেবীর মূর্ত্তি আঁকিতে বসিতাম।...

একটু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, 'পাক্ষিক'কে আমরা কি প্রকৃতির পত্র করিয়াছিলাম। সে এক পাঁচ মিশালি রকমের প্রকৃতি। প্রথমতঃ, প্রবন্ধ। সচরাচর সাময়িক পত্রে যে ছাঁচের প্রবন্ধ বাহির হইয়া থাকে, সেই রকমেরই। সকল বিষয়েরই সন্দর্ভ ও সমালোচনা। পরন্তু সংবাদপত্রের একটা অঙ্গ উহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। সেটা রাজনীতিক আলোচনা। মাসের প্রথম পক্ষে 'মাস-সমালোচনা' বলিয়া একটা লম্বা চওড়া প্রবন্ধ থাকিত। তাহাতে সাময়িক রাজনীতিক ব্যাপারের বিবিধ কথা থাকিত। পুনশ্চ, দ্বিতীয় পক্ষে 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' শিরস্ক কতকগুলি 'প্যারা'য় রাজনীতির কথা লিখিত হইত। ইংরেজী পত্রের অনুকরণে (প্রধানতঃ তাৎকালিক 'ম্যাকমিলান্‌স্ ম্যাগাজিন ও ইণ্ডিয়ান রিবিউ') আমরা 'মাস-সমালোচনা' প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। তবে তাহাতে একটু অভিনবত্ব বা আনাড়িত্ব ছিল এই যে, 'মাস-সমালোচনা'র প্রত্যেক প্রবন্ধের মাথায় নিম্নলিখিত একটা করিয়া নোট থাকিত ;—

'মাস-সমালোচকে'র মতামতের জন্য এই পত্রের সম্পাদক-সমিতি দায়ী নহেন। 'মাস-সমালোচনা' ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক

লিখিত হইবে ; অতএব একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

'পাক্ষিক সমালোচকে'র স্বত্বাধিকারীদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, রাজনীতিক বিষয়ে তখন তাঁহার সবিশেষ ঝোঁক ছিল, এবং তিনি নিজে ঐ সকল কথাই লিখিতে অভিলাষী হইলেন। এই কারণেই ঐ পত্রে রাজনীতির অতটা লম্বা স্থান মিলিয়াছিল। নহিলে আমার তখন ততটা রাজনীতিক মেজাজ হয় নাই ; সেটা বরং এই বৃদ্ধ বয়সে কিছু কিছু হইয়াছে।"

'পাক্ষিক সমালোচক' দ্বিতীয় বর্ষে বিলুপ্ত হয়। প্রথম বর্ষে ঠাকুরদাস "ষড়ানন্দ"—এই ছদ্ম নামে "ষড়ানন্দের রোজনামচা," "ঠঃ" স্বাক্ষরে "সমালোচনা ও সমালোচক" এবং "ঠঃ দঃ" স্বাক্ষরে "দেবী চৌধুরাণী (সমালোচন)" লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রামদাস সেনের গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ "বূাহ," নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের কবিতা ; কালীবর বেদান্তবাগীশ, চন্দ্রশেখর বসু ও বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রভৃতির সন্দর্ভও 'পাক্ষিক সমালোচকে'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

'মালঞ্চ' : 'পাক্ষিক সমালোচকে'র প্রকাশ রহিত হইবার তিন বৎসর পরে ঠাকুরদাস ঝনূজারপুরে (ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে) অবস্থানকালে 'মালঞ্চ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ; উহা কলিকাতার নবজীবন যন্ত্র হইতে অঘোরনাথ কুমার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত ; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল দুই টাকা।

'মালঞ্চে'র ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—পৌষ ১২৯৫ ; এই সংখ্যায় "অঙ্কুর" শিরোনামে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক যাহা লেখেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বঙ্গ-সাহিত্যে শস্যক্ষেত্র বিস্তর আছে। সেগুলি সারবান্ শস্যেরই ক্ষেত্র;—সুকুমার শস্যেরও ক্ষেত্র। বিবিধ শস্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই। তবে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে, আমাদের অদৃষ্ট-বশে বা মাটির দোষে,—যে কারণেই হউক,—কোন্ কারণে ঠিক জানি না,—কতক দিন হইতে সাহিত্যের সুন্দর ক্ষেত্রে শস্যের শ্যামল শোভা আর তেমন দেখিতেছি না; কিন্তু অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি চিরস্থায়ী নয়। স্বভাবের নিয়মে শুষ্কতার পর সুবৃষ্টি হয়। সেই নিয়মে অদৃষ্টও ফিরে। সাময়িক অবসাদে অধিক উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। আশা অবশ্যই আছে।

সারবান্ শস্যে সৃষ্টি রক্ষা করে; সুকুমার শস্যও সংসারে প্রয়োজনীয়। কাযেই শস্য-ক্ষেত্রে পৃথিবীর আধখানারও অধিক জোড়া; কিন্তু শস্যের ন্যায়, শাকটি-সবৃজিটি-ফুলটি-পাতাটিরও জীবন ধারণে প্রয়োজন। তা সংসারেই বলুন, আর সাহিত্যেই বলুন। শুভ-যোগে "শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা" হইলেও শাক্-সবৃজি নহিলে অন্ন উঠে না; ফুল-মুকুল-লতা-পাতা নহিলে পূজা ও প্রেম দুয়ের কিছুই হয় না। শস্যের সঙ্গে শাক্-সবৃজি চাই, ফুলটি মুকুলটি লতাটি পাতাটিও চাই। সৃষ্টিরক্ষায় শস্য যদি হন রাজা, শাক্-সবৃজি প্রভৃতি তাঁর প্রিয় ও প্রভুবৎসল প্রজা। প্রজা নহিলে রাজার রাজত্ব সম্ভবে না। এ বিষয়ে আর অধিক ইঙ্গিত অনাবশ্যক।

আমাদের সাহিত্যে ফলের ক্ষেত ত আছেই। ফলের ক্ষেতের 'আশে-পাশে' এক আধটা ফুলের গাছও আছে, তাহা দেখিতেছি; কিন্তু ফুলের জন্য একটা স্বতন্ত্র উদ্যান আমরা আজিও স্থাপন করি নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে শস্যের চাষই এত দিন চলিয়াছে, শাক্-সবৃজির উপর আমরা বড় একটা দৃষ্টি করি নাই। ফলের গাছে 'সার' দিতে আমরা যত চেষ্টা এত দিন করিয়াছি, ফুলের চারায় তত জল দিই

নাই। আমাদের ফলের গাছ ফলবান্ হউক, শস্যক্ষেত্র সুবিস্তৃত ও সুকর্ষিত হউক; কিন্তু তাহার সঙ্গে ইহাও চাই,—জানিয়াছি অনেকেই চাহেন যে,—শাক্-সব্জির 'সুপাট' হয়, ফুলটি পাতাটি যত্ন পাইয়া যথাকালে ফুটে। আমরা তাই আজ বড় আদরে, যত্নে ও সন্তর্পণে—কিন্তু বিলক্ষণ ভয়ে ভয়ে,—বঙ্গসাহিত্যের পৈতৃক স্বোপার্জ্জিত ভদ্রাসন হইতে অর্দ্ধ কাঠা মাত্র 'পত্তা' ভূমি চিহ্নিত করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র ফুল-বাড়ী—মহাশয়দিগেরই এই 'মালঞ্চ' —প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।

অধিক নয়, আধ কাঠা মাত্র আমরা আবাদ করিব। তারি মধ্যে যথাসম্ভব, যেখানে যেটি সাজে—ফুলের চারা বসাইব, লতার গাছ পুতিব, শাক্-সব্জি ছড়াইব। ফুল মুকুল, পাতা লতা, শাক্-সব্জি,—সকল রকমের সকল রঙেরই দুই চারিটা করিয়া চারা রোপিব। তবে কোন্ ফুলটি ফুটিবে—কোন্‌টি ফুটিবে না, কোন্ গাছটি গজাইবে, কোন্ বীজটি অঙ্কুরিবে, কোন্ চারাটি বাঁচিবে—কোন্‌টি বাঁচিবে না, সেটি আমরা কেমনে এখন বলিতে পারি? ক্ষেতের বীজ, বৃক্ষের কলম,—না জন্মিলে বিশ্বাস কি? তবে বীজ যাতে 'উঠে,' ফুল যাতে ফুটে—তার 'পা'ট' আমরা প্রাণ দিয়াও করিব, এখন কেবল এই বলিতে পারি। ইহার অপেক্ষা আর অধিক (সত্য বলিলে) কেই বা বলিতে পারেন।...

একটা কথা অগ্রেই বলিয়াছি, এখনও আবার বলিতেছি,—শস্য ও ফলের কারবার আমাদের নয়। উক্ত দ্রব্যের জন্য বড় ও বনিয়াদি মহাজনদের মাল-গুদামে মহাশয়কে যাইতে হইবে। 'মালঞ্চ' হইতে কেবল ফুলটি পাতাটি আমরা যোগাইব। 'ফলের প্রত্যাশী' মহাশয়েরা যদি একান্তই হন,—আমরা ক্ষুদ্র ব্যাপারী, অধিক আর কিছু দিতে পারিব না,—সময়ে অসময়ে এক আধ ছড়া রাজনৈতিক রম্ভা দিব।

উক্ত অনুপম ফলের বৃক্ষ বাছিয়া বাছিয়া একটি ঝাড় মালঞ্চের এক কোণে আমরা রোপিয়াছি।

তবে বুঝা গেল—'মালঞ্চে'র উদ্দেশ্য কি কি। বঙ্গবাসীর দেবমন্দিরে ও বিশ্রামকক্ষে পুষ্পসম্ভার প্রেরণ করা—মালঞ্চের এক উদ্দেশ্য; আর এক উদ্দেশ্য,—সাহিত্যক্ষেত্রের সামান্য; কিন্তু অত্যাবশ্যক উদ্ভিদ নিয়মিত যোগাইয়া, তাঁহাদের ভোজনগৃহ ও 'ডিনার টেবল্' প্রফুল্ল করা। যে দিন জানিব, 'মালঞ্চে'র দ্রব্যজাত হিন্দু-গৃহের 'রান্নাঘরে' আদর পাইয়াছে, সেই দিন বুঝিব—'মালঞ্চ' টিঁকিল। তখন আর 'মালঞ্চ' বাজে লোকের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইবে না।

এ 'মালঞ্চে'র মালী যাঁরা সখ করিয়া—আদর ও অনুগ্রহ করিয়া হইয়াছেন এবং হইবেন আশা দিয়াছেন, তাঁরা সকলেই সাহিত্যে স্ব স্ব ক্ষেত্রের সু-কৃষক,...তাঁদের হাতে তাঁদের কারকিতে 'মালঞ্চ' মুকুলিত—পুষ্পিত—হইবার ত কথা। তবুও যদি না হয়, সে দোষ মালঞ্চেরও নয়, মালীরও নয়; সে দোষ—মহাশয়দের মাটির।"

'মালঞ্চ' সাহিত্য-পত্র হইলেও ইহাতে রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত; প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন: "রাজনীতির আলোচনা যদিও আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য নহে, তথাচ রাজনীতির সহিত আমাদিগের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। কারণ, সন্নীতিতে শান্তি ও স্বচ্ছলতা। স্বচ্ছলতা ও শান্তিতেই সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি।"

প্রথম বর্ষের পত্রিকায় ঠাকুরদাসের অনেকগুলি গদ্য-পদ্য রচনা—"কংগ্রেস," "প্রয়াগ—চস্‌মাহীন চক্ষে," "বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গসমাজ," "ফুল্লরা," "প্রবাসীর পূর্ব্বস্মৃতি" (কবিতা), "কার্ত্তিকে কুমারীব্রত" প্রভৃতি স্থান পাইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের

"বিবাহ-রহস্য," 'স্বর্ণলতা'-রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "অদৃষ্ট" উপন্যাস ২১ অধ্যায় পর্য্যন্ত*, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর খণ্ড-কাব্য "সাধের আসন" ; নবীনচন্দ্র সেন, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায় ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কবিতা প্রভৃতিও 'মালঞ্চে'র শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা পত্রিকায় নবীনচন্দ্রের "নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন" নাটকের কিয়দংশ ও বিহারিলালের "সাধের আসনে"র ৪র্থ সর্গ প্রকাশিত হয়।

'মালঞ্চ' প্রায় দুই বৎসর চলিয়া বিলুপ্ত হয়। ইহাকে অনায়াসেই একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক-পত্রিকার সম্মান দেওয়া যাইতে পারে।

'বঙ্গবাসী' : দ্বারভাঙ্গার চাকরি হইতে বিদায় লইয়া ঠাকুরদাস ১২৯৯ সালে 'বঙ্গবাসী'র অন্যতম সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই 'বঙ্গবাসী'তে ও তথা হইতে প্রচারিত 'জন্মভূমি' মাসিকপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 'বঙ্গবাসী'র সহিত তিনি আড়াই বৎসর কাল যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার লিখিত বহুবিধ প্রবন্ধ 'বঙ্গবাসী' ও 'জন্মভূমি'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

'বঙ্গনিবাসী' : ১২৯৭ সালে 'বঙ্গনিবাসী' নামে সাপ্তাহিক পত্র বামদেব দত্তের পরিচালনায় প্রকাশিত হয়। ঠাকুরদাস কিছু দিন ইহা সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় (দ্র° 'বঙ্গ-ভাষার লেখক,' পৃ. ৬৯৮)।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : ঠাকুরদাসের বহু সুলিখিত রচনা পুরাতন সাময়িক-পত্রের—'প্রচার,' 'নবজীবন,' 'প্রবাহ,' 'পাক্ষিক

* এই প্রসঙ্গে ঠাকুরদাসকে ইংরেজীতে লিখিত তারকনাথের একখানি পত্র ১৩২৪ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে।

সমালোচক,' 'মালঞ্চ,' 'নব্যভারত,' 'সাহিত্য,' 'জন্মভূমি,' 'অনুসন্ধান,' 'ভারতী,' 'প্রদীপ' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় সাদরে স্থান লাভ করিয়াছিল। ইহার অধিকাংশই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই; আমরা এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার একটি তালিকা দিতেছি :—

'নব্যভারত' :	১২৯৪,	বৈশাখ ...	স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরী
	১২৯৭,	পৌষ ...	মন্ত্রি-অভিষেক (আলোচনা)
	১৩০১,	জ্যৈষ্ঠ ...	নিমাই চরিত (সমালোচনা)
		শ্রাবণ ...	এক অপরিজ্ঞাত কবি [বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী]
		ভাদ্র, কার্ত্তিক-পৌষ ...	বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ-বিল
	১৩০৩,	ভাদ্র, কার্ত্তিক ...	সাহিত্য ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সমালোচনা)
		অগ্র., পৌষ ...	শিশির বাবুর গীতি-গ্রন্থ
	১৩০৪,	জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ...	শেলি
	১৩০৫,	জ্যৈষ্ঠ ...	রাজধানী
		পৌষ ...	রাজনীতি ও স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র
	১৩০৭,	অগ্র., পৌষ ...	সাহিত্যের সাধারণ-তন্ত্র
	১৩০৮,	আষাঢ় ...	ভারতেশ্বরীর স্মারক (লর্ড কর্জ্জন ও তদীয় ব্যক্তিত্ব)
		ভাদ্র ...	ভিক্টোরিয়ণ হল
		আশ্বিন ...	(১) মহাত্মা মিষ্টার কটন, (২) প্রেম ও পেট্রিয়টিজম্
'প্রচার' :	১২৯৫,	ভাদ্র-আশ্বিন ...	বসন্ত ও বর্ষা
		ফাল্গুন-চৈত্র ...	পুত্র
		পৌষ-মাঘ ...	বউ কথা কও

'নবজীবন' ঃ	১২৯৫,	পৌষ	...	সমালোচনী পত্রিকা
'জন্মভূমি' ঃ	১২৯৭,	মাঘ	...	বিলাতে নারী-সভা
	১২৯৮,	বৈশাখ	...	অমূল্য-নিধি
		মাঘ	...	পণ্ডিত অযোধ্যানাথ
	১২৯৯,	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	...	লর্ড মেয়ো
		ভাদ্র	...	ভাষা-রহস্য
		অগ্রহায়ণ	...	(১) রমণী রেজিমেণ্ট, (২) সমালোচনা (পুরাতন ও নূতন প্রণালী)
		পৌষ, মাঘ	...	সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব
		চৈত্র	...	বন্দর-বংশ (সচিত্র)
	১৩০০,	বৈশাখ	...	বিবিধ বানর (সচিত্র)
		জ্যৈষ্ঠ	...	ব্যাঘ্র (সচিত্র)
		আষাঢ়	...	হরিণ (সচিত্র)
		শ্রাবণ	...	লেডীর লড়াই
		ভাদ্র	...	জ্ঞানের প্রমাণ
		আশ্বিন, কার্ত্তিক	...	'কুরুক্ষেত্র কাব্য' (সমালোচনা)
		পৌষ	...	ম্যালেরিয়া-মঠ
		ফাল্গুন	...	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
		চৈত্র	...	স্বপ্ন-কন্থা
'সাহিত্য' ঃ	১২৯৮,	শ্রাবণ	...	কবিবর রবার্ট ব্রাউনিঙ,
	১৩০১,	ভাদ্র	...	রাজা দিগম্বর মিত্র, সি. এস্. আই.

'সাহিত্য' :	১৩০৫,	জ্যৈষ্ঠ	...	'ময়শো রূপেরা' (স্মৃতি ও সমালোচনা)
		শ্রাবণ, কার্ত্তিক	...	সাহিত্য-পঞ্জী
	১৩০৬,	ফাল্গুন	...	প্রেমবিলাস গ্রন্থ
	১৩১৮,	ভাদ্র	...	কুৎসা-কুমারী
	১৩১৯,	পৌষ	...	বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধীয় স্মৃতি
	১৩২১,	আষাঢ়	...	রচনা-রীতি
		শ্রাবণ	...	গীতি-কবিতা
		অগ্রহায়ণ	...	কুসুম ও কবিতা
		ফাল্গুন	...	নাটক
	১৩২৩,	আষাঢ়	...	কঠোর কাব্য
		শ্রাবণ	...	'পাক্ষিক সমালোচক'
		আশ্বিন	...	'পঙ্ক'
		অগ্রহায়ণ	...	সমালোচনা-সোপান (ক্রমশঃ)
	১৩২৪,	কার্ত্তিক	...	আমার দুই দুগ্ধবতী গাভী
		অগ্রহায়ণ	...	নিধুবাবু
	১৩২৫,	আষাঢ়	...	হাসপাতি ও নবন্যাস
'ভারতী' :	১৩০২,	মাঘ	...	প্রজাসূয়া সভা
		ফাল্গুন	...	সমাজ-সংস্কার
'প্রদীপ' :	১৩০৭,	পৌষ	...	শব্দ
	১৩০৮,	পৌষ	...	কংগ্রেস*

* এই প্রবন্ধে এবং ১৩১৮ সালের পৌষ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' লেখকের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইয়াছে।

'প্রদীপ' :	১৩০৮, মাঘ-ফাল্গুন, চৈত্র		...	হাস্য রসের রচনা
	১৩০৯,	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	...	ঐ
'সমালোচনী' :	১৩০৮,	মাঘ-ফাল্গুন	...	গীতিকবিতা ও তাহার গতিক্রম
'নারায়ণ' :	১৩২২,	বৈশাখ	...	স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র
'ভারতবর্ষ' :	১৩২৪,	অগ্রহায়ণ	...	গ্রন্থ-সমালোচনা
'সারথি' :	১৩২৭,	শ্রাবণ, ভাদ্র	...	বঙ্গভাষা
		অগ্রহায়ণ	...	সাহিত্য সমালোচনা
		চৈত্র	...	সমালোচনা প্রসঙ্গ
'সচিত্র শিশির' :	১৩৩১,	২১ চৈত্র	...	সমালোচনা-সোপান
	১৩৩২,	১২ অগ্র.	...	কথা কাণে হাঁটে
	১৩৩৩,	১৮ অগ্র.	...	সাহিত্য-সমালোচনার বৈজ্ঞানিক ভূমি
		১৭, ২৪ পৌষ	...	ব্যাকরণ
		১, ৮, ১৫, ২২ মাঘ	...	অলঙ্কার
		১৫ মাঘ	...	সাহিত্য-চিন্তা
		২৮ ফাল্গুন	...	নবেল

ঠাকুরদাস ও বাংলা-সাহিত্য

ঠাকুরদাসের সাহিত্য-প্রতিভা প্রসঙ্গে 'জন্মভূমি' যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য। 'জন্মভূমি' লেখেন :

"বাঙ্গলা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের স্থান অনেক উচ্চে। এক পক্ষে তিনি একজন প্রগাঢ় চিন্তাশীল, ভাবুক,

উৎকৃষ্ট সমালোচক ও প্রবন্ধলেখক, এবং অন্য পক্ষে,—রঙ্গ-রস-রসিকতায়, শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে এবং রসাল ভাষার গাঁথুনিতে ও চুটকি বোল্‌চালে তিনি সিদ্ধহস্ত। বিশেষ, তাঁহার ভাষা সম্পূর্ণ নূতন তন্ত্রের;—'আলালী' ও 'সাগরী' ভাষার ন্যায় এই ভাষাকে 'ঠাকুরদাসী' ভাষাও বলা চলে। বস্তুতঃ, এই ভাষা ঠাকুরদাস বাবুর সম্পূর্ণ নিজস্ব। ইহাতে এক দিকে যেমন সেকালের কেতাবতী ভাব ও প্রাচীন ছাঁদ বিদ্যমান, অন্য দিকে আবার তেমনি নব্যভাব ও ইংরেজীর ছাপ বিশিষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। অথচ তাহা কষ্টকল্পিত বা অস্পষ্ট-দোষদুষ্ট নহে;—বেশ পরিস্ফুট, প্রাণস্পর্শী এবং প্রাঞ্জলও বটে। ইহাতে আর একটি বিশেষত্ব আছে এই যে, লেখক ইচ্ছামত অবিচ্ছিন্নরূপে অনুপ্রাস চালাইয়া, নিজেও রিক্তহস্ত বা ক্লান্ত হন না, আর সে অনুপ্রাসিক পদাবলী পড়িতে পড়িতে পাঠকও বিরক্ত বা ক্লিষ্ট হন না,—উপরন্তু পরম তৃপ্তি ও মহাস্ফূর্ত্তি লাভ করিতে থাকেন। এ ক্ষমতাটি ঠাকুরদাস বাবুর বিলক্ষণরূপ আছে। এক শ্রেণীর পাঠক এ জন্য ঠাকুরদাস বাবুর বিশেষ ভক্ত।

"আপনার গঠিত এই "অপূর্ব্ব" ভাষায় ঠাকুরদাস বাবু অবিশ্রান্তরূপে লেখনী চালনা করিতে পারেন। গদ্যে পদ্যে—দুয়েই তাঁর অধিকার আছে। তবে পদ্য অপেক্ষা গদ্যে অধিকার অধিক। এই খাঁটি নিজস্ব ভাষায় সর্ব্ববিধ গম্ভীর ও তরল প্রবন্ধ রচনা করিয়া, তিনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছেন। প্রবীণ সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে ঠাকুরদাস বাবুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সেই অতি গভীর ও গম্ভীর 'সাহিত্যমঙ্গল' গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভার এক মূর্ত্তি এবং "আটচালা," "ম্যালেরিয়া মঠ" ও

"ধামা-ধারা" প্রভৃতি বহু প্রবন্ধে তাঁহার সরস মধুর প্রতিভার অন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ।" ("বাঙ্গলা ভাষার লেখক" : 'জন্মভূমি,' চৈত্র ১৩০৩)।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যঙ্গে ও সুরসিকতায় ঠাকুরদাস অতিশয় দক্ষ ছিলেন। নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার একটি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত নিবন্ধ (Essay) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি। ভাষার অসমতা অর্থাৎ একই কালে চলিত ও সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহারের দোষে সে যুগের সকল লেখকের—মায় বঙ্কিমের রচনা পর্য্যন্ত দুষ্ট থাকিত, এই নিবন্ধে সেই দোষ পরিমাণে একটু বেশী হইলেও ইহাতে ঠাকুরদাসের শিল্প-প্রতিভার প্রচুর প্রমাণ মিলিবে।

কুৎসা-কুমারী: আমার নাম কুৎসা-কুমারী। আমি মা বাপের বড় আদরের মেয়ে। মা বাপ সোহাগ ক'রে আমার এই নরম নরম নামটি রেখেছিলেন।

আমি লোক-জগতের মানস-কুক্ষির সুকুমার কলুষ-কৌতুক-সঞ্জাতা সুকুমারী কন্যা। সেই কুক্ষি-তলে আমি জন্মেছিলুম অনাদি কালে। তা'র পর নিমেষে নিমেষে নূতন জন্ম গ্রহণ করিতেছি। আমি ক্ষণ-জন্মা, যশস্বিনী। আমার জন্মের অন্ত নাই; জীবনের অন্ত নাই।

আমি চির-জীবিণী। আমার মরণ নাই। আমার হ্রাস নাই; বৃদ্ধি আছে। আমি অনবরতই বেড়ে চলেছি। আমি অফুরন্ত উন্নতিশীলা; অক্ষুণ্ণযৌবনা। অবনতি ও অবসাদ আমার একেবারেই নাই।

আমি বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টিকালের অঙ্কুর থেকে কেন,—আগে হ'তেই আছি। স্বয়ং সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাই, তাঁর সৃষ্টিকালে, আমার

কমনীয় কবিতা-কলার বিষয়ীভূত হয়েছিলেন। সে কথামৃত আমারই কল্পনা, আমারই রচনা, এবং আমারই রটনা বটে।

শুদ্ধই কি সৃষ্টিকারী? পালনকারী ও প্রলয়-প্রমথনকারীও কি কুৎসা-কুমারীর কম-কণ্ঠ-কূজিত কাব্য-নিখির নায়ক নন! তাহাও কি আর তোমরা জান না!

ব্রহ্মার মত বিষ্ণু ও ব্যোমকেশও আমার রস-নিঃস্যন্দিনী রসনার অতীব রুচিকর পদার্থ। বিশ্বের বীজাঙ্কুরকাল থেকেই ত আমি এই ত্রি-শক্তির স্বভাব চরিত্রের, 'পাবলিক' ও 'প্রাইবেট' 'কেরিয়ারে'র এবং পারিবারিক আচার ব্যবহারের সবিশেষ গবেষণা ও সমালোচনা ক'রে এসেছি। সেগুলি আমার সর্ব্বাগ্য 'এপিক';—আমার মধুর মানস-সরসী-সঞ্জাত মহাকাব্য-রূপ কনক-কমল-কিশলয়-গুচ্ছ।

স্বর্গবর্গ, মর্ত্ত্যবর্গ,—সর্ব্ব-বর্গেই আমি সমান বিদ্যমান। সুরলোক, নরলোক, জনলোক, তপোলোক, কোনও লোকই কুৎসাধিকারের অতীত নয়। আমি শ্রীমতী কুৎসাকুমারী সকল লোকেই আছি। সকল লোকই আমায় লইয়া আছে। আমি স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমান সোহাগিনী। আমার মৃদু মধুর নিস্বন শুনিবামাত্র মর অমর আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয় তাহা পুনঃ পুনঃ পুনঃ শুনিবার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় সদা সজাগ করিয়া রাখে।

আমার কোমল কাকলী এমনই শ্রুতিমধুর, সুস্বাদু, আর আরামদায়ক যে, তাহার চিক্কণ চুম্বুকাকর্ষণে চিত্তমাত্রই আকৃষ্ট রয়েছে।

যথা মানব মানবীর, তেমনই দেব দেবীর ও দৈত্য দানবীর কার্য্যকলাপ ও 'ক্যারেক্টার' আমি 'স্ক্রুটিনাইজ' ও 'ক্রিটিসাইজ'

করি ; উদ্ঘাটন ও আলোচনা করি ; চর্ব্বণ ও রোমন্থন করিয়া থাকি। আমার এই পুণ্যময় প্রক্রিয়ার কাব্যময় কথামৃত লোকত্রয়কে—সে কালে, এ কালে,—সঞ্জীবতা ও স্ফূর্ত্তি দিয়া আসিতেছে।

নিরীহে, নীরবে, নির্ম্মলে, নশ্বরে, আর সবুজে, সুন্দরে আমার আদর বেশী। আমি সদাই সেই শাকসব্জীগুলির উপর চরিয়া থাকি। তাই ব'লে আমি অত্যুচ্চকে, অতি কঠিনকেও ছাড়ি না। আমি সর্ব্বোচ্চকেও সমভূম করি। পাষাণ কেটেও খান খান ক'রে থাকি। আমার কটাক্ষে যক্ষ রক্ষও কক্ষচ্যুত হয়।

আমি স্বভাবতঃ মৃদুভাষিণী, মিষ্টহাসিনী, কৃশাঙ্গিনী কামিনী। কেবল আমার এই ক্ষুদ্র রসনাখানি সর্ব্ববিধ-শক্তিশালিনী, সর্ব্বপ্রকারের সাংঘাতিক-ঘাত-ঘাতিনী! কেন, তাহা জানি না। পোড়া লোকে কিন্তু সদাই বলে তাই!

আমি কুৎসা কোথাও কখনও যেতে চাই না। তবু দেখ, আমি কোথায় নই, কিসে নই। পোড়া লোকেই ত আমায় নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

আকাশে, পাতালে, স্থলে, জলে, বাতাসে, নিঃশ্বাসে, সংসারে, অরণ্যে, নির্জ্জনে, জনস্থানে, 'প্রাইবেটে,' 'পবলিক প্লেসে,' পুস্তকে, আমি কুৎসা-সুন্দরী, সর্ব্বত্র সমান ও সজাগ ভাবে বিরাজ করিতেছি। আমি প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে, অন্তরীক্ষে, 'আড়ি পেতে' আছি। লোকে আমায় আড়ি পাতিয়ে রেখেছে।

তোমার কায়ার ছায়াবৎ আমি অনবরত তোমার অনুসরণ করিতেছি। তোমার অতীতের, বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের কৃত ও অকৃত কার্য্যের সম্পাদিত ও সংকল্পিত সমস্ত বিষয়ের অণুপরমাণুটির

পর্য্যন্ত অনুসন্ধান লইয়া ও অনুমান করিয়া, আমি তাহার প্রত্যেকটি চিরিয়া চিরিয়া দেখিতেছি,—চিবাইয়া চিবাইয়া চাকিতেছি।

তোমার নিজের ও নিজস্বের প্রত্যেক পদক্ষেপ, প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস, আমি সমাহিতচিত্তে অতি সতর্কভাবে, অনিমেষ নয়নে নীরবে নিরীক্ষণ করিতেছি;—কুটিল কয়ালের তরাজু-কাঁটায় সেগুলির সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পরিমাপ করিয়া, বৈজ্ঞানিকের অণুবীক্ষণে ও দূরবীক্ষণে, সেগুলি পুনঃপুনঃ পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচন করিয়া, আমি সুচতুর রাজনীতিকবৎ, রেখায় রেখায়, পরদায় পরদায়, পরীক্ষ করিয়া দেখিতেছি যে, তোমার সুখ-শান্তির, তোমার গৌরব-সম্ভ্রমের, তোমার কীর্ত্তি-সৌরভের, তোমার পারিবারিক চরিত্রের, তোমার সামাজিক সুনামের,—আ! তোমার জীবন-কুটীরের কোন্ কোমল, নির্ম্মল ও নিভৃত অংশে—কোন্ কোন্ মর্ম্মস্থানে আক্রমণ ও মর্ম্মান্তিক দংশন করিব। তাহার কোন্ কোন্ ছিদ্র দিয়া ও কোথায় কোথায় ছিদ্র করিয়া ও সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করিব।

তোমার নিদ্রাকালেও আমি তোমায় ছাড়ি না। আমি সারানিশি জাগিয়া, সারানিশি তোমার শিওরে বসিয়া, সাবধানে স্বকার্য্য সিদ্ধ করি। আমি তোমার শয়নকক্ষ বেড়িয়া বেড়িয়া, প্রতি প্রহরে খাড়া পাহারা দিই। তোমার প্রত্যেক পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন দর্শন করি। আমায় দেখিতে পাও না। আমি বাতাসে মিশিয়া যাই। অদৃশ্য থাকিয়া তোমায় দেখি। বাতাসের ভিতর থাকিয়া তোমার বিশ্লেষণ করি, তোমার বুক চিরি। বাতাসে করিয়া তোমার বুকের রক্ত উড়াইয়া লইয়া যাই।

একা কি তোমার! তোমার পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বুকের রক্ত। তোমার গোষ্ঠী গোত্রের নাড়ীনক্ষত্র আমার 'নোট-বুকে' নামে নামে 'নোট' ও 'কোট' করা রয়েছে।

আমি সকলকে দিবারাত্রি 'ডিসেক্ট' করি। তাদের জীবন্ত দেহযষ্টি, মন-প্রাণ-মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, শবদেহের মত, শিরায় শিরায় ছেদন বিশ্লেষণ করি। করি আমার এই ধারাল দাঁত আর সুতীক্ষ্ণ শুঁচোল নখ দিয়ে। আমি তাদের রক্ত-কুম্ভ মোক্ষণ করি, আমার এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী রসনা দিয়ে। তা'রা যাতনায় ধড়ফড় করে। আমার ভীষণ 'ভিবিসেক্সনে' ম্লান, মলিন, মৃতবৎ হয়। জীবন্মৃত্যুর মর্ম্মান্তিক বেদনায় পূর্ণ-মৃত্যু কামনা করে। আমি অম্লানমুখে মৃদু মৃদু হাসি।

আমি কাহাকেও পূরাপূরি মারি না। মানুষ মানুষীকে জীবন্মৃত করিয়াই আমি আরাম পাই। তা'তেই আমার মন আহ্লাদে ফুটী-ফাটা হয়। আমি অধিক চাই না। অল্পেই সন্তুষ্ট।

এ অল্পও বুঝি অমনই হয়! মানুষ মানুষী বুঝি জিহ্বাহেলনেই জীবন্মৃত হয়! কুলকামিনী বুঝি কথাটি উঠিতে উঠিতেই কঙ্কালসার হয়! সাধু বুঝি শব্দমাত্রেই অসাধু হয়!

আ! তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি? এত অত্যল্প ফলও অমনিই ফলে না। তাহা ফলাইতে আমাকে কল কৌশল করিতে হয়, অনেক ফাঁদই পাতিতে হয়।

লোকের গৃহ-ছিদ্র আমি একে একে অনুসন্ধান করি। ছেদন বিশ্লেষণ করিও বিস্তর। নাসা-রন্ধ্রে একটু কোন-কিছুর গন্ধ গেলেই, তখনই আমি রেলগাড়ীর মত ছুটি। কত স্থানে গন্ধ না পেয়েও ধেয়ে যাই। পিছু লেগে থাকি,—যদি গন্ধ পাই।

আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতীব তীক্ষ্ণ। কুক্কুর অপেক্ষাও কোটী গুণ বেশী।—আমি যে কুৎসা আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঘা না দেখেও ঘায়ের গন্ধ পায়। এক রতি গন্ধকে আমি গন্ধমাদন ক'রে তুলি।

তা, সব ফুলে কি গন্ধ থাকে! সকলেরই অঙ্গে কি ক্ষত পাই? শত সন্ধানেও ছিদ্র বাহির হয় না। আমার সমস্ত শ্রম মারা পড়ে। ছেদন বিশ্লেষণ ব্যর্থ হয়। ক্ষুদ্র ছিদ্রের সমালোচনায় সোয়াস্তি পাই না। তাহাতে আমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। তৃষ্ণা মিটে না।

আমি—কুৎসা তখন কল্পনা করিতে বসি। কল্পনা-শক্তির প্রভাবে কলঙ্কের সৃষ্টি করি।

কোন্ আদি কবির,—কোন্ মহাকবির কল্পনা আমার দৌড়দার দ্রুতবেগ-শালিনী কল্পনার কাছে দাঁড়াতে পারে? আমার কল্পনা অনবরত আকাশ-ধাবিনী; দ্রুতগামিনী দামিনীরও অগ্রে ও উর্দ্ধে দৌড়ায়। আমিই সর্ব্বাগ্রা ও কবি-ঘট স্থিতা কাব্য-শক্তি। আমিই সর্ব্বপ্রথম কবি, এবং সর্ব্বশেষ কবি। আমারই কক্ষ ও বক্ষঃ থেকে পৃথিবীর সমস্ত কবি ও কাব্যের উৎপত্তি হয়েছে। আমার কল্পনার কণিকামাত্র প্রসাদ লাভ ক'রে কবির কবিত্ব। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসাদি আমারই কৃপায় অমর;—আমারই কল্পনার ও বর্ণনার অংশবিশেষের অণুমাত্র লাভ ক'রে পরমাণুমাত্রের অধিকারী হয়ে, তা'রা অক্ষয় কবি-কীর্ত্তি রেখে গেছে।

আমি বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ করি, কবির কল্পনা করি। তা'র পর করি বর্ণনা। বর্ণনা করি অত্যুজ্জ্বল বিবিধ বর্ণে, বিশিষ্ট চিত্রকরের অতুল তুলি দিয়ে। প্রথমে ছায়াপাত করি, পরে

রেখাপাত, তা'র পর করি বর্ণ-পাত। যেখানে যে বর্ণটি খাটে, সেখানে সেটি, অতিসন্তর্পণে অঙ্কিত করি। [illegible] সহিত, প্রত্যেক রঙের পরে পরে, পার্শ্বে পার্শ্বে, তাহার প্রত্যুপযোগী রঙের 'রিলিফ' দিই। তা'র পর তুলির শেষ সুনিপুণ স্পর্শে চিত্র সমাপ্ত করি; এবং তাহার উপর এক পোঁচ পাকা 'পারমানেণ্ট' বার্ণিশ ক্রশ ক'রে দিই।

তখন 'প্লটে' ও 'পারস্পেক্‌টিবে' পূর্ণ পরিণয় হইয়া, আলেখ্য অত্যুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। কাব্য-চিত্র সম্পূর্ণ সজীব ও সর্ব্বাঙ্গীন সত্যবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে।

অতঃপর আমি পূর্ণমাত্রায় প্রচার আরম্ভ করি। প্রথম অঙ্কে,—"চুপ, চুপ—চুপ; চু···উ···প!" তা'র পরে, "ফুস্ ফুস্—ফিস্ ফিস্!" "ছি ছি ছি! কেহ যেন শোনে না!"

আমার শত কোটী মুখের সকলেই সর্ব্বত্র সকলকে বলে,—"ছি ছি ছি! চুপ চুপ চুপ! কেহ যেন শোনে না!" আমার সহস্র কোটী চোখের সকলেই চক্ষু টেপে,—"চুপ চুপ চুপ!"

বস্! নিশ্চিন্ত।

আমি, আমার কাব্য-কথা ঘর হইতে ঘাটে লইয়া যাই। ঘাট হইতে হাটে লইয়া যাই। ক্রমে, গ্রাম গ্রামান্তরে, সহরে নগরে, বাজারে বাজারে, রেলওয়ে কক্ষে, ষ্টীমারের বক্ষে, ট্রাম-কারে, অফিস-ঘরে, মঠে মন্দিরে, আসরে, থিয়েটারে, উপাসনার আসনে, আদালতের প্রাঙ্গণে—সাধারণ, অসাধারণ সকল প্রকারের সর্ব্ববিধ স্থানে, স্থলে জলে, আকাশে পাতালে, সর্ব্বত্র তাহার প্রচার ও প্রসার করি।

আমার কমনীয় বাক্য চোখে, মুখে, নাকে, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রচারিত হয়; সশব্দে ও নিঃশব্দে প্রচারিত হয়; ইশারা ইঙ্গিতে, টেপা হাসিতে, চাপা কাশিতে চমৎকার প্রচারিত হয়; পত্রে পুস্তকে, গদ্যে পদ্যে প্রচারিত হয়; বাদ্যে ভাণ্ডে, নাট্যে রঙ্গে, নানা রূপে, নানা দিকে সুপ্রচারিত হয়। আমার কাব্য,—কুৎসা-কুমারীর কবিতা কখনও অপ্রচারিত, অপ্রকাশিত থাকে না।

আমি এক দিকে বিরাট্ 'অথর'; অপর দিকে বিপুল 'পবলিশর'। আমার 'পপুলারিটী' যাবৎ-চন্দ্র-দিবাকর। শ্রীমতী কুৎসা-কুমারী দ্বারা প্রণীত কাব্যের মত লোক-প্রিয় পদার্থ পৃথিবীতে আর আছে কি?

আমি প্রথমে ঘটাই। ঘটাইতে ঘটাইতে রটাই। আমি ঘটাই 'অপবাদ'। রটাই কলঙ্ক,—কুৎসা।

আমি অঙ্কিত করি অপবাদের অত্যুজ্জ্বল আলেখ্য, এবং পরিবাদের পরম রমণীয় পট—'পিকচার'—'পোর্ট্রেট'। আমি রচনা করি কলঙ্কের চিত্র বিচিত্র কাব্য। আমার অমোঘ শক্তি, অসীম সাহস। আমি সাংঘাতিক। আমার শত জিহ্বা, সহস্র চক্ষু, কোটী কর্ণ।

ঘটাইতে আমি অঘটন-পটীয়সী। রটাইতে আমি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট পাদ্‌রী। আমি অঘটন ঘটাই; অনৃত রটাই। দুধকে জল করি, জীয়ন্ত মাছে পোকা পড়াই।

আমার অদ্ভুত ইন্দ্রজালে, শুভ্র শ্বেত পদ্ম কদর্য্য কৃষ্ণবর্ণের কণ্টকে পরিণত হয়। আমার সাঙ্ঘাতিক সংস্পর্শে সুবর্ণ লৌহ-মূর্ত্তি ধারণ করে। আমার কূট কৌশল-জালে সাবিত্রীর মত সতী লক্ষ্মী লোক-লোচনে, কালামুখী কলঙ্কিনী হয়।

যাহা কখনও ঘটে নাই, আমি তাহা ঘটাই। আর তাহাই সত্যবৎ রটাই। লোকে সম্পূর্ণ সত্য ব'লে তাহা বিশ্বাস করে। ধ্রুব সত্য ব'লে তাহা গ্রহণ করে।—করি আমার কল্পনা আর বর্ণনার গুণে। কাব্য-জগতে আমার যেমন অতুল উদ্ভাবন, তেমনই অমূল্য সৃষ্টি ও সম্পাদন। আমার 'কন্‌সেপ্‌সন' এবং 'এক্‌সিকুাসন' উভয়ই তুল্য উচ্চ অঙ্গের।

কু লোকে আমায় কালামুখী কুৎসা বলে। কিন্তু কার্য্যতঃ আমি কবি,—কাব্য-কল্প-লতিকা নয় কি?

তা, কুৎসা,—নামটি মন্দই বা কিসে? কুরূপা আমি কিসে? কুরূপার কি এত আদর, এত আকর্ষণ হয়? আমার সুন্দর কচি মুখখানি দেখিতে, আমার সুধাস্রাবিণী কথার কাকলী শুনিতে,—কে না ছুটে আসে! আমার 'নিতুই নব' লাবণ্যে কোন্ মূঢ় না মোহিত হয়!

আমার মত সুন্দরী ত্রিসংসারে কে আছে? যদি কেহ থাকে, আর যদি সে রমণীর কখনও সাক্ষাৎ পাই, তবেই না তার রূপখানা কেমন দেখ্‌তে পারি; আর তা'র রসখানি কত, মাপতে পারি। নইলে, আর কি বোল্‌বো! কা'রও রূপ রস দেখতে এ বয়সে ত আমার বাকি নাই।

কেমন নামটি! বিচক্ষণ বাপ মা বেছে বেছে আমার এ নাম রেখেছিল। কুৎসা! কুৎসা-কুমারী! কুৎসা-সুন্দরী! কুৎসা-কুসুম! আহা! কেমন কচিকচি, নরম নরম, মিষ্ট, মোলায়েম, আর মধুময়, কাব্যময় আমার এ নামটি।

ইহার—আমার এই ললিত-কান্ত নামের সবটুকুই কাব্য। আমার সর্ব্বাঙ্গই কবিতা—মাখনে মাখা। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য,

গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য, অনবরতই আমার গা হ'তে গ'লে গ'লে পড়ে। তাদের কতক 'ট্রাজিডী' কতক 'কমিডী'। 'কমিডী' খুব কমই। কেমন নয় কি?

আমার আদি 'এপিক' সকল হইতে, 'ইপকে ইপকে' যুগে যুগে, আমি নানাজাতীয় কাব্যের বিকাশ করিয়া আসিতেছি। বৃহৎ ও বৃহত্তরের ন্যায় আমার ক্ষুদ্র ও খণ্ডকাব্যও কত রকমের, কত রঙ্গ-বিরঙ্গের। সনেট, স্যাটায়ার, ব্যালাড্, ব্যালেট, ইডিল, এলিজী, স্কোলিও, ষ্টরনেলো, লিরিক্, রেচপেটো, টপ্পা, ঝুকো, কনজোন,—ইত্যাদি কত কতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও খণ্ড-খণ্ড-ই না আমার কুৎসা-কাব্য।

কেমন? এখন বুঝেছ ত সব? চিনেছ ত আমায়?

দামোদর মুখোপাধ্যায়

উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিদ্যালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ
উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিদ্যালঙ্কার
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক, ১৩৫৮

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭

৭.২—৮।১১।১৯৫১

দামোদর মুখোপাধ্যায়

বিদ্যানন্দ

১৮৫৩-১৯০৭

দামোদর মুখোপাধ্যায়কে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে জানি। উইল্কি কলিন্সের 'ওম্যান্ ইন্ হোয়াইটে'র অনুবাদ 'শুক্লবসনা সুন্দরী'র লেখক, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার 'মৃণ্ময়ী'র লেখক, 'সোনার কমল' প্রভৃতি মনোহারী কয়েকখানি উপন্যাসের লেখক এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র বহু টীকার অনুবাদক ও সম্পাদক দামোদর মুখোপাধ্যায় যে এক এবং অভিন্ন ইহা বহু লোকেই অবগত নহেন। ইহার সহিত 'প্রবাহ' ও 'অনুসন্ধান' পত্রিকার সম্পাদক দামোদর মুখোপাধ্যায়কে যুক্ত করিয়া সমগ্রভাবে যিনি দেখিবেন, তিনিই ইঁহার জ্ঞানের পরিধি ও সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। কালের বিপুল প্রবাহ দামোদর মুখোপাধ্যায়কে আজ পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া একটু পিছনে ফিরিয়া দেখিলেই জনচিত্তহারী রসিকজনসুহৃদ্ দামোদরকে দেখা যাইবে। মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার 'হিন্দুশাস্ত্র' সপ্তম ভাগের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"দামোদর বাবু খ্যাতনামা লেখক, তাঁহার গ্রন্থাদি বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত, তাঁহার রুচি মার্জ্জিত, তাঁহার লেখনী মধুময়ী।...যাঁহারা 'কপালকুণ্ডলা' পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে 'মৃণ্ময়ী'ও পাঠ করিয়াছেন। এবং যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্র কৃত ভগবদ্গীতার অনুবাদ পাঠ করিতেন, তাঁহারা দামোদর বাবু কৃত ভগবদ্গীতার বিস্তীর্ণ ও বহুটীকাসমন্বিত অনুবাদ দেখিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। আমি যত দূর জানি, বঙ্গভাষায় ভগবদ্গীতার এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বহুটীকাসমন্বিত অনুবাদ আর একখানি নাই।"

সমগ্র দামোদর মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইতিমধ্যেই উপকরণের অভাব ঘটিয়া নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি (২ ফাল্গুন, ১২৫৯) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে দামোদরেব জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম —রামরতন মুখোপাধ্যায়; মাতা পদ্মমণি দেবী। দামোদরের পৈতৃক বাসভূমি শান্তিপুরে।

শৈশব-শিক্ষা

দামোদর মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন। তিনি শিক্ষালাভ করেন বহরমপুর কলেজে। তাঁহার মাতুল—প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার

লোহারাম শিরোরত্ন (মৃত্যু : ১৩ কার্ত্তিক ১২৯০) তখন বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ। দামোদর বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী তিন ভাষাতেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ

মাতৃভাষায় দামোদরের পরম অনুরাগ ছিল। যৌবনের প্রথম উন্মেষ হইতেই তিনি বঙ্গবাণীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যাই অধিক। ১২৯০ সালের আষাঢ় মাস (ইং ১৮৮৩) হইতে তিনি ইউরোপীয় নভেল-গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন ; বুলওয়ার লিটন-কৃত রায়েনজি, উইল্কি কলিন্স-কৃত ওম্যান ইন হোয়াইট ও সার্ ওয়াল্টার স্কট-কৃত ব্রাইড অব লামের মুরের অনুবাদ 'উপন্যাস রত্নাবলী' নাম দিয়া মাসে মাসে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন ; ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য ছিল ।৴০ আনা। ১২৯৯ সালের আশ্বিন মাস (ইং ১৮৯২) হইতে 'অনুসন্ধান'-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক 'মাসিক উপন্যাস' নাম দিয়া প্রতি মাসে নূতন নূতন উপন্যাস প্রকাশের যে ব্যবস্থা হয়, দামোদর তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ও লেখক ছিলেন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিলেন ; তাঁহার রচনাবলী একদা পাঠককে কম আনন্দ দেয় নাই।

গ্রন্থাবলী

দামোদরের গ্রন্থগুলির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। আমরা সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদান করিতেছি :—

১। **মৃণ্ময়ী** (উপন্যাস)। (১০ আগষ্ট ১৮৭৪)। পৃ. ৩৫৪।
"কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ।"

২। **বিমলা** (আখ্যায়িকা)। ইং ১৮৭৭ (২০ মার্চ)। পৃ. ১৯৫।

৩। **দুই ভগ্নী** (উপন্যাস)। ? (৫ জুলাই ১৮৮১)। পৃ. ১৩৩।

৪। **কমল-কুমারী** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। বৈশাখ ১২৯১ (২-৫-১৮৮৪)। পৃ. ২৭৯।
"স্যর্ ওয়াল্‌টার স্কটের ব্রাইড্ অব্ লামের্ মূর্ অবলম্বনে বিরচিত।"

৫। **প্রতাপসিংহ** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ইং ১৮৮৪ (১৫ মে)। পৃ. ২২৪।
প্রধানতঃ টডের রাজস্থান অবলম্বনে লিখিত।

৬। **মা ও মেয়ে** (উপন্যাস)। ১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৪)। পৃ. ১৬৪।

৭। **শুক্লবসনা সুন্দরী** (উপন্যাস : উইল্‌কি কলিন্সের 'উম্যান্ ইন্ হোয়াইট্' অবলম্বনে)
১ম ভাগ : চৈত্র ১২৯১ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ২৩২
২য় ভাগ : সম্বৎ ১৯৪৫ (আগষ্ট ১৮৮৮)। পৃ. ৩২২
৩য় ভাগ : ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯০)। পৃ. ৩২০

৮। **শিশুরঞ্জন ভারত-ইতিহাস** (সচিত্র)। ১২৯৩ সাল (১০-৪-১৮৮৭)। পৃ. ১১৮।
"অতি প্রাচীন কাল হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি পর্য্যন্ত।"

৯। **বিষ-বিবাহ** (উপন্যাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৮৮)। পৃ. ৭২।

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক (১৩০৪ সাল) 'প্রেম-পরিণয়' নামে গদ্য-কাব্য সহ একত্রে প্রকাশিত। 'প্রেম-পরিণয়' ১২৯৯ সালের পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

১০। **লক্ষ্মণ-বর্জ্জন** (পৌরাণিক আখ্যায়িকা)। সম্বৎ ১৯৪৭ (ইং ১৮৯০)। পৃ. ১৩৬।

১১। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**, ১ম খণ্ড। (১৭ জুলাই ১৮৯৩)। পৃ. ৮০।

"মূল, অন্বয়, তৎসহ 'গীতা-বোধ-বিবর্দ্ধিনী' সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, হনুমান্ ও বলদেবকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধর, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ ও বিশ্বনাথকৃত টীকা, যামুনমুনিকৃত 'গীতার্থসংগ্রহ' ও বঙ্গানুবাদ, 'গীতার্থ-সার-দীপিকা' নামে সুবিস্তৃত বাঙ্গালা তাৎপর্য্য, নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বহুবিধ টিপ্পনী সমেত।"

এই বিরাট্ গ্রন্থ কয়েক বৎসর ধরিয়া খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১২। **শান্তি** (উপন্যাস)।

উপন্যাসখানির প্রথমার্দ্ধ ১২৯৩-৯৫ সালের 'প্রচারে' মুদ্রিত হয়; গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ অবস্থায় খুব সম্ভব ১৮৯৩ সনে প্রচারিত হইয়াছিল; আমি ১ম সংস্করণের পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 'শান্তি' বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে দামোদরের বৈবাহিক (ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্রের শ্বশুর) ছিলেন। তিনি গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন :—"প্রিয়তমেষু—শান্তি প্রাপ্ত হইলাম। ইহলোকে পাইলাম—পরলোকেও ভরসা করি, দামোদর তাহাতে আমায় বঞ্চিত করিবেন না।"

১৩। **যোগেশ্বরী** (উপন্যাস)। ১৩০৪ সাল (১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮)। পৃ. ৬০৪।

১৪। **সুকন্যা** (নাটক)। ১৩০৬ সাল (২১ মার্চ ১৯০০)। পৃ. ৯৪।

১৫। **সোনার কমল** (উপন্যাস)। ১৩০৮ সাল (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০১)। পৃ. ৪৩৮।

১৬। **কর্ম্মক্ষেত্র** (উপন্যাস)। অগ্রহায়ণ ১৩০৮ (২-১-১৯০২)। পৃ. ৩৭৯।

"বহুদিন পূর্ব্বে ['মাসিক উপন্যাস,' কার্ত্তিক ১২৯৯] এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রচারিত হইয়াছিল।"

১৭। **অন্নপূর্ণা** (উপন্যাস)। ১৩০৯ সাল (২ সেপ্টেম্বর ১৯০২)। পৃ. ৫৯৯।

"যোগেশ্বরীর উপসংহার।"

১৮। **নবাব-নন্দিনী** (উপন্যাস)। ১৩০৮ সাল (৫ ডিসেম্বর ১৯০১)। পৃ. ২৯৩।

"দুর্গেশ-নন্দিনীর অনুসরণ।"

১৯। **সপত্নী** (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩১১ সাল (৪ মে ১৯০৪)। পৃ. ৪০২।

২০। **ঈশ উপনিষদ্**। ১৩১১ সাল (ইং ১৯০৪)।

২১। **ললিতমোহন** (উপন্যাস)। চৈত্র ১৩১১ (২৭-৫-১৯০৫)। পৃ. ৩১৯।

২২। **অমরাবতী** (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩১২ (৫-৫-১৯০৫)। পৃ. ২৭২।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

২৩। **নবীনা** (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩১৬ সাল (২৪ জানুয়ারি ১৯১০)। পৃ. ২০০।

২৪। **শম্ভুরাম** (উপন্যাস)। ১৩১৭ সাল (২৬ আগষ্ট ১৯১০)। পৃ. ২৯৬।

২৫। **আদর্শ প্রেম** (উপন্যাস) ইং ১৯১৩ (৩০ অক্টোবর)। পৃ. ১৫৭।

"প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে [আগষ্ট ১৯০৬] এই উপন্যাস একলিপি-বিস্তার পরিষদের আনুকূল্যে ও ব্যয়ে দেবনাগর অক্ষরে 'রাজভক্তি' নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবশ্যকবোধে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল।"—প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

* * *

ইহা ছাড়া রমেশচন্দ্র দত্ত-সম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৭ম-৮ম ভাগ (১৩০৪ সাল = ইং ১৮৯৭)—মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দামোদর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম দুই অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত, বাকী ৩-১৮ অধ্যায়ের দামোদর-কৃত।

পাঠমালা, জ্ঞানোদয়, বর্ণবোধ, পদ্যপাদপ প্রভৃতি অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তকও দামোদর রচনা করিয়াছিলেন।

সাময়িকপত্র-সম্পাদন

গ্রন্থরচনার ন্যায় সাময়িকপত্র-সম্পাদনেও দামোদর কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি :

'প্রবাহ' : ইহা সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র, ১২৮৯ সালের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৮২) প্রকাশিত হয়। প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক সূচনায় লিখিতেছেন :

"প্রথমতঃ, সময়ের সহিত সাময়িক পত্রের বিশেষ সম্বন্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সাময়িক পত্রসমূহ প্রায়ই নিতান্ত অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহাতে পাঠকের অতিশয় অপ্রীতি জন্মে, কার্য্যের নিতান্ত বিশৃঙ্খলা হয়, এবং উদ্দেশ্য সাধনের বিঘ্ন ঘটে। আমাদিগের প্রবাহ প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে। সুতরাং অন্য পত্র সমস্ত সত্ত্বেও প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রবাহ কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিবে না। প্রবাহ আত্মীয়ের সমাদর বা অনাত্মীয়ের হতাদর করিবে না। ··প্রবাহ সম্প্রদায় বিশেষের, মত বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের দাস হইবে না।···প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবে। তৃতীয়তঃ, যাহা সাধারণের বোধাতীত, বা যাহা নীরস, বা যাহাতে প্রয়োজন নাই, প্রবাহ কদাপি তাহাতে হস্তার্পণ করিবে না। যাহা সাধারণের কল্যাণকর, যাহার সহিত দেশের বা সমাজের উন্নতির সম্বন্ধ আছে, যাহার সহিত সকলের হিত, আনন্দ, অনুরাগ ও উন্নতির সম্বন্ধ আছে, তাহাই প্রবাহের আলোচ্য হইবে।··· চতুর্থতঃ, যে সকল

রাজকার্য্যের সহিত সর্ব্বসাধারণের ইষ্টানিষ্টের অধিক সম্বন্ধ দেখিবে প্রবাহ তাহার সমালোচনা করিবে।...পঞ্চমতঃ, প্রবাহ সমসাময়িক সমস্ত গণনীয় ঘটনার উল্লেখ বা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিবে। সাহিত্য সম্বন্ধীয়, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, ইতিহাস সম্বন্ধীয় উন্নতি, অবনতি, নবাবিষ্কার, বা মতান্যথা প্রবাহ সকলকে জানাইতে যত্ন করিবে। ষষ্ঠতঃ, প্রবাহ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ সমাদর করিবে।...সপ্তমতঃ, নাটক ও অভিনয় সময়ে সময়ে জাতীয় উন্নতি, বা অবনতির প্রধান হেতু হইয়া থাকে। এই জন্য প্রবাহ নাটক ও প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে তাহার অভিনয়ের গুণাগুণ সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিবে। অষ্টমতঃ, প্রবাহ বিশ্বাস করে যে বঙ্গভাষার এখন নিতান্ত ক্ষীণ অবয়ব। এ সময়ে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত যিনি যাহা করেন তাহাই শুভ। এই জন্য প্রবাহ সকল গ্রন্থকারকেই সমাদর করিবে, গ্রন্থের দোষের কথা যেমন বুঝিবে তেমনি সরলভাবে ব্যক্ত করিবে, এবং গুণের কথা সানন্দে প্রচারিত করিবে। কিন্তু কদাপি অকারণ বিদ্রূপ করিয়া কাহাকেও হতোৎসাহ করিবে না, বা মনস্তাপ দিবে না। প্রবাহের এই সকল সঙ্কল্প আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যে প্রবাহের উদ্দেশ্য অনেক ও বহুব্যাপী এবং তৎসমস্ত সাধনোদ্দেশে কোন সাময়িক পত্রের আবির্ভাব একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

'প্রবাহে'র স্থিতিকাল দুই বৎসর।

দীর্ঘকাল পরে দামোদর 'প্রবাহ' পুনঃপ্রচারিত করিয়াছিলেন। এই "বিবিধ প্রবন্ধ ও সমালোচনাপূর্ণ মাসিকপত্রে"র ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—মাঘ ১৩১১ (ইং ১৯০৫)। কথা-সাহিত্যিক নারায়ণচন্দ্র

ভট্টাচার্য্য ইহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। প্রথম বারের ন্যায় এবারও 'প্রবাহ' দুই বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। আমরা ইহার ২য় বর্ষের ৯ম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩১৩) পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।

'অনুসন্ধান' : অনুসন্ধান-সমিতির মুখপত্র, এই পাক্ষিক পত্রের ৭ম খণ্ড (১৩০০ সাল) দামোদরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'নিউজ্ অব দি ডে' : এই নামের একখানি ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র দামোদর কিছু দিন সম্পাদন করিয়াছিলেন (দ্র° 'বাঙ্গালীর গান,' পৃ. ১০১৪)।

মৃত্যু

১৯০৭ সনের ১৬ই আগষ্ট (৩১ শ্রাবণ ১৩১৪), ৫৫ বৎসর বয়সে, দামোদরের মৃত্যু হয়। তাঁহার পরলোকগমনে নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ তৎসম্পাদিত 'স্বদেশী' পত্রে লিখিয়াছিলেন :

> "বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ হইতে আবার একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। গত ৩১এ শ্রাবণ শুক্রবার প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য পূজনীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, বঙ্গসাহিত্যকে অনাথ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন।...
>
> দামোদরবাবু কেবল সাহিত্যসেবী ছিলেন না, সাহিত্যজীবীও ছিলেন। সাহিত্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। সমগ্র জীবন তিনি সাহিত্যচর্চ্চাতেই ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অনেক সাহিত্যিকের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সরলহৃদয় উচ্চমনা সাহিত্যিক বুঝি আর একটিও দেখি নাই। যিনি

তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বিনীত ও সরল ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাহিত্যচর্চ্চার শেষ ফল, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ।...

তাঁহার ন্যায় স্বদেশহিতৈষী একান্ত দুর্লভ।...যে দিন হইতে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে একমাত্র ঔষধ ব্যতীত তিনি সর্ব্ববিধ বৈদেশিক দ্রব্যের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি, বিলাতী চিনির সংস্রবের আশঙ্কায় গুড় ব্যতীত অন্য কোন মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেন না।...

দামোদর বাবুর হিন্দু ধর্ম্মে গাঢ় অনুরাগ ছিল। আজি তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন খাঁটি বাঙ্গালী লেখক হারাইলাম।"
(শ্রাবণ ১৩১৪)

উমেশচন্দ্র বটব্যাল

১৮৫২—১৮৯৮

উমেশচন্দ্র বটব্যাল বর্ত্তমান যুগে প্রায় অপরিচিত নাম। অথচ গত শতকের শেষে পণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক সমাজে তিনি শ্রদ্ধেয় ছিলেন, তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র হইতেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। সে যুগে বেদ-বেদান্ত উপনিষদের ভাষাব্যাখ্যা দিতে অনেকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে সরস সাহিত্য-সম্পদ করিয়া তুলিতে যে দুই-এক জন সাহিত্যিক সক্ষম হইয়াছিলেন, উমেশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সরকারী কার্য্যের চাপ ও অকাল-মৃত্যু মাতৃভাষায় ভূরি পরিমাণ সম্পদবৃদ্ধির সুযোগ তাঁহাকে দেয় নাই, তথাপি যতটুকু দিয়াছে ততটুকুর জন্যই রবীন্দ্রনাথের মত আমরা আজ কৃতজ্ঞ। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ চিরদিন সমান ছিল, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এই নামটি তাঁহার সেই অনুরাগের পরিচয় বহন করিতেছে। পুরাতনের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। চণ্ডীদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন করিয়া তিনি এত দূর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, গত শতাব্দীর শেষে বীরভূমের নান্নুর গ্রামে গিয়া নিজব্যয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্য সম্পন্ন করিয়া নান্নুরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার আরব্ধ কার্য্য তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

তিনি গুরুতর সরকারী কাজের অবসরে ভারতীয় প্রাচীন আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যতটুকু পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাহার দ্বারাই আমাদের সাহিত্য শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে, দুরূহ বিষয়ে আলোচনায় বাংলা ভাষার অধিকার বিস্তৃততর হইয়াছে। আমাদিগকে চিরন্তন আক্ষেপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। দীর্ঘকাল পরে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার জীবনী ও কীর্ত্তির যতটুকু সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহাই ভবিষ্যতের হাতে তুলিয়া দিলাম।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুলের সন্নিকট রামনগর গ্রামে উমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-তারিখ—১৬ ভাদ্র, ১২৫৯ (৩০ আগষ্ট ১৮৫২)। উমেশচন্দ্রের পিতার নাম—দুর্গাচরণ বটব্যাল।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সহিত সম্পর্ক-সূত্রে বহু কৃতী বঙ্গসন্তানের নাম সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। উমেশচন্দ্র যে গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন তাহার অন্তর্গত অন্যতর পল্লী রাধানগর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। উভয়ের পূর্ব্বপুরুষেরা স্থানীয় সমাজের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতা ছিলেন ; রামমোহনের সময়েও দুই দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। উমেশচন্দ্রের বৃদ্ধ-পিতামহ রামকানাই ছিলেন রামমোহনের সমসাময়িক। তিনি তান্ত্রিক মতের পক্ষপাতী ছিলেন, স্বকল্পিত "জগদীশ্বরী" নামে যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতেই ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিতেন। এই শক্তিপূজা পদ্ধতি পারিবারিক প্রথায় পরিণত হইয়াছিল।

পঠদ্দশা

পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া উমেশচন্দ্র খানাকুল-কৃষ্ণনগর ইংরেজী-সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। স্বনামধন্য প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী স্বগ্রাম রাধানগরে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র এই বিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়া ১৪৲ বৃত্তি লাভ করেন এবং উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতায় আসেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি তিনি কিরূপ সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হন তাহার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

ইং ১৮৭০ এফ. এ.—১ম বিভাগ...সংস্কৃত কলেজ

১৮৭৩ বি. এ.—১ম বিভাগ...প্রেসিডেন্সী কলেজ

১৮৭৪ এম. এ.—সর্ব্বোচ্চ স্থান...সংস্কৃত কলেজ

১৮৭৬ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ। মৌয়াট পদকপ্রাপ্তি।

সংস্কৃত শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তির জন্য উমেশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ হইতে "বিদ্যালঙ্কার" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

অন্নসংস্থানে

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণের পর উমেশচন্দ্র প্রথমে নড়াইল ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন; সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজেও কিছু দিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি রাজকার্য্যে যোগদান করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে প্রবিষ্ট হন। পরবর্ত্তী দশ বৎসর তমোলুক, মানভূম, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কাজ করিবার

পর প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ষ্ট্যাটুটরি সিবিল সার্ভিসের জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ, হাওড়া, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটি করিয়া শেষে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে এই পদে পাকা হন। উমেশচন্দ্র রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। নম্রতা, রসজ্ঞতা, বাহ্যাড়ম্বরহীনতা প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি জনপ্রিয় ছিলেন।

স্বদেশ ও সাহিত্য অনুরাগ

গুরুতর সরকারী কাজে ব্যাপৃত থাকিয়াও উমেশচন্দ্র তাঁহার স্বল্প অবসরকাল স্বদেশের সাহিত্যচর্চায় ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁহার প্রথম রচনা—"বৈদিক সোম" ১২৯৮ সালের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। তিনি 'সাহিত্যে'র পৃষ্ঠায়, পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বনে অনেকগুলি বৈদিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধে বৈদিক কালের আর্য্য সমাজের চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পরিস্ফুট। দর্শনের মধ্যে সাংখ্য-দর্শন তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধমালা ১৩০০ সনের 'সাধনা'য় স্থান পাইয়াছিল। মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার রচনাগুলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ লেখককে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য; তিনি লেখেন :—

পাতিসর, আত্রাই
N. B. S. Railway.

সপ্রীতি নমস্কার নিবেদন—

আপনার সাংখ্যদর্শন পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা পুনশ্চ আপনাকে কৃতজ্ঞচিত্তে জানাইলাম।

বঙ্গভাষায় আপনার এ রচনার আর তুলনা নাই। বড় ইচ্ছা ছিল মালদহে উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় লাভ করিব এবং সশরীরে আপনাকে সাধুবাদ দিয়া আসিব কিন্তু ব্যস্ততাবশতঃ সে কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইল—কোন এক সময়ে পরিচয়ের অবসর হইবে এরূপ আশ্বাস রহিল। সাক্ষাৎ পরিচয় থাক্ বা না থাক্ আমাকে আপনার একটি ভক্ত পাঠকের মধ্যে গণ্য করিয়া লইবেন এবং ভবিষ্যতে কালক্রমে যদি আপনার বন্ধুশ্রেণীর মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারি তবে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। 'সাহিত্যে' আপনার যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইতেছে তাহা আমি সবিশেষ আনন্দ ও আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া থাকি জানিবেন। অবশেষে সবিনয় নিবেদন এই যে আপনি যে পাঠকের বিরাগ ও শ্রান্তির আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা মন হইতে দূর করিবেন।··· ইতি ১৯ চৈত্র, ১৩০০।

ভবদীয় ভক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৯৩, ২৩এ জুলাই (৮ই শ্রাবণ ১৩০০) 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' যখন সভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইহার নাম ছিল—'দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার'। উমেশচন্দ্র ইহার ১৭শ অধিবেশনে (২৬-১১-১৮৯৩) অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। "একাডেমি অব লিটারেচারের কার্য্যকলাপে ইংরাজিবহুলতা দেখিয়া কতিপয় সভ্য আপত্তি করেন, এবং জাতীয়-সাহিত্যানুরাগী কোন কোন ব্যক্তি প্রতিবাদও করিতে থাকেন। একাডেমি অব লিটারেচার এই নাম সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি-সূচক কথা উপস্থিত হয়। এই হেতু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম-এ, সি-

এস মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে একাডেমি অব লিটারেচারের প্রতিশব্দ স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নাম পরিগৃহীত হয় (১৮-২-১৮৯৪)।" এই প্রসঙ্গে উমেশচন্দ্র সভাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাতে ইহার নামকরণ হয় নাই। পদার্থটি যদি স্থায়ী হয় তাহা হইলে সভ্যগণ অবশ্য অঙ্গীকার করিবেন যে বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় ইহার নামকরণ করা আবশ্যক।

অস্মদ্দেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ষষ্ঠ মাসে তাহার নামকরণ বিধেয়। আমাদের একাডেমি (কি লিখিব ?—এ্যাকাডেমি—না আকাডেমি না একাডেমি না আক্কাডেমি না আক্ক্যাডেমি—কি ?—) আমাদের এই সংজ্ঞাহীন জীবটি বিগত জুলাই মাসের ২৩এ তারিখে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ষষ্ঠ মাস বিগতপ্রায়; কিন্তু আজও ইহার নামকরণের কোনও উদ্যোগ লক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে যে মহোদয়গণ এই পদার্থটির জন্মদাতা তাঁহারা বঙ্গভূমিতে কি নামে ইহাকে পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন ?

অতি প্রাচীনকালে, যাহাকে বৈদিক যুগ বলা যায় তখন এক এক আচার্য্যের চতুষ্পার্শ্বে শিষ্যেরা বসিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিতেন; চতুষ্পার্শ্বে বসা হইত বলিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছিল "পরিষদ"। কালে এই শব্দের অর্থ "ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিতমণ্ডলী" এইরূপ দাঁড়ায়। অবশেষে গুণ দোষ বিচারক পণ্ডিত-সভা-মাত্রকেই—এমন কি সভা মাত্রকেই—পরিষদ বলা হইত।··· গ্রীশদেশে Academy বলিলে যে অর্থ প্রকাশ পাইত অস্মদ্দেশে পরিষদ বলিলেও একদা অনেকটা তাদৃশ অর্থ অভিব্যক্ত হইত।

প্রস্তাবিত পদার্থটিকে কি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" বলা যাইবে ?… সভ্যগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা সমবেত-বুদ্ধি-বলে শ্রুতিকোমল বিশুদ্ধ আর্য্য ভাষায় আপনাদের মিলিত অস্তিত্বের নামকরণ করিবেন ;—অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া বেড়াইতে লজ্জা বোধ হয়, কিম্বহুনা।

মালদহ শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল

উমেশচন্দ্রের বাসনা ছিল—একখানি বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়া যাইবেন ; এ জন্য তিনি বঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণকালে বহু উপকরণও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মালদহে অবস্থানকালে তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রজ ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণকে প্রদত্ত রাজা ধর্ম্মপালের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কার করেন। ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া টীকা টিপ্পনী সহ তিনি ইংরেজীতে এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে ও বাংলায় 'সাধনা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারে সে সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহলে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

উমেশচন্দ্র স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে জানিতেন, নির্ভীক হৃদয়ে মতামত প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া তিনি অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন :—

"প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের চরিত সমালোচনাকালে উমেশচন্দ্র যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার আমি অনুমোদন করিতে পারিব না। কিন্তু যে ভাবপ্রবণ সমাজদ্রোহ ও কর্ম্মদ্রোহ শাস্ত্রসম্মত নিষ্কাম কর্ম্মপরতা হইতে আমাদের সমাজকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, উমেশচন্দ্র তৎপ্রতিকূলে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছিলেন।" ('চরিত-কথা')

মৃত্যু

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উমেশচন্দ্র বগুড়া জেলায় মফস্বল পরিভ্রমণে বহির্গত হন। এইখানে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। চারি মাস রোগভোগের পর তিনি ১৬ই জুলাই (১ শ্রাবণ ১৩০৫), মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে, পরলোকগমন করেন।

রচনাবলী

উমেশচন্দ্র জীবিতকালে কোন গ্রন্থই প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কতকগুলি রচনা তাঁহার মৃত্যুর পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ; এগুলি—

১। **সাংখ্য-দর্শন**। অগ্রহায়ণ ১৩০৬ (২৮-১-১৯০০)। পৃ. ১৪৯।

"পূজ্যপাদ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল পিতাঠাকুর মহাশয়, সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ রচনা করিয়া, 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় [১৩০০ সালে] প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধমালা একত্র গ্রথিত করিয়া, স্থানে স্থানে টীকা সংযোজিত করেন, এবং ভূমিকাস্বরূপ 'মহর্ষি কপিলের সময়নির্ণয়' ও 'বেদের সহিত কপিলের দর্শনশাস্ত্রের সাময়িক সম্বন্ধনির্ণয়,' এই দুইটি বিষয়ের নূতন রচনা করেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াই তিনি স্বর্গারোহণ করেন।··· এই গ্রন্থে 'সাধনা'য় প্রকাশিত মূল প্রবন্ধগুলি এবং তাহার পরে রচিত টীকা ও ভূমিকা মুদ্রিত হইল।···শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বটব্যাল।"

২। **বেদ-প্রবেশিকা।** ১৩১১ সাল (৬ মার্চ ১৯০৫)। পৃ. ৩৩৬।

"…'সাহিত্যে' প্রকাশিত তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলী 'বেদ-প্রবেশিকা' নামে প্রকাশিত করিলাম। ইহাতে সন ১২৯৯ [১২৯৮ ?] সাল হইতে ১৩০৬ সাল পর্য্যন্ত 'সাহিত্যে' যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি এবং তদতিরিক্ত "বেদ" ও "গৃৎসমদের অদিতি ও আদিত্যগণ" নামক দুইটি অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইল। লেথক এই প্রবন্ধাবলীর কতিপয় একত্র গ্রথিত করিয়া 'বেদ-প্রবেশিকা' এই নামকরণ করেন, এবং মনুসংহিতা হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়া রাখেন। এই কারণে পুস্তকের নাম 'বেদ-প্রবেশিকা' হইল। আর মনু-বচনটিও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম।… প্রবন্ধাবলী 'সাহিত্যে' যেমন প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা অবিকল সেইরূপ মুদ্রিত করিলাম। কেবল প্রবন্ধের শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দুই একটির পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন করিয়াছি।"

৩। **প্রেম-শক্তি ও জননী।** চৈত্র ১৩২৮ (২৮-৩-১৯২২)। পৃ. ৮।

ইহাতে দুইটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ—"ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশ" ও "জননী" স্থান পাইয়াছে।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা: উমেশচন্দ্রের বহু রচনা এখনও পুরাতন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,—পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই। এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

'সাহিত্য'

১৩০০, মাঘ—"রিলিজিয়ন" শব্দের বাঙ্গলা কি ?

১৩০১, বৈশাখ—সেকশুভোদয়া

মৃত্যু

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উমেশচন্দ্র বগুড়া জেলায় মফস্বল পরিভ্রমণে বহির্গত হন। এইখানে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। চারি মাস রোগভোগের পর তিনি ১৬ই জুলাই (১ শ্রাবণ ১৩০৫), মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে, পরলোকগমন করেন।

রচনাবলী

উমেশচন্দ্র জীবিতকালে কোন গ্রন্থই প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কতকগুলি রচনা তাঁহার মৃত্যুর পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ; এগুলি—

১। **সাংখ্য-দর্শন**। অগ্রহায়ণ ১৩০৬ (২৮-১-১৯০০)। পৃ. ১৪৯।

"পূজ্যপাদ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল পিতাঠাকুর মহাশয়, সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ রচনা করিয়া, 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় [১৩০০ সালে] প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধমালা একত্র গ্রথিত করিয়া, স্থানে স্থানে টীকা সংযোজিত করেন, এবং ভূমিকাস্বরূপ 'মহর্ষি কপিলের সময়নির্ণয়' ও 'বেদের সহিত কপিলের দর্শনশাস্ত্রের সাময়িক সম্বন্ধনির্ণয়,' এই দুইটি বিষয়ের নূতন রচনা করেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াই তিনি স্বর্গারোহণ করেন।··· এই গ্রন্থে 'সাধনা'য় প্রকাশিত মূল প্রবন্ধগুলি এবং তাহার পরে রচিত টীকা ও ভূমিকা মুদ্রিত হইল।···শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বটব্যাল।"

২। **বেদ-প্রবেশিকা**। ১৩১১ সাল (৬ মার্চ ১৯০৫)। পৃ. ৩৩৬।

"...'সাহিত্যে' প্রকাশিত তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলী 'বেদ-প্রবেশিকা' নামে প্রকাশিত করিলাম। ইহাতে সন ১২৯৯ [১২৯৮ ?] সাল হইতে ১৩০৬ সাল পর্য্যন্ত 'সাহিত্যে' যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি এবং তদতিরিক্ত "বেদ" ও "গৃৎসমদের অদিতি ও আদিত্যগণ" নামক দুইটি অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইল। লেখক এই প্রবন্ধাবলীর কতিপয় একত্র গ্রথিত করিয়া 'বেদ-প্রবেশিকা' এই নামকরণ করেন, এবং মনুসংহিতা হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়া রাখেন। এই কারণে পুস্তকের নাম 'বেদ-প্রবেশিকা' হইল। আর মনু-বচনটিও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম।... প্রবন্ধাবলী 'সাহিত্যে' যেমন প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা অবিকল সেইরূপ মুদ্রিত করিলাম। কেবল প্রবন্ধের শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দুই একটির পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন করিয়াছি।"

৩। **প্রেম-শক্তি ও জননী**। চৈত্র ১৩২৮ (২৮-৩-১৯২২)। পৃ. ৮।

ইহাতে দুইটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ—"ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশ" ও "জননী" স্থান পাইয়াছে।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাঃ উমেশচন্দ্রের বহু রচনা এখনও পুরাতন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,—পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই। এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি ঃ—

'সাহিত্য'

১৩০০, মাঘ—"রিলিজিয়ন" শব্দের বাঙ্গলা কি ?

১৩০১, বৈশাখ—সেকশুভোদয়া

অগ্রহায়ণ—রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল
মাঘ—লক্ষ্মণাবতী
মাঘ—ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন।

১৩০২, অগ্রহায়ণ—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু
মাঘ—হোসেনসাহী মহাভারত।

১৩০৩, জ্যৈষ্ঠ—গৌরাঙ্গের বাল্যজীবন
শ্রাবণ—গৌরাঙ্গের পঠদ্দশা
অগ্র., পৌষ—গৌরাঙ্গ-চরিত।

১৩০৪, অগ্রহায়ণ—এব্রাহাম লিঙ্কলন।

১৩০৬, অগ্রহায়ণ—বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম।

১৩০৮, বৈশাখ—বাউল সম্প্রদায়ের আদি
আষাঢ়—বিজ্ঞান ও বেদ
চৈত্র—মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী।

১৩০৯, আষাঢ়—গৌরাঙ্গের মন্ত্রদীক্ষা
ভাদ্র—বরেন্দ্র দেশ
আশ্বিন—মহানন্দা নদী
কার্ত্তিক—বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব
পৌষ—বগুড়া জেলা।

১৩১০, ফাল্গুন—মহম্মদ।

'সাধনা'

১৩০১, বৈশাখ—নূতন তাম্রশাসন।

'নব্যভারত'

১৩০১, ভাদ্র—রূপ ও সনাতন গোস্বামী।
অগ্রহায়ণ—জীব গোস্বামী।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'

১৩০৪, ৩য় সংখ্যা—হরিনামের শব্দতত্ত্ব।

রচনার নিদর্শনঃ উমেশচন্দ্রের রচনার অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"জ্ঞান ও চৈতন্যের যে প্রভেদ, সুখ ও আনন্দের মধ্যেও সেই প্রভেদ। যে সুখের বিচ্ছেদ নাই, তাহার নাম আনন্দ। তাহা অবিচ্ছিন্ন, সন্তত ও চিরাভ্যস্ত বলিয়া বিশেষ প্রণিধান ব্যতিরেকে অনুভূত হয় না। পক্ষান্তরে—প্রকৃতিসংযোগজন্য রূপরসাদির অনুভবে সুখের উৎপত্তি। সুখের আবির্ভাব তিরোভাব আছে। আনন্দ চৈতন্যের সহচর; তাহা নিত্য, তাহার আবির্ভাব তিরোভাব নাই। আত্মা যেমন স্বীয় অস্তিত্ব ও অবস্থা সর্ব্বদা অনুভব করে, তেমনি সেই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি বা মধুরভাবের অনুভব করে। আত্মার স্বীয় অস্তিত্বানুভব সর্ব্বদাই মধুরভাবময়; সেই মধুরভাবের নামই আনন্দ। যখন মৃত্যু বা আত্মার সম্ভাবিত বিনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখন সেই মধুরভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও মনুষ্য মরিতে চাহে না—কেন না, তৎকালেও স্বীয় সত্তানুভবের সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রবাহ বিদ্যমান. এবং মরিলে পাছে সেই অস্তিত্ব একেবারে দীপশিখার ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, এবং তৎসহকৃত আনন্দের বিলোপ হয়—তজ্জন্যই মরণের ভয়। মরিলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে, এরূপ স্থির বিশ্বাস জন্মিলে মনুষ্যের মরণের ভয় ঘুচিয়া যায়।

তজ্জন্য আত্মা যেমন চৈতন্যময় বা চিন্ময়—তদ্রূপ কেহ কেহ আত্মাকে "আনন্দময়" বলেন। কিন্তু এই মত সাংখ্যদর্শনসম্মত

নহে। সাংখ্যেরা বলেন, আত্মা স্বভাবতঃ উদাসীন;—সুখ দুঃখ যে কেবল আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে, তাহাই নয়—প্রকৃতি-সংযোগেও আত্মা বাস্তবিক সুখদুঃখ অনুভব করে না—কেবল সুখ-দুঃখের ছায়ামাত্র আত্মায় নিপতিত হইয়া আত্মার সুখ ও দুঃখের ভ্রম জন্মায়। যেমন স্ফটিকের নিকট জবাকুসুম থাকিলে স্বচ্ছ স্ফটিকও লোহিত-বর্ণ দেখায়, তদ্রূপ প্রকৃতিগত সুখদুঃখের ছায়া আত্মাকে কিছুকালের জন্য রঞ্জিত করে মাত্র।" ('সাংখ্য-দর্শন,' পৃ. ১০৩-০৪)

"সূর্য্য আমাদের দিনকে দীপ্তি দেন। চন্দ্র আমাদের রাত্রিকে জ্যোৎস্না দেন,—এক প্রেমই আমাদের জীবনের চন্দ্র সূর্য্য। হে মনুষ্য! যদি প্রেম না থাকিত তবে সূর্য্যের আলোকেও এই পৃথিবী অন্ধকার হইত, চন্দ্রের আলোকেও অন্ধকার হইত। তুমি যদি কাহাকেও ভাল বাসিতে না পারিতে আর তোমাকেও যদি কেহ ভাল বাসিতে না পারিত তবে তোমার কি দশা হইত একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। সংসারের ধনই বল আর মানই বল—প্রেম বিনা বিফল। ঈশ্বরের এই প্রেমের রাজ্যে আমরা প্রেম শিখিতেই প্রেরিত হইয়াছি জানিবে। বাল্যে জননীর স্নেহে হৃদয়ে প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত হয়, ভাই ভগিনীর ভালবাসায় পল্লবিত হয়, ধর্ম্মপত্নীর ভালবাসায় কুসুমিত হয়, সন্তানের ভালবাসায় ফল সংযুক্ত হয়। প্রেমের সিঁড়ি দিয়াই আমরা স্বর্গে আরোহণ করিতেছি। পিতামাতা, ভাই ভগিনী, পুত্র কন্যার প্রেম জলের তরঙ্গের মত বিস্তার পাইয়া প্রতিবেশী, স্বদেশী, বিদেশী—এমন কি পশুপক্ষীর উপরেও ছড়াইয়া পড়ে।...

সকল প্রাণীকে যে দিন আমরা আপনার ন্যায় ভাল বাসিতে শিখিব, সে দিন আমাদের কি শুভ দিন, কি আনন্দের দিন! সে দিন আমাদের নূতন জন্ম, যে জন্মের নাম "দেবজন্ম।" সে দিন আমাদের জন্য স্বর্গবাসীগণ আনন্দ উৎসব করিবেন—অলক্ষ্যে আমাদের মস্তকের উপর পুষ্প বৃষ্টি করিবেন। মা কমলা সে দিন আমাদের উপর কৃপা দৃষ্টি করিবেন। তখন আর আমরা পৃথিবীতে কিছুই কুৎসিত দেখিতে পাইব না—তখন পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ অনির্ব্বচনীয় লাবণ্যে পরিপূর্ণ হইবে। যাহা মন্দ ছিল তাহা ভাল হইয়া যাইবে। পাপ তাপ পৃথিবী হইতে পলায়ন করিবে। হে ব্রহ্মচারী! আজ তুমি প্রেমরাজ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবজন্ম লাভ কর।" ('প্রেম-শক্তি ও জননী,' পৃ. ১-২, ৬)

———

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

১৮৬০—১৯০৮

জন্ম ঃ বিদ্যাশিক্ষা

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে* বর্দ্ধমানের নপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-পরিবারে শ্রীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—প্রসন্নকুমার মজুমদার। প্রসন্নকুমার ছিলেন পুঠিয়া স্টেটের দেওয়ান।

শ্রীশচন্দ্র সাত-আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেশেই ছিলেন। তাঁহার বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবন প্রধানতঃ পুঠিয়ায় মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর অপত্যনির্ব্বিশেষ স্নেহে ও তাঁহার অলৌকিক পবিত্র জীবনের ছায়ায় অতিবাহিত হইয়াছিল; তাঁহার নিজের ভাষায়: "পুঠিয়া রাজধানীর সঙ্গে আমার প্রাথমিক জীবন অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট।"

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বোয়ালিয়া (রাজশাহী) স্কুল হইতে শ্রীশচন্দ্র তৃতীয় বিভাগে এন্‌ট্রান্স পাস করেন।

সাহিত্যানুরাগ

কৈশোর হইতেই মাতৃভাষার প্রতি শ্রীশচন্দ্রের অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন :—

* Hist. of Services of Gazetted and other Officers under Government of Bengal—Corrected up to July 1908.

"প্রথম-প্রথম পুঠিয়ায় গিয়া দেখিতাম, জ্যোৎস্নারাত্রে ছাদে বসিয়া তিনি [মহারাণী] বাঙ্‌লা সাপ্তাহিক কি মাসিক পত্র অথবা কোন পুস্তক চন্দ্রালোকে পাঠ করিতেছেন,...এইরূপ পড়ার অভ্যাস ৪।৫ বৎসর আমি নিজে দেখিয়াছি।...সংস্কৃত এবং বাঙ্‌লা গ্রন্থের তাঁহার যে সংগ্রহ ছিল তাহা রাজধানীর কোন বৃহৎ পুস্তকালয়ের পক্ষেও গৌরবজনক। সংস্কৃত তিনি সামান্য বুঝিতেন, কিন্তু বাঙ্‌লায় উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ তাঁহার অপঠিত ছিল না। কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইলে সংগ্রহ করিয়া উত্তমরূপে বাঁধাইয়া লওয়া ও গ্লাসকেসে সাজাইয়া রাখা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান আনন্দ ছিল। কলিকাতায় যখন কলেজে পড়ি, তখন একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে পুঠিয়ায় আসিয়া বইগুলি আমি শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া দিয়াছিলাম এবং একটি তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, কৈশোরে মাতৃভাষার পুস্তকরাশির সংস্পর্শে এইরূপে আসিয়া আমি বাঙ্‌লা সাহিত্যের স্বাদ পাইয়াছিলাম। ভাল বই হাতে আসিলেই মাতা [মহারাণী] আমায় পড়িতে দিতেন এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। আমিও কবিতা লিখিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে পড়িতে দিতাম। তাঁহার অনুমোদন ও উৎসাহ চিরদিন আমায় সাহিত্যালোচনায় অগ্রসর করিয়াছে।

"মহারাণীমাতার সহিত আমার বাঙ্‌লা সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইত।..."—'রাজ-তপস্বিনী'

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণের পর শ্রীশচন্দ্র পাকাপাকিভাবে পুঠিয়াতেই অবস্থান করিতেন। তিনি "জীবনের সেই পূর্ব্বাহ্নে সচরাচর সাহিত্যালোচনা এবং স্বদেশের এক আধটু কাজ লইয়া" থাকিতেন।

শ্রীশচন্দ্রের প্রাথমিক রচনাগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটির সন্ধান আমরা পাইয়াছি ; উহা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মাসিক সমালোচকে'র ৭ম-৮ম যুগ্ম-সংখ্যায় (কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮৬) প্রকাশিত "বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ ও চারি জন সংস্কারক"। ইহাতে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। আলোচনায় চিন্তাশীলতা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র আপনা হইতে লেখককে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্রাটের আহ্বানে শ্রীশচন্দ্র সোৎসাহে ১৮৮০ সনে রথযাত্রার দিন চুঁচুড়ায় উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রীত হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শ্রীশচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন :—

"১৮৭৯।৮০ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালে চুঁচুড়ায় প্রথম বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মনে পড়িতেছে, সে দিন রথযাত্রা,... আমার জীবনে সে একটা নবযুগ। সাহিত্যচর্চ্চার সেই নবীন উৎসাহের সময় আপনা হইতে বঙ্কিমবাবু আমায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন।...কথায় কথায় বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'এখন আর ইংরেজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখি না—ইংরেজী ভাষাটা ভারি insincere বলিয়া আমার মনে হয়।' আমায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, 'মাসিক সমালোচকে' আপনার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া এর আগে আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমার কথা বেশী করিয়া বলায়, লিখিতে পারি নাই।' প্রবন্ধটিতে আমি বলিয়াছিলাম, 'ইদানীন্তন কালে বঙ্কিমবাবু দেশের সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক, তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্য্যে এবং তৎকৃত সমালোচনায়

বঙ্গসমাজের যে মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, আর কিছুতে ততটা নহে।'...

"ইহার পর মনে হইতেছে, কলিকাতায় প্রায় দুই বৎসর পরে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁর বাসা বহুবাজারে। আমি প্রিয় সুহৃৎ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাইতাম। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-প্রণেতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন গিয়াছিলাম।...কিছু দিন আমি রীতিমত ডায়েরী রাখিতাম। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে প্রায় দুই বৎসর সে ব্রত পালন করিয়াছিলাম। এই কালের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে অনেক বার আমার দেখাশুনা হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগ সঞ্চার হয়। বন্ধুত্ব বলিতে পারি না। গুরু-শিষ্যের যে সম্বন্ধ, এক দিকে গাঢ় স্নেহ এবং প্রীতি, অন্যত্র গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা—প্রেমের সেই সম্বন্ধকেই আমি যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।"—'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ,' ১ম প্রস্তাব।

এই সময়ে শ্রীশচন্দ্র "সাহিত্যকে জীবিকাস্বরূপ করিয়া" কলিকাতায় স্থায়ী হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন :

"১২৯০ সালের বৈশাখ মাসে রাজকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায় মহারাণী বিষয়ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই আমি পারিবারিক পীড়াদির জন্য কলিকাতায় ছিলাম এবং পরে বঙ্কিমবাবু প্রমুখ হিতৈষী বন্ধুবান্ধবগণের পরামর্শে সাহিত্যকে জীবিকাস্বরূপ করিয়া তথায় স্থায়ী হইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম।"—'রাজ-তপস্বিনী,' পৃ. ২২৯।

তখন ৯ম বর্ষের (১২৮৯) 'বঙ্গদর্শন' কোনরূপে প্রকাশিত হইয়া উহার প্রচার বন্ধ হইয়াছে। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মতি লাভ

করিয়া, চন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহেও বটে, শ্রীশচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের হস্ত হইতে 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন:

"আমার 'বঙ্গদর্শন'-গ্রহণ স্থির হইয়া গেলে বঙ্কিমবাবু একদিন বলিলেন, 'শ্রীশবাবু, তোমার সঙ্গে আমার একটি কথা আছে। তুমি যে আমায় লেখার জন্য ঘন ঘন পীড়াপীড়ি করিবে, তা হবে না।' আমি বলিলাম, 'বঙ্গদর্শন আপনার নামের সঙ্গে অভিন্ন, আপনি না লিখিলে কি বঙ্গদর্শন চলে? নবেল বরাবর ত চলিবেই, প্রবন্ধও মাঝে মাঝে দিতে হবে।' উত্তর—'নবেল লেখা থাকে, চলিবে। কিন্তু প্রবন্ধ দিব ন-মাসে ছ-মাসে। ইদানীং প্রবন্ধ বড় একটা লিখি নাই, কেবল মাঝে মাঝে ভাঁড়ামি করেছি। তোমরা যুবা পুরুষ, অনেক লিখিতে পারিবে, আর আমার কাছে 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য মাঝে মাঝে গালি খাবে। মেজ্‌দাদাও খান।... সে-বারে দুই মাস বঙ্গদর্শনের টোন্ বড় নীচু করা হয়েছিল। বিরক্ত হয়ে ৬।৭ মাস লিখি নাই।' আমি বলিলাম, 'আপনি কেন সম্পাদক হোন না?' উত্তর—'আর আমার সে উৎসাহ নাই।'...আর একদিন চন্দ্রনাথ বাবু 'বঙ্গদর্শনে'র কথা তুলিলেন। বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন, 'শ্রীশের ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, তুমি সম্পাদক হও।' বঙ্কিমবাবু অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, 'তা হ'লে 'বঙ্গদর্শন' ছাড়িব কেন? তা হ'লে আর কাহারও সহায়তা লইতাম না।"

শ্রীশচন্দ্রের পরিচালনায় বঙ্গদর্শনের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইল—১২৯০ সালের কার্তিক মাসে (অক্টোবর ১৮৮৩)। বউবাজার ষ্ট্রীটের বরাট প্রেসের অঘোরনাথ বরাট ইহার প্রকাশক হন। বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিল না; পরবর্ত্তী মাঘ মাসে উহা একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও 'বঙ্গদর্শনে'র

উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন; তাঁহার আদেশেই 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখেন :

"শ্রীচরণেষু—অঘোর বরাটকে একটু পত্র লিখিবেন, যে, মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে আপত্তি নাই, ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন।

পত্রপাঠ মাত্র ইহা লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতেছে।* কিন্তু এটুকু লইলে বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না। ইতি তাং ২৩ ফেব্রুয়ারি [১৮৮৪]।"

১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শনের নব পর্য্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভে শ্রীশচন্দ্র "নিবেদনে" যাহা লিখিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহাও উদ্ধারযোগ্য :

> ১২৯০ সালের কার্ত্তিক মাসে বঙ্কিম বাবুর যত্নে সঞ্জীব বাবুর হস্ত হইতে বঙ্গদর্শন যখন আমি গ্রহণ করি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তখন ইহার সম্পাদন কার্য্যে প্রধান সহায় ছিলেন। ইহা সাধারণতঃ সকলের জানা নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিনে সে কথা স্বীকার করিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমি আমার প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি। বঙ্গদর্শন স্থায়ী হইলে তিনিই তখন প্রকাশ্যে সম্পাদকতা গ্রহণ করিতেন এবং সেজন্য বঙ্কিমবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতিও লইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অকালে আমি বঙ্গদর্শন বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

* অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর "পশুপতি-সম্বাদ" বঙ্কিমচন্দ্রকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িক-পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এত দিনে আমি সাহিত্যসংসারে একটি ঋণমুক্ত হইলাম। সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।...

এক্ষণে রাজকার্য্যোপলক্ষে আমি কলিকাতা হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করিতেছি, পূর্ব্ববৎ স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিব না। সেই জন্য অনুজ শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম।

ডালটনগঞ্জ; পালামৌ
১লা বৈশাখ। সন ১৩০৮

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

প্রথম পর্য্যায় বঙ্গদর্শন লুপ্ত হইবার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। গানে সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতিতে তাঁহাদের দিনগুলি গভীর আনন্দেই কাটিতেছিল। কিন্তু শীঘ্রই এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-স্রোতে বাধা পড়িল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে সাব্-ডেপুটি কলেক্টরের পদ লাভ করিয়া শ্রীশচন্দ্রকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া নদীয়া যাত্রা করিতে হইল। অতঃপর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রাজকার্য্যে তাঁহাকে গয়া, সীতামাঢ়ী, কাঁথি, বীরভূম, সিংহভূম, লোহারডাগা, পালামৌ ও সাঁওতাল পরগণায় কাটাইতে হইয়াছে।

শ্রীশচন্দ্রের সাহচর্য্য-বিরহে রবীন্দ্রনাথের মনে কিরূপ রেখাপাত করিয়াছিল, 'ছিন্নপত্রে' মুদ্রিত কয়েকখানি পত্র তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। পত্রগুলির অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

সোলাপুর, অক্টোবর ১৮৮৫

আপনি তো সব্‌-ডেপুটি সাহেব—বন্তার মুখে বাংলা মুল্লুকে ভেসে বেড়াচ্ছেন—আমরা কল্‌কাতায় যাচ্ছি সে খবর রাখেন কি?… কল্‌কাতায় ফিরে গিয়ে কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হ'তে পারে না? আপনি কি এখন ইহজন্মের মতো সব্‌-ডেপুটিপুরে প্রয়াণ করলেন? শীঘ্র আর মুক্তির ভরসা নেই? আইনের গলগ্রহ গলায় বেঁধে আপনি কি তা হ'লে সর্ব্বিস-সরোবরে একরকম ডুব মারলেন? যাক, তা হ'লে আপনার আশা একেবারে পরিত্যাগ ক'রে আমরা আস্‌মানে বিহার করি আর বলাবলি করি, "আহা, শ্রীশবাবু লোকটা ছিলেন ভালো।"

১৭ এপ্রেল, ১৮৮৬

সাব্‌ ডেপুটি সা'ব,—৺গয়াধামে আপনি গমন করেছেন, এখন আমার কী গতি ক'রে গেলেন? আপনার দর্শন আমার নিয়মিত বরাদ্দের মতো হয়ে গিয়েছিল, এখন তার থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি মৌতাতহীন অহিফেন-সেবীর মতো ছটফট্‌ করচি। বাস্তবিক আপনি আমাকে অহিফেনই ধরিয়েছেন বটে। আপনি এসে নানা কৌশলে আমাকে গোটাকতক ছোটো ছোটো কল্পনার গুলি গেলাতেন, আমার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতেন, আমাকে আমারই প্রভাতসংগীত সন্ধ্যাসংগীতের মধ্যে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতেন, আমি চোখ বুজে আনন্দে আমার নিজের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বসে থাকতুম এবং সেইখান থেকে নেশার ঝোঁকে স্বগত উক্তি প্রয়োগ করতুম, আপনি শুনে মনে মনে হাসতেন। আফিমের নেশা একেই বলে। আত্মম্ভরিতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে নিজের স্বপ্নে ভোর হওয়াকেই বলে আফিমের নেশা। আপনি সেই নেশাটাই আমাকে অভ্যেস করিয়েছেন। আপনি প্রায় আপনার নিজের কথা

বলতেন না, উলটে পালটে আমারই কবিতা, আমারই লেখা, আমারই কথার মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে ফেলতেন—আমাকে খুব মাতিয়ে রেখেছিলেন যাহোক। ইংরেজেরা বর্মায়, চীনে আফিম ঢুকিয়েছে, আপনি আমার সেই অয়েলক্লথ্-মণ্ডিত ক্ষুদ্র ঘরটির মধ্যে গোপনে অলক্ষ্যে আফিমের ব্যবসা প্রবেশ করিয়েছেন—আপনি সহজ লোকটি নন। কিন্তু একবার আফিম ধরিয়ে আপনি কৌটা সমেত কোথায় অন্তর্ধান হলেন? আমি মৌতাত-বিরহে এই দুরন্ত গ্রীষ্মে একলা ঘরে ব'সে দু বেলা হাই তুলছি এবং গা-মোড়া দিচ্ছি। নিদেন, আমার দ্বারের পার্শ্বে আপনার সেই পরিচিত ছাতিটা জুতোটা রেখে গেলেও আমার কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা ছিল ...

৩০ এপ্রেল, ১৮৮৬

...আপনার বহিটা শেষ হয়ে গেলে সাধারণ পাঠকদের কি রকম লাগে জানতে ইচ্ছে রইল। হয়তো বা ভালো লাগতেও পারে। ভালো লাগবার একটা কারণ এই দেখছি, আপনি আপনার কেতাবের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশের একটি সজীব মূর্তি জাগ্রত ক'রে তুলেছেন, বাংলার আর কোনো লেখক এতে কৃতকার্য হন নি। এখনকার অধিকাংশ বাংলা বই পড়ে আমার এই মনে হয় যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সময় বাংলাদেশই ছিল কি না ভবিষ্যতে এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে।...আপনার সেই লেখাটির মধ্যে বাংলাদেশের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পূর্ব-বিভাগের জিওগ্রাফির প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। আপনার সেই লেখার মধ্যে অধিকাংশ স্থলে বাংলার ছেলেমেয়েরা কালেজি কথা কয় না ও কালেজি কাজ করে না, তারা প্রতিদিন গৃহের মধ্যে যে রকম কথা কয় ও যে রকম কাজ করে তাই

দেখতে পাওয়া যায়। অন্য কারো অথবা ক্ষুদ্র আমার লেখায় সেইটি হবার জো নেই। কিন্তু আপনাকে আর অহঙ্কৃত করা হবে না, অতএব এখানেই সমালোচনায় ক্ষান্ত হলুম।

২৭ জুলাই, ১৮৮৭

...আজকাল আমাদের এখানে বর্ষা পড়েছে। ঘন মেঘ ও অবিরাম বৃষ্টি। এই সময়ই তো বন্ধুসংগমের সময়। এই সময়টা ইচ্ছে করছে, তাকিয়া আশ্রয় ক'রে প'ড়ে প'ড়ে যা-তা বকাবকি করি। বাইরে কেবল ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি, ঝন্ ঝন্ বজ্র, হু হু বাতাস এবং রাজপথে সেকড়া গাড়ির জীর্ণ চক্রের কদাচিৎ খড়্খড়্ শব্দ। ইংরাজ-রাজের উপদ্রবে তাও ভাল ক'রে হবার জো নেই—ইংরেজ রাজত্বে বজ্র বৃষ্টি বাতাস এবং সেকড়া গাড়ির অভাব নেই—কিন্তু এই রাক্ষসী তার দেশবিদেশ-ব্যাপী আফিস আদালত প্রভৃতি বদন ব্যাদানপূর্বক তাকিয়ার কোমল কোল শূন্য ক'রে আমাদের গোটা গোটা বন্ধুবান্ধবদের গ্রাস ক'রে ফেলছে; এই ভরা বাদরে আমাদের মন্দির হাহাকার করছে। 'আষাঢ়ে গল্প' নামক আমাদের একটি নিতান্ত দেশজ পদার্থ অন্যান্য সহস্র দেশজ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবার উপক্রম করচে। আমাদের সেই বহুপুরাতন আষাঢ় সহস্র দালান ও চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষের সম্মুখে অবিশ্রাম কেঁদে মরছে কিন্তু তার আষাঢ়ে গল্প নেই। আমাদের সেই শত শত গান গল্প সাহিত্য-চর্চার স্মৃতিতে ও তুলোতে পরিপূর্ণ তাকিয়াই বা কোথায়, আমিই বা কোথায়, এবং আপনিই বা কোথায়। যদুপতিই বা কোথায়, মথুরাপুরীই বা কোথায়। অতএব হে বন্ধুবর—

ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

এই আমার চিঠির moral, তত্ত্ব, উদ্দেশ্য—অতএব কেবল এইটুকু গ্রহণ ক'রে বাকিটুকু বাদ দেবেন, কিন্তু চট্‌পট্‌ উত্তর দিতে ভুলবেন না।

আপনার বিশেষরূপে মনে থাকবে ব'লে এই চিঠির কিয়দংশ পদ্যে অনুবাদ ক'রে পাঠাই। অবধান করা হউক।

বন্ধু হে,
পরিপূর্ণ বরষায়
আছি তব ভরসায়,
কাজকর্ম কর সায়—
এস চট্‌পট্‌।
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য
তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা প'ড়ে মোর চিত্ত
করে ছট্‌ফট্‌।
যখন যা সাজে ভাই
তখন করিবে তাই ;
কালাকাল মানা নাই
কলির বিচার,—
শ্রাবণে ডেপুটি-পনা
এ তো কভু নয় সনা-
তন প্রথা এ যে অনা-
সৃষ্টি অনাচার।
রাজছত্র ফেলো ত্বাম,
এস এই ব্রজধাম,
কলিকাতা যার নাম
কিংবা ক্যাল্‌কাটা।

ঘুরেছিলে এইখেনে
কত রোঁদে কত লেনে,
এইখেনে ফেলো এনে
জুতোসুদ্ধ পা'টা।
ছুটি লয়ে কোনোমতে
পোর্টমান্টো তুলি রথে
সেজেগুজে রেলপথে
করো অভিসার।
লয়ে দাড়ি লয়ে হাসি,
অবতীর্ণ হও আসি,
রুধিয়া জানালা শাসি
বসি একবার।...

তুমি আছ কোথা গিয়া,
আমি আছি শুন্যহিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া
শোকতাপহরা।
সে তাকিয়া, গল্প-গীতি-
সাহিত্য-চর্চার স্মৃতি
কত হাসি কত প্রীতি
কত তুলো ভরা।...

১৮৮৮

...আপনার 'ফুলজানি' আমি পূর্বেই ভারতীতে পড়েছি এবং পড়েই আপনাকে একটা চিঠি লিখব মনে করেছিলুম। তার পরে ভাবলুম আপনি একেই তো চিঠির উত্তর বহু বিলম্বে দেন তার পর যদি বিনা উত্তরেই চিঠি লিখি তবে আপনাকে অত্যন্ত আশকারা দেওয়া হয়। এ রকম ব্যবহার পেলে বন্ধুদের স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। তাই নিবৃত্ত হলুম। আপনার লেখা আমার ভারি ভালো লাগে। ওর মধ্যে কোনো রকম নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই। আর এমন একটি ছবি মনে এনে দেয় যা আমাদের দেশের কোন লেখকের লেখাতে দেয় না। আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন।...

মৃত্যু

শ্রীশচন্দ্র ১৯০৮ সনের ৮ই নবেম্বর (২৩ কার্ত্তিক ১৩১৫), ৪৮ বৎসর বয়সে, পরলোকগমন করেন। 'বঙ্গদর্শন' (কার্ত্তিক ১৩১৫) লেখেন :

> "পুরাতন বঙ্গদর্শনের শেষ পরিচালক এবং নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনের প্রবর্ত্তক ও প্রধান সহায় ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার আর ইহলোকে নাই। গত ২৩শে কার্ত্তিক রবিবারে রাসপূর্ণিমার রজনীতে হঠাৎ তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে।"

রচনাবলী

শ্রীশচন্দ্রের গ্রন্থের তালিকা মোটেই দীর্ঘ নহে; একখানি সম্পাদিত গ্রন্থের কথা বাদ দিলে তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র ৫ খানি; এগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি:

১। **পদরত্নাবলী** (সম্পাদিত)। বৈশাখ ১২৯২ (২৫ জুন ১৮৮৫)। পৃ. ১০৮।

"মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্র সংগ্রহ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত।"

২। **শক্তি-কানন** (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৮০৯ শক (৯ মে ১৮৮৭)। পৃ. ১৯৯।

"দেড় শত বৎসর আগেকার বাঙ্গলা লইয়া শক্তিকানন রচিত। শক্তিকাননের সমস্তই গ্রাম্য দৃশ্য, গ্রাম্য লোকের জীবন-কাহিনী।"

৩। **ফুলজানি** (উপন্যাস)। ১৩০০ সাল (১৩ মার্চ, ১৮৯৪)। পৃ. ১৬৭।

১২৯৫-৯৬ সালের 'ভারতী ও বালকে' প্রথম প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় (অগ্রহায়ণ ১৩০১) উপন্যাসখানির যে সমালোচনা করেন, তাহাই তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্যে' স্থান পাইয়াছে।

৪। **কৃতজ্ঞতা** (উপন্যাস) ১৩০২ সাল (২২ মার্চ ১৮৯৬)। পৃ. ১১৯।

'সাধনা'য় (১৩০০-১৩০১) প্রথম প্রকাশিত।

৫। **বিশ্বনাথ** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ইং ১৮৯৬ (১২ই অক্টোবর)। পৃ. ১২৭ + ৪।

"গ্রন্থকারের নিবেদনে" প্রকাশ: " 'সাহিত্যে' [১৩০১ ১৩০২] এই উপন্যাস 'প্রতিশোধ' নামে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার

আগাগোড়া বিশে ডাকাতের কথায় পূর্ণ বলিয়া নামটি পরিবর্ত্তিত হইল। গল্পাংশেও স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি। খৃঃ ১৮৮৫ অব্দের শরৎকালে প্রথম রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমি নদীয়া জেলায় প্রেরিত হই। সেই সময়ে বিশ্বনাথের সংবাদ কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলাম। 'বালক' নামক মাসিক পত্রে নদীয়া ভ্রমণ সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে বিশ্বনাথের কথা কিছু ছিল। কিন্তু সে সামান্য মাত্র। অধিকাংশ কাহিনী গত দুই বৎসরে...সংগৃহীত।...রাঁচি; ভাদ্র ১৩০৩।"

[মৃত্যুর পরে]

৬। **রাজ-তপস্বিনী**। ১৩১৯ সাল (ইং ১৯১২)। পৃ. ২৪০।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার গ্রন্থের "নিবেদনে" লিখিয়াছেন: "স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার অগ্রজ মহাশয়, গ্রন্থকার, বঙ্গদর্শনে [১৩১৩-১৫] ৺মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর জীবনী-প্রসঙ্গ যে পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন, পুস্তকাকারে তাহাই প্রকাশিত হইল।"

শ্রীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। ? (২০ অক্টোবর ১৯১৯)। পৃ. ২০০।

সূচী: ১। শক্তিকানন; ২। ফুলজানি; ৩। স্বয়ংবর, সদানন্দ, রাজয়-বিজয়, জামাই-ষষ্ঠী, রায়-গৃহিণী, ভীমচুলহা, ভট্টাচার্য্য-মহাশয়।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা: শ্রীশচন্দ্রের লিখিত কবিতা, গল্প-উপন্যাস, চিত্র, প্রবন্ধাদি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনা:—

১২৮৬, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ...	'মাসিক সমালোচক' ...	বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক।
১২৯২, আশ্বিন ...	'বালক' ...	পাঠশালা (গল্প)
মাঘ, ফাল্গুন ...	" ...	নদীয়া-ভ্রমণ
চৈত্র ...	" ...	বাঙ্গালায় বসন্তোৎসব

১২৯৯, আষাঢ়	...	'সাধনা'	...	পুরুৎ ঠাকুরুণ (চিত্র)
১৩০০, বৈশাখ	...	"	...	মেলা-দর্শন
শ্রাবণ	...	"	...	রোপণীর গান
মাঘ	...	"	...	পৌষ-পার্ব্বণ (চিত্র)
১৩০১, শ্রাবণ	...	"	...	* বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, ১ম প্রস্তাব
১৩০২, বৈশাখ	...	"	...	লোরিকের গান, ১ম প্রস্তাব
পৌষ	...	'ভারতী'	...	" ২য় "
১২৯৯, ভাদ্র	...	'সাহিত্য'	...	চৌকিদার (গল্প)
১৩০৬, বৈশাখ	...	'প্রদীপ'	...	* বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, ২য় প্রস্তাব (লেখকের চিত্র সহ)
১৩০৮, আষাঢ়	...	'বঙ্গদর্শন'	...	সদানন্দ (গল্প)
মাঘ	...	"	...	কালিকানন্দ (গল্প)
১৩০৯, জ্যৈষ্ঠ	...	"	...	জামাই-ষষ্ঠী (গল্প)
ভাদ্র	...	"	...	স্বয়ম্বর (গল্প)
১৩১০, শ্রাবণ	...	"	...	শ্মশানতলা (চিত্র)
ভাদ্র	...	"	...	বীরকুণ্ডর
১৩১২, বৈশাখ	...	"	...	ভট্টাচার্য্য-মহাশয় (গল্প)
শ্রাবণ	...	"	...	গহেলী ও মন্তিরাম (চিত্র)
ভাদ্র	...	"	...	রায়গৃহিণী (গল্প)
অগ্রহায়ণ	...	"	...	কারুদাস (চিত্র)
মাঘ	...	"	...	ভীমচুল্হা (গল্প)
১৩১৩, বৈশাখ—১৪১৪...	...	"	...	রায়বনী-দুর্গ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
১৩১৫, জ্যৈষ্ঠ	...	"	...	রাজয়-বিজয় (গল্প)
১৩০৮, মাঘ-ফাল্গুন	...	'সমালোচনী'	...	* বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, ৩য় প্রস্তাব

শ্রীশচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনকে তাঁহার সমসাময়িক যে-কয়জন বন্ধু পুষ্ট করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একমাত্র শ্রীশচন্দ্রেরই কথাসাহিত্যিক হিসাবে কিছু খ্যাতি আছে; এই খ্যাতিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্যে' "ফুলজানি" প্রবন্ধে স্থায়িত্ব দান করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্রের বাংলা-সাহিত্যে স্থান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমরা এই প্রবন্ধে কিছু পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :

"উপন্যাসের মধ্যেও সেইরূপ শহর পল্লীগ্রামের প্রভেদ আছে। কোনো উপন্যাসে অসাধারণ মানবপ্রকৃতি, জটিল ঘটনাবলী, এবং প্রচণ্ড হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষ বর্ণিত হইয়া থাকে—সেখানে সাধারণ মনুষ্যের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ অণু-আকারে দৃষ্টির অতীত হইয়া যায়; আবার কোনো উপন্যাস উন্মত্ত ঘটনাবর্তের কোলাহল হইতে, উত্তুঙ্গ কীর্তিস্তম্ভমালার দিগন্তপ্রসারিত ছায়া হইতে, ঘন জনতাবন্যার সর্বগ্রাসী প্রলয়বেগ হইতে বহু দূরে ধূলিশূন্য নির্মল নীলাকাশতলে শস্যপূর্ণ শ্যামল প্রান্তরপ্রান্তে ছায়াময় বিহঙ্গকূজিত নিভৃত গ্রামের মধ্যে আপন রঙ্গভূমি স্থাপন করে, যেখানে মানবসাধারণের সকল কথাই কানে আসিয়া প্রবেশ করে এবং সকল সুখদুঃখই মমতা আকর্ষণ করিয়া আনে।

"শ্রীশবাবুর ফুলজানি এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাস। ইহার স্বচ্ছতা, সরলতা, ইহার ঘটনার বিরলতাই ইহার প্রধান সৌন্দর্য। এবং পল্লীর বাগানের উপর প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণ যেমন করিয়া পড়ে—কোথাও বা চিকণ পাতার উপরে ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠে, কোথাও বা পাতার ছিদ্র বাহিয়া অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে চুম্‌কি বসাইয়া দেয়, কোথাও বা জীর্ণ গোয়ালঘরের প্রাঙ্গণের মধ্যে

পড়িয়া মলিনতাকে ভূষিত করিতে চেষ্টা করে, কোথাও বা ঘনছায়াবেষ্টিত দীর্ঘিকাজলের একটিমাত্র প্রান্তে ঝিকযের উপর সোনায় রেখা কষিয়া দেয়—তেমনি এই উপন্যাসের ইতস্তত যেখানে একটু অবকাশ পাইয়াছে সেইখানেই লেখকের একটি নির্মল স্নিগ্ধ হাস্য সকৌতুকে প্রবেশ করিয়া সমস্ত লোকালয়দৃশ্যটিকে উজ্জ্বলতায় অঙ্কিত করিয়াছে।

"শ্রীশবাবু আমাদিগকে বাংলাদেশের যে একটি পল্লীতে লইয়া গিয়াছেন সেখানে আমরা সকলের সকল খবর রাখিতে চাই, সকল লোকের সহিত আলাপ করিতে চাই, বিশুদ্ধভাবে সকল স্থানে প্রবেশ করিতে চাই—তদপেক্ষা গুরুতর কিছুই প্রত্যাশা করি না। আমরা অভ্রভেদী এমন একটা কিছু ব্যাপার চাহি না যাহাতে আর সকলকেই তুচ্ছ করিয়া দেয়, যাহাতে একটি বিস্তীর্ণ শান্তিময় শ্যামল সমগ্রতাকে বিদীর্ণ ও খর্ব করিয়া ফেলে। এখানে সুগুনির মা এবং নিস্তারিণী, ফচু সেখ এবং নায়েবমহাশয় সকলেই আমাদের প্রতিবেশী—পরস্পরের মধ্যে ছোটোবড়ো-ভেদ যতই থাক্, তথাপি সকলেরই ঘরের কথা আমাদের জিজ্ঞাস্য, প্রতি দিনের সংবাদ আমাদের আলোচ্য বিষয়। এরূপ উপন্যাস সুপরিচিত স্থানের ন্যায় আমাদের মনের পক্ষে অত্যন্ত বিরামদায়ক; এখানে অপ্রত্যাশিত কিছু নাই, মনকে কিছুতেই বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় না, প্রত্যেক পদক্ষেপে এক-একটা দুরূহ সমস্যা জাগ্রত হইয়া উঠে না, সৌন্দর্যরস এত সহজে সম্ভোগ করা যায় যে, তাহার জন্য কোনোরূপ কৃত্রিম মালমসলার আবশ্যক করে না।"

রবীন্দ্রনাথ আরও সংক্ষেপে একটি বাক্যের মধ্যে শ্রীশচন্দ্রকে আমাদের নিকট ধরিয়া দিয়াছেন—

"পরিচিত সহজ সৌন্দর্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ; বাংলার লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই অসামান্য ক্ষমতাটি আছে ·· ।"

পুরাতন গ্রামীণ বাংলাদেশকে, শিরোমণি-সার্ব্বভৌম-শাসিত বাংলা দেশের স্নিগ্ধছায়াঘন পল্লীর সমাজকে শ্রীশচন্দ্র জানিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার 'শক্তি-কানন,' 'ফুলজানি,' 'বিশ্বনাথ' ও 'কৃতজ্ঞতা'র পাঠকদের চিত্তে তিনি অত্যন্ত সহজে তাঁহার নিজের দরদ ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন, ইহাই বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব। একটা মহৎ আদর্শে তাঁহার যাবতীয় রচনাই বিধৃত হইয়া শিল্পের দিক্ দিয়াও সরস ও প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই সরসতা ও প্রসন্নতা যে তাঁহার প্রকৃতিগত, রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে' তাহার প্রমাণ পাই। শ্রীশচন্দ্র শিল্পী হিসাবে সম্পূর্ণ ও সার্থক হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে দিয়াছেন :

"আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার নিজের প্রতিভায় নিজে সন্তুষ্ট নহেন, তিনি আপনাকে আপনি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন। অরসিকের চক্ষে যাহা সহজ তাহা তুচ্ছ; গ্রন্থকার ক্ষমতাশালী লেখক হইয়াও সেই অরসিকমণ্ডলীর নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভনটুকু কাটাইতে পারেন নাই। তিনি হঠাৎ এক সময় আপন প্রতিভার স্বাভাবিক গতিকে বলপূর্ব্বক প্রতিহত করিয়া তাহাকে অসাধারণ চরিত্র ও লোমহর্ষণ ঘটনাবলীর মধ্যে অসহায়-ভাবে নিক্ষেপ করিয়াছেন।"

এই দোষ তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটি বৃহৎ গল্পকে খণ্ডিত করিয়াছে; যে সামান্য কয়েকটি ছোট গল্প তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার কয়েকটিতে আমরা শিল্পী শ্রীশচন্দ্রের সার্থক পরিচয় পাই।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৮৬

শিশিরকুমার ঘোষ

১৮৪০—১৯১১

শিশিরকুমার ঘোষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৫৮

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭

৭.২—১৬/১/১৯৫২

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে যে-সকল প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। শুধু বাংলা দেশের নহে, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষসাধনে তাঁহার ভাবাদর্শ ও কর্ম্মধারা যে কত দূর কার্য্যকরী হইয়াছিল, আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। সে-যুগের পরমুখাপেক্ষী, ইংরেজের কৃপার উপর একান্তভাবে নির্ভরপরায়ণ দেশবাসীকে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' মারফৎ আত্মনির্ভরশীল এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অবহিত করিবার সাধনায় সারা জীবন তিনি অক্লান্তভাবে যে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল। নির্ভীক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিগঠনকারী-রূপে তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া আছেন।

এই সর্ব্বজনবিদিত শিশিরকুমারের কীর্ত্তিকাহিনী অনেক প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার একাধিক জীবনীকার* রাজনৈতিক চিন্তানায়ক, কর্ম্মবীর, সমাজ-সংস্কারক, সঙ্গীতকলাবিৎ, অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা, ভক্ত বৈষ্ণব শিশিরকুমারের অল্পবিস্তর পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধক শিশিরকুমারের কীর্ত্তি নানা কারণে এতাবৎকাল সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। ফলে তাঁহার বহুমুখী জীবনের অন্য দিক তাঁহার সাহিত্য-জীবনকে কতকটা আবৃত করিয়াছে, অনেক কাহিনী অতীতের অন্ধকারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সেই কাহিনী সাধ্যমত

* শ্রীঅনাথনাথ বসু: 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' (১৩২৭), Wayfarer: *Life of Shishir Kumar Ghose* (ইং ১৯৪৬), শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল: 'ভারতের মুক্তিসন্ধানী' (১৩৫৫) পুস্তকের "শিশিরকুমার ঘোষ" নিবন্ধ।

উদ্ধারের চেষ্টা আমি করিয়াছি। তাঁহার জীবনে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গম হইয়াছিল। সুতরাং স্বতঃই সাহিত্য ছাড়া অন্য বিষয়ও আসিয়া পড়িয়াছে।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১২৪৭ সালের আষাঢ় (ইং ১৮৪০) মাসে যশোহর জেলার পলুয়া-মাগুরা গ্রামে শিশিরকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ ঘোষ; মাতার নাম অমৃতময়ী। হরিনারায়ণ যশোহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। উপার্জ্জিত অর্থের বেশীর ভাগই তাঁহার দানাদি সৎকর্ম্মে ব্যয় হইয়া যাইত। গ্রামে তিনি একখানি ত্রিতল বাটী ও কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার আট পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে প্রথম চারি জন—বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল। কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা—স্থিরসৌদামিনী; এই বিদুষী মহিলা 'আমাদের পারিবারিক কাহিনী' নামে একখানি পুস্তক পাণ্ডুলিপি আকারে রাখিয়া গিয়াছেন; ইহার সাহায্যে ঘোষ-পরিবারের অনেক কথা জানা যায়।

বিদ্যাশিক্ষা

শিশিরকুমারের পাঠশালার পাঠ গ্রামেই সাঙ্গ হয়। অতঃপর তিনি পিতার কর্ম্মস্থল যশোহরে থাকিয়া মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমারের সহিত স্থানীয় স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পাঠে কখনও তাঁহার

অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয় নাই, তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা অদম্য ছিল। শরীর-চর্চ্চাতেও তাঁহাকে বিলক্ষণ অবহিত দেখা যাইত; কুস্তী, সাঁতার, বন্দুক-চালনা প্রভৃতিতে তাঁহার অসাধারণ পটুতা ছিল। তিনি বহুমুখী প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। বাল্যাবধি তিনি সঙ্গীতানুরাগী; এসরাজ, সেতার, ও পাখোয়াজ বাদনেও তাঁহার অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছবি আঁকিতেও পারিতেন।

যশোহরে কিছু কাল অধ্যয়ন করিবার পর শিশিরকুমার উচ্চশিক্ষা লাভার্থ কলিকাতায় আসেন এবং কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (বর্ত্তমানে হেয়ার স্কুল) ভর্ত্তি হন। এই বিদ্যালয় হইতেই তিনি ১৮৫৭ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হয়; বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতিও পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার প্রথম বিভাগে পাস করিয়া এক বৎসরের জন্য মাসিক ৮৲ "হিন্দু স্কুল-বৃত্তি" লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিখিবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। গণিতে সমধিক প্রীতিই সম্ভবতঃ এদিকে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি অল্প দিনই ছিলেন।

বিবাহ

উনিশ বৎসর বয়সে শিশিরকুমারের বিবাহ হয়; পাত্রী ভুবনমোহিনীর বয়স তখন নয়। বিবাহের আট বৎসর পরে কলেরায় ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে, মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, শিশিরকুমার দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী কুমুদিনী (মৃত্যু : ২৯-৮-১৯০৬)—নদীয়া জেলার হাঁসখালি গ্রাম-নিবাসী রামধন বিশ্বাসের কন্যা। ইঁহারই গর্ভজাত সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সন্তান—তুষারকান্তি, বর্ত্তমানে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক।

জনকল্যাণ-ব্রত

লোকহিতৈষণার বীজ তরুণ বয়সেই শিশিরকুমারের হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল। ছাত্র-জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটি জনকল্যাণ-কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। যশোহর ও নদীয়ায় তখন নীলকরদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। তাহাদের অত্যাচার একেবারে মাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল। দীনবন্ধুর অমরকীর্ত্তি 'নীলদর্পণ' এই সকল অত্যাচার অনাচারের কাহিনীর নিপুণ আলেখ্য।* নীলকরদের অকথ্য অত্যাচারে উপদ্রুত দরিদ্র প্রজাদের দুঃখে যুবক শিশিরকুমারের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি তাহাদের হইয়া নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়িতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় যশোহর ও নদীয়া জেলার বহু দুর্গত কৃষক নীল বোনা বন্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। এই সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা তৎসম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। শিশিরকুমারও উক্ত পত্রের "যশোহরের সংবাদদাতা"-রূপে প্রধানতঃ "M. L. L. স্বাক্ষরে নীলকরদের অত্যাচার-কাহিনী লিখিয়া পাঠাইতে সুরু

* "নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র-পরিবারের দুর্দ্দশা নীলদর্পণে ভিত্তিভূমি।"—'ভারত-সংস্কারক,' ৭ নবেম্বর ১৮৭৩।

করেন ; ইহা ১৮৫৯-৬০ সনের কথা।* এই প্রসঙ্গে স্থিরসৌদামিনী লিখিয়াছেন :

> সেই সময়ে নীলকর সাহেবেরা উত্তর অঞ্চলে বড়ই অত্যাচার করে। সেই সময়ে সেজদাদা সংবাদপত্রে প্রজাদিগের দুঃখের বিষয় যাহাতে গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর হয় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার নিজ নাম না দিয়া মন্মথলাল বলিয়া আপন নাম দিতেন। তাঁহার এই উত্তম বৃথা হয় নাই।

সংবাদপত্র যে প্রজাসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা গবর্মেণ্টের গোচরীভূত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, শিশিরকুমার সে-কথা উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং এমনিভাবে দরিদ্র প্রজাসাধারণের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া শুধু জনকল্যাণ-ব্রতে নয়, সাংবাদিকতায়ও তাঁহার হাতে-খড়ি হইল।

জনকল্যাণ-ব্রতে শিশিরকুমারের দীক্ষাগুরু তাঁহার অগ্রজ বসন্তকুমার। ঘোষ-ভ্রাতৃগণের মধ্যে অপূর্ব্ব সম্প্রীতি অনেকের ঈর্ষার বিষয় ছিল। অগ্রজ বসন্তকুমার সম্বন্ধে শিশিরকুমার লিখিয়াছেন :—"আমি দাদাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার একটু সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি শত বার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন, ভালই গড়িয়াছিলেন।" অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, সুশিক্ষিত, জ্ঞানানুশীলন-

* "শিশিরকুমারের আর একটি নাম ছিল—মন্মথলাল ঘোষ। তিনি পত্রগুলি লিখিয়া তাহার নিয়ে M. L. G. স্বাক্ষর করিতেন, কিন্তু মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ M. L. G. স্থলে M. L. L. প্রকাশিত হইত।"—শ্রীঅনাথনাথ বসু : 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ,' পৃ. ৩৭।

ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত ১৮৫৯ সনের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সংখ্যাগুলি আপাততঃ র — যাইতেছে না। আমরা মাত্র ১৮৬০ সনের পত্রিকায় "M. L. L." ও Jessore Correspondent"-রূপে লিখিত শিশিরকুমারের যে কয়খানি ধ্যে পাইয়াছি, তাহার মধ্য হইতে একখানি পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

তৎপর জ্যেষ্ঠের চরণোপান্তে বসিয়া শিশিরকুমার প্রথম যৌবনে সেবা-ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নানা জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ঘোষ-ভ্রাতৃগণেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রামে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর, হাট-বাজার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মাতা অমৃতময়ীকে তাঁহারা সাক্ষাৎ দেবী-জ্ঞানে ভক্তি করিতেন, মাতার নামানুযায়ী তাঁহারা এগুলির নামকরণ করিয়াছিলেন। পিতার জীবিতকালেই বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার প্রগতিশীল ব্রাহ্মদলে যোগদান করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হইলে পরিবার তথা সমাজের উন্নতির আশা যে সুদূরপরাহত, তখনকার দিনেও সে-কথা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই চেষ্টায় ঘোষ-পরিবারের অন্তঃপুরেও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিয়াছিল।

মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা : 'অমৃত প্রবাহিনী'

তৎকালে দেশবাসী ছিল নিজেদের দুরবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। দুই ভ্রাতা—বসন্তকুমার ও শিশিরকুমার ভাবিয়া দেখিলেন যে স্বদেশবাসীকে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে হইলে একখানি সংবাদপত্রের প্রকাশ অপরিহার্য্য, সংবাদপত্রের সাহায্যেই দেশের ও দশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। তাঁহারা তখন এই দিকেই মনোনিবেশ করিলেন। কিছু টাকাও জোগাড় হইল। কিন্তু তখনকার দিনে সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতে সংবাদপত্র প্রকাশে সঙ্কল্প অনেকের নিকট আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক কল্পনা মনে হইলে ঘোষ-ভ্রাতৃগণ ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া তাঁহারা এই সঙ্কল্পকে কার্

পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। অগ্রজের আগ্রহাতিশয্যে, নিজের অন্তরের প্রেরণায়ও বটে, শিশিরকুমার সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য সেই টাকা লইয়া কলিকাতা ছুটিলেন। এই সাধু সঙ্কল্পে ভগবান্ হইলেন তাঁহার সহায়। কলিকাতায় কয়েক দিনের মধ্যেই সরঞ্জাম সহ একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রেস সস্তায় হস্তগত হইল। এই প্রাথমিক সাফল্যে শিশিরকুমারের হৃদয় অদম্য উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যত সত্বর সম্ভব ছাপাখানা-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ শিখিবার জন্য তিনি অন্তরে অন্তরে একটা আগ্রহ অনুভব করিলেন। সেই সুযোগও আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশিরকুমার একটি ছাপাখানার মালিকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অমানুষিক পরিশ্রমে অল্প দিনের মধ্যেই অক্ষর সাজান ও কম্পোজ করা হইতে ফর্ম্মা ছাপানো পর্য্যন্ত সব কাজই একরূপ শিখিয়া লইলেন। তাহার পর ছাপাখানার সরঞ্জাম সহ নৌকাযোগে বাটী ফিরিলেন। ইহা ১৮৬২ সনের শেষ ভাগের কথা।

শিশিরকুমার যখন প্রেস লইয়া দেশে ফিরিলেন তখন বসন্তকুমারের আনন্দ দেখে কে? তাঁহার মনের অবস্থা তখন এইরূপ যে, শিশিরকুমার যেন দিগ্বিজয় করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি ভগিনী স্থিরসৌদামিনীকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহার এই মনোভাব সুপরিস্ফুট। স্থিরসৌদামিনী লিখিতেছেন :—

> দাদার চিরজীবনের সাধ এদেশে একটি ছাপাখানা করিয়া একখানি সংবাদপত্র বাহির করিবেন। এই জন্য কলিকাতা হইতে কাষ্ঠের একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া বাটীতে আনা হয়। আমি তখন শ্বশুরালয়ে। মুদ্রাযন্ত্র পাইয়া তিনি আমাকে একখানি পত্র লেখেন।... তিনি লিখিয়াছিলেন :—

'ভগিনি, আমি একটা জিনিস পাইয়াছি, তাহাতে আমার এত আনন্দ হইয়াছে যে, তোমাকে তাহা লিখিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তুমি মনে ভাবিবে আমার একটা খুব বড় চাকুরী হইয়াছে, কিন্তু চাকুরী ইহার কাছে অতি তুচ্ছ। হয়তো তুমি ভাবিবে আমার একটি পুত্র-সন্তান হইয়াছে। ইহার তুলনায় তাহাও অতি সামান্ত বলিয়া বোধ করি।... আমি কলিকাতা হইতে একটি মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়াছি। আজ আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইল।'*

এখন প্রেস ত জোগাড় হইল, কিন্তু তাহা দিয়া কাজ চালানো যায় কি ভাবে, সে আর এক সমস্যা। কিন্তু বসন্তকুমার ও শিশিরকুমার কিছুতেই দমিবার পাত্র নহেন। গ্রামের ছুতারের সাহায্যেই কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি মেরামত করিয়া খাটানো হইল। শিশিরকুমার কয়েক জন যুবককে অক্ষর সাজান হইতে কাগজ ছাপা পর্য্যন্ত সকল কাজই শিখাইতে লাগিলেন। অভীপ্সিত সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প অদূর ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি রাখিয়া আপাততঃ সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প কৃষি ইত্যাদি বিষয়ক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করাই স্থির হইল। পত্রিকার নামকরণ হইল—'অমৃত প্রবাহিণী'; মুদ্রাযন্ত্রের নাম হইল—অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্র। বসন্তকুমারের সম্পাদনায় 'অমৃত প্রবাহিণী'র প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হয়—১৮৬২ সনের ডিসেম্বর মাসে। তখন হরিনারায়ণ জীবিত; বসন্তকুমার ৫০৲ বেতনে স্বগ্রামস্থ গবর্মেণ্ট-সাহায্যপ্রাপ্ত ইঙ্গ-বঙ্গ স্কুলের হেডমাস্টারি করিতেছেন। ১৮৬১ সনেও তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সরকারী শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে ইহার উল্লেখ আছে।

* মৃণালকান্তি ঘোষ (হেমন্তকুমারের পুত্র): "অমৃত বাজার পত্রিকার জন্মকথা," 'পঞ্চপুষ্প'—আশ্বিন ১৩৩৭।

'অমৃত প্রবাহিণী' একখানি সুসম্পাদিত পত্রিকারূপে সুযোগ্য সমালোচকগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ 'গ্রামপ্রকাশ' ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন :—

অমৃতপ্রবাহিণী।—এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। ইহাতে বিজ্ঞানাদি ঘটিত বিবিধ বিষয় লিখিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না। আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া দেখিতেছি, এখন এ সকল বিষয়ে ভাল লোকে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। অমৃতপ্রবাহিণী যশোহরে হইতেছে। ইহাও এ দেশের একটি শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। এত দিন মফস্বলে ঈদৃশ বিষয় সকলের অনুষ্ঠান সম্ভব ছিল না।

'অমৃত প্রবাহিণী' দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। ১২৭০ সালের পৌষ* (১৮৬৩, ডিসেম্বর ?) মাসে হরিনারায়ণের মৃত্যু হওয়ায় সংসারের মুখ চাহিয়া ঘোষ-ভ্রাতৃগণকে অর্থোপার্জ্জনে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হইল। বসন্তকুমারকেও স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া বাঁকুড়া যাইতে হয়।

চাকুরী

পিতৃবিয়োগের পর দুই ভ্রাতা বসন্তকুমার ও শিশিরকুমারের জীবনের একটা অধ্যায়ের উপর সাময়িকভাবে ছেদ পড়িল। জন্মপল্লীর শান্ত পরিবেশে থাকিয়া 'অমৃত প্রবাহিণী' পত্রিকার সহায়তায় শিশিরকুমার সাধ্যমত জনসেবা করিতেছিলেন। কিন্তু এই সময় তাঁহার জীবনের স্রোত আকস্মিকভাবে মোড় ফিরিল, জীবিকা অর্জ্জনের

* মৃণালকান্তি ঘোষ : 'পরলোকের কথা,' পৃ. ৩, ৯ দ্র°।

চেষ্টায় তাঁহাকে ব্যাপৃত হইতে হইল। তিনি প্রথমে কোন্নগর ও পরে সাতক্ষীরা স্কুলের শিক্ষক হন। স্থিরসৌদামিনী লিখিয়াছেন :—

> বাবার পরলোকপ্রাপ্তির এক মাস পরেই বাঁকুড়া জেলা স্কুলের হেড মাষ্টারের কাজে দাদাকে নিয়োজিত করিয়া সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পত্র লিখিয়াছেন। কোন্নগরের স্কুলে সেজদাদা হেড মাষ্টার হইলেন। বাটীর স্কুলে মেজদাদা রহিলেন।...
>
> দাদা কিছু দিন বাঁকুড়ায় কাজ করিয়া ছাড়িয়া কলারওয়া স্কুলে মাষ্টার হইলেন। সেজদাদা কোন্নগরের কার্য্য ছাড়িয়া সাতক্ষীরার স্কুলে মাষ্টার হইলেন। বাবা যাওয়ার দশ মাস পরে একটু পরিবর্ত্তনের জন্ত মাকে ও সেজবৌকে তথায় লইয়া গেলেন।

কোন্নগরে শিক্ষকতাকালে শিশিরকুমার মধ্য-বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সুনজরে পড়েন। মাসিক ৭৫৲ বেতনে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের একটি পদ খালি হইলে, ভূদেব সেই শূন্ত পদে তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার যশোহরেই স্থিত হন। ইহার অল্প দিন পরেই সংসারে আর এক নূতন বিপদ দেখা দিল। বসন্তকুমার ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কর্ম্মস্থল হইতে দেশে ফিরিলেন। কিছু দিন ক্ষয়রোগে ভুগিয়া ১২৭৩ সালের ১২ই চৈত্র (১৮৬৭, ২৪এ মার্চ) তিনি পরলোকগমন করেন। একাধারে যিনি ছিলেন গুরু, শিক্ষাদাতা, সহকর্ম্মী, সেই অগ্রজের শোকে শিশিরকুমার মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

যশোহরের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট জেম্‌স মন্‌রো শিশিরকুমারকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই দুর্দ্দিনে তিনি শিশিরকুমার ও হেমন্ত-কুমারকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর আয়ের ইনকাম-ট্যাক্স এসেসরের কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। স্থিরসৌদামিনী লিখিয়াছেন :—

দাদা যখন যান সে সময়ে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেব আমার ভ্রাতাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি সেই সময়ে মেজদাদাকে এসেসরী কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার এত ভালবাসা ছিল যে, সেজদাদাকেও ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সেজদাদা সেই সময় স্কুলের ইন্‌স্পেক্টারী করিতেন। সেজদাদা তাঁহার কার্য্য ছাড়িয়া এসেসর হইলেন, সেজন্ত সেজদাদার উপর ভূদেববাবু অত্যন্ত রাগ করিলেন সেজদাদার একটু অন্যায় হইয়াছিল। একটা কাজে ইস্তফা না দিয়া অন্ত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তিনি তাহা করেন নাই।

ভূদেব শিশিরকুমারের নামে অভিযোগ করিয়াছিলেন, ফলে তাঁহার দুই কাজই যায়—এ কথাও স্থিরসৌদামিনী লিখিয়া গিয়াছেন।*

'অমৃত বাজার পত্রিকা'

রাজনীতি-সংক্রান্ত একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প যে শিশিরকুমার ও বসন্তকুমারের মনে প্রেস ক্রয় করিবার সময় হইতেই জাগরূক ছিল, সে-কথা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। এখন চাকুরীর পাশ হইতে মুক্ত হইবার পর শিশিরকুমার সেই সঙ্কল্পকে রূপ দান করিতে তৎপর হইয়া উঠিলেন। পত্রিকা প্রকাশাদির ব্যাপারে বসন্তকুমার ছিলেন শিশিরকুমারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। অগ্রজের অকালে পরলোকগমনে এই গুরুতর ব্যাপারে তিনি তাঁহার সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্তু এসেসরি কার্য্যে ইস্তফা দিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার।

* শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্ত্তৃক উদ্ধৃত, দ্র° 'প্রবর্ত্তক,' অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।

তাঁহারা মাতার নাম যুক্ত করিয়া সংবাদপত্রখানির নাম রাখিলেন—'অমৃত বাজার পত্রিকা'।

ঐকান্তিক আদর্শনিষ্ঠা এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কি ভাবে অসাধ্য সাধন করা যায়, আজ হইতে ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশের এক সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে 'অমৃত বাজারে'র মত উচ্চাঙ্গের পত্রিকা প্রকাশ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বস্তুতঃ 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র জন্মকথা উপন্যাসের কাহিনী অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক। কি ভাবে কলিকাতার এক বিধবা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে মাত্র ৩২৲ টাকা মূল্যে একটি কাঠের ছাপাখানা ক্রয় করিয়া পল্লীগ্রামে লইয়া যাওয়া হইল, পত্রিকা প্রকাশের সূচনা হইতেই স্বত্বাধিকারীদের কি ভাবে একাধারে কম্পোজিটার, প্রেসম্যান এবং সম্পাদকের কাজ করিতে হইত, এ সকল কথা শিশিরকুমার নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। "Romance of an Indian Newspaper" নাম দিয়া, ৪ জানুয়ারি ১৯০৪ তারিখের 'পত্রিকা'য় তিনি লেখেন :—

...the Patrika cost its founders only Rs. 240 when they ushered it into existence.

This is how the "Patrika" first made its appearance. An enterprising man had purchased printing materials; but he failed, and dying soon after, his widow wanted to dispose of them. These materials were purchased and carried to Amrita Bazar, an ordinary village in the district of Jessore. The most valuable of these materials was the printing press, a wooden one, called the Balein Press, which cost Rs. 32. It was set up with the help of the village carpenter, and cases with worn out types were placed on their stands. In this way, a printing workshop was established at the village.

Those who did all this had, however, to learn the business of printing before leaving Calcutta; and when they started the "Patrika" they had to hold the composing sticks and set their

articles in type, and also to print the sheets themselves. In short, even when a few men had been trained in the village, the proprietors themselves had to do the work of the compositors, the pressmen and the editors so long they remained at Amrita Bazar, which was their native village.

Besides holding the composing sticks and pulling the press for printing their sheets, they had to cast rollers and types, prepare matrices, manufacture ink, as also paper. In paper-making they failed, but they manufactured fine ink. The matrices and types, which they cast, were also very poor products, they were utilised in times of urgent need.

The paper they started was a weekly, in the Bengalee language, and called it the "Amrita Bazar Patrika." It began by teaching that "we are we" and "they are they."

সে-যুগে এদেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল এবং তাঁহাদের মধ্যে ইংরেজের অনুকরণপ্রিয়তা উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। 'অমৃত বাজার' গোড়া হইতেই দেশবাসীর কানে এই মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইবার অমোঘ মন্ত্র দিল, দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সূচনাতেই এই মূলমন্ত্র প্রচার করিল—"আমরা ইংরেজ হইতে স্বতন্ত্র, কাজেই আমাদের পরস্পরের আদর্শ এবং পন্থাও বিভিন্ন।"

"যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্র" হইতে বাংলা সাপ্তাহিক-রূপে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' জন্মলাভ করে—১২৭৪ সালের ৯ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮)।* ইহার বার্ষিক

* 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম দুই বৎসরের সংখ্যাগুলি একান্ত দুষ্প্রাপ্য, এমন কি পত্রিকা-কার্য্যালয়েও নাই। এগুলি আবিষ্কার করিবার সৌভাগ্য আমারই প্রথম ঘটে। ইহার ফলে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ১ম সংখ্যার সঠিক প্রকাশকাল সকলের জানা সম্ভব

মূল্য ধার্য্য হয় ৫৲ টাকা। পত্রিকার শিরোভূষণরূপে এই কবিতাটি শোভা পাইত :—

অধীনতা* কালকূটে মরি হায়২।
করেছে কি আর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়।

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয় :—

আমরা মনস্থ করিয়াছি, যে এদেশীয় ও ইউরোপীয় বিবিধ সংবাদ, নূতন আইনের মর্ম্ম, ব্রিটিশ ও এদেশস্থ অন্যান্য রাজ্যের শাসনপ্রণালী, ও তাহাদের পরস্পরের গুণাগুণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকটিত করিব। আমাদের বিশেষ যত্ন থাকিবে যে, যে স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরাজ বাহাদুরেরা আমাদের দেশ, পরম অত্যাচারী যবন অধিকার হইতে স্বীয় হস্তে লইয়া আমাদের এত উন্নতি করিয়াছেন—যাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্যশাসনের ন্যায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্য্যে আমাদিগকে হস্ত ক্ষেপণ করিতে দেন না, তাহাদিগের রীতি, নীতি, উদ্দেশ্য, স্বার্থশূন্যতা, ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট যে ঋণপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের যত্ন করি।...

আমরা স্থানে স্থানে সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়াছি; সুতরাং প্রত্যাশা করি, যে পাঠকবৃন্দকে দেশ বিদেশের নূতন২ সংবাদ দিতে

হইয়াছে। ১৩৫৩ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে আমি পত্রিকার জন্মকথা—কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা সহ প্রকাশ করিয়াছি।

অন্যান্য বর্ষের 'পত্রিকা' হইতে যে রচনাংশগুলি এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি দেখিবার সুবিধা দান করিয়া শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

* কেবলমাত্র ৭ই মে তারিখের সংখ্যায় "অধীনতা" স্থলে "পরাধীন" কথাটি ছিল। শিরোভূষণটি এই সংখ্যা হইতে ২য় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা (১১-৩-১৮৬৯) পর্য্যন্ত পত্রিকায় স্থান পাইয়াছিল।

পারিব। এবং নিশ্চিত বলিতে পারি, যে যত দিন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, ফিনিয়ানদিগের দৌরাত্ম্য শেষ না হয়, তত দিন সংবাদাবলী দ্বারা আমাদের পত্রিকা সুসজ্জিতা করিবার কোন চিন্তা থাকিবে না, কিন্তু সম্পাদকদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি এ সমুদয় ক্ষান্ত হইয়া যায়, আর নূতন কোন রাজবিপ্লব, ঝটিকা জলপ্লাবন প্রভৃতি উপস্থিত না হয়, তখন আমাদিগকে কিছু বিপদে পড়িতে হইবে সন্দেহ নাই। এরূপ দায়ে যদি পড়ি, তখন আমরা সংবাদ প্রস্তুত করিতে ক্রুটি করিব না, ও যদি কোন সম্পাদকের অনুগমন করিয়া সংবাদ প্রস্তুতে প্রবর্ত্ত হই, তবে আমরা এরূপ চমৎকার সংবাদ দিব, যাহা কোনকালে ঘটেও নাই, ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই।...(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮)

আমাদের পত্রিকার উপর কোন কোন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বৈরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের পত্রিকায় যদি মিথ্যা কথা লিখি, তবে কাহারও ক্ষতি হইতে পারে না। যদি সত্য কথা লিখি, তবে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের আমারদিগকে তাড়া দিয়া ক্ষান্ত করিবার কিছু লাভ নাই। বলের দ্বারা সত্য লুকাইয়া রাখা এবং কাপড় দিয়া আগুন বাঁধার চেষ্টা সমান। আমরা প্রায়ই স্পষ্ট কথা বলি। যে ঘটনা যে রকম, তাহা সাধারণকে স্পষ্ট করিয়া দেখাই। কাহার অনুরোধ কিংবা কাহাকে বিরক্ত করিবার ভয়ে কোমল করিয়া লিখি না। ফল আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কর্ত্তৃপক্ষকে প্রার্থনা করা আমাদের তত উদ্দেশ্য নয়, আমাদের দেশীয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কিরূপ হীনাবস্থায় আছেন, তাহা তাঁহারদিগকে দেখানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা ফটগ্রাফার মাত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক ফটগ্রাফ লইয়া আমরা এদেশীয়দিগকে দেখাইয়া থাকি, যদি ফটগ্রাফি তুলিতে এরূপ ছবি উঠে যে, কেহ২ অন্যের মুখের ভাত কাড়িয়া খাইতেছে; বলবান দুর্ব্বলের গলা টিপিতেছে; অভদ্র অপমান

করিতেছে; একজনের স্তায্য স্বত্ব অন্তকে দেওয়া হইতেছে, বিচারক অবিচার করিতেছেন, তবে আমাদের হাত কি?

কোন২ প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ আমারদিগকে এরূপও বলিয়াছেন যে, আমাদের পত্রিকা কর্ত্তৃক জাতিবৈরতা নষ্ট না হইয়া আরো বৃদ্ধি হইবে। এই উপদেশের নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্তবাদ। কিন্তু জাতিবৈরতা নিবারণ করার কর্ত্তা কে? আমরা অধিক ত কিছু চাই না, দুটি মিষ্ট কথা আর পাতের চারিটি প্রসাদ পাইলেই কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞতায় গদগদ হই। প্রতিবিধিৎসার স্থান হিন্দুদিগের মন নয়। আমরা প্রহার খাইয়া যদি প্রহারকের নিকট দুটি মিষ্ট কথা শুনি, তাহা হইলেই আমাদের মন গলিয়া যায়। আমরা ইংরাজ অপেক্ষা এদেশীয়দিগকে অধিক ভালবাসি, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু বোধ হয় ন্তায়পরতা আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। মনে একটি মুখে অন্ত প্রকার যাহারা প্রকাশ করেন, তাহাদের অপেক্ষা মনের কথা যাহারা খুলিয়া বলেন, তাহারা কি ভাল করেন না? অতএব সত্য কথা বলিতে যে ফল হউক না কেন, আমরা তদ্বিষয় একবার চিন্তাও করি না।...(৯ জুলাই ১৮৬৮)

পত্রিকা-সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিলেন শিশিরকুমার স্বয়ং। তিনি শুধু পত্রিকার নীতিই পরিচালনা করিতেন না, অধিকাংশ রচনা স্বয়ং লিখিতেন। প্রথম হইতে তাঁহাকে রচনা দিয়া সাহায্য করিতেন—হেমন্তকুমার, সুপ্রসিদ্ধ আনন্দমোহন বসু, যশোহর জেলা-স্কুলের বাংলা-শিক্ষক জগদ্বন্ধু ভদ্র ও শিশিরকুমারের ভগিনীপতি কিশোরীলাল সরকার।

পত্রিকা নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিল। ইহাতে শিশিরকুমার বাঙালী-সমাজের দোষ-ত্রুটি যেমন নিঃসঙ্কোচে প্রদর্শন করিতেন, তেমনি আবার শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের অন্তায় ব্যবহার ও অনাচারের তীব্র সমালোচনা

করিতেও ভীত হইতেন না। ইহার ফলে পত্রিকা ক্রমে ক্রমে রাজপুরুষগণের চক্ষুশূল হইয়া উঠিতেছিল। কোন "নিম্নশ্রেণীস্থ" ম্যাজিস্ট্রেটের নারী-ঘটিত দুর্ব্বলতার কথা প্রকাশ করিয়া 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ১৭শ সংখ্যায় (১২-৬-৬৮) "ঘোর অত্যাচার" ও ১৯শ সংখ্যায় (২৬ জুন) "পাঠকগণের প্রতি" দুইটি প্রস্তাব মুদ্রিত হয়। শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষেরা সুযোগ বুঝিয়া 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথম প্রস্তাবটির জন্য সম্পাদক শিশিরকুমার ও মুদ্রাকর চন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে, এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবটির লেখক বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় ফৌজদারির হেড ক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্রের বিরুদ্ধে এক জটিল মানহানির মামলা রুজু হইল। সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত মনোমোহন ঘোষ আসামীদের তরফে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই মামলা সম্পর্কে শিশিরকুমার পত্রিকায় যে সকল কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হইল; ইহা হইতেই প্রকৃত ব্যাপারটি পরিস্ফুট হইবে :—

> আমাদের লাইবেলের মকর্দ্দমা।—গত সোমবারে আমাদের লাইবেল মকদ্দমার হুকুম জজ সাহেব দিয়াছেন। ইহাতে, রাজকৃষ্ণ বাবুর এক বৎসর মিয়াদ ও ১০০০ টাকা জরিমানা ও প্রিণ্টার বাবু চন্দ্রনাথ রায়ের ছয় মাস মিয়াদ...হইয়াছে। শিশির বাবু অব্যাহতি পাইয়াছেন।
>
> যাহারা ভাবিতেন এ মকদ্দমা শুদ্ধ কেবল দুই ব্যক্তিকে লইয়া তাঁহাদের ভ্রম গিয়াছে। যাঁহারা এই মকর্দ্দমাটিতে শুদ্ধ একটি সামান্য লাইবেল মকর্দ্দমা ভাবিতেন, তাঁহারা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ব্রাইটকে অপবাদ করাতে এত গোল কখন হইত না, ইহার অন্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে। এ মকর্দ্দমার বাদী প্রতিবাদী

উভয়েই নগণ্য ব্যক্তি তবু লং সাহেবের বিরুদ্ধে নীলকরেরা যে লাইবেল মকর্দ্দমা আনেন তাহা অপেক্ষা ইহাতে অধিক জনরব কেন হইল ?

১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধে কোম্পানি বাহাদুরের প্রাণ ধ্বংস হয়। আর যে দিবস কোম্পানি বাহাদুরের লয় হয়, সেই দিবস হইতে আর একটি বৃহত্তর সমরের সূত্রপাত হয়। বাঙ্গালি মাত্রের যেন মনে থাকে যে ইংরাজ বাহাদুরেরা বাঙ্গলা কখন সমরে অধিকার করেন নাই। সেরাজদ্দৌল্লার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বাঙ্গালিরা ইংরাজদিগকে আহ্বান করে, আর এই ছুতা অবলম্বন করিয়া ইংরাজেরা বাঙ্গলা শাসন করিতেছেন। সমরে পরাজিত হইলে অধিবাসিগণ যেরূপ নিস্তেজ হইয়া যায়, বাঙ্গালিদের সে অবস্থাটি হয় নাই।

বাঙ্গালিরা যদিও স্বভাবতঃ ভীরু, কিন্তু এক্ষণে অযোধ্যা ও পঞ্জাবের লোক যেরূপ ভীরু ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, বাঙ্গালিরা সেরূপ হয় নাই। কোম্পানি বাহাদুর এক শত বৎসর পর্য্যন্ত নানা প্রকারে দেশের ধন শোষণ করিয়া অধিবাসীদিগকে যন্ত্রণার শেষ দিলেন, তখন পৃথিবী আর ভার সহ্য করিতে পারিলেন না, কোম্পানি বাহাদুরের ধ্বংস হইল, মহারাণীর স্বীয় হস্তে ভারতের ভাগ্য ন্যস্ত হইল। বাঙ্গালির শুষ্ক হৃদয়ে তখন বারি সঞ্চারিত হইল। নিরাশ বাঙ্গালির আশার অঙ্কুর হইল, আর মহারাণীর সুশাসনে সেই অঙ্কুরের ক্রমে সম্বর্দ্ধন হইতেছে, এই আশা, ইংরাজদিগের স্বেচ্ছাচারিতার বাধা পদে পদে জন্মাইতেছে। আধা ডিক্রি আধা ডিসমিসের সময় আর নাই, অনেক কাল গিয়াছে।

সূক্ষ্মদর্শী দেখিবেন যে, ইংরাজ ও বাঙ্গালিতে এই বিবাদ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইংরাজের ইচ্ছা বাঙ্গালিকে পদনত রাখা, বাঙ্গালির ইচ্ছা উঠিয়া দাঁড়ান। কাহার না ইচ্ছা করে অন্যকে পদনত করা, আর কাহার অন্যের পদনত থাকিতে ইচ্ছা করে ? চোখ রাকান, অন্তর টিপনি, উৎকোচ প্রভৃতির দ্বারা অগ্রে যেরূপ বাঙ্গালিদিগকে

অনায়াসে করায়ত্ত করা যাইত, এক্ষণে আর তাহা যায় না, কাযেই ইংরাজদিগের যথাসাধ্য বল প্রয়োগ করিতে হইতেছে। বাঙ্গালির মধ্যেও সহস্র এক্ষণে ন্যায্য দাবীর নিমিত্ত "মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন" পণ করিয়াছেন। এ সময়ে ইংরাজের দোষ দেই না, বাঙ্গালির দোষ দেই না। আমাদের কমিশনার চ্যাপমান সাহেব যদি প্রেসিডেন্সি ডিবিসনে বাঙ্গালিদিগকে কিছু স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় দেখেন, তিনি স্বচ্ছন্দে এই তেজঃ খর্ব্ব করার চেষ্টা করুন, ইহাতে তাঁহার জাতির স্বার্থ আছে, কিন্তু আবার বাঙ্গালি মহাশয়দের বলিবেন, তাহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে চ্যাপমান পারিবেন না, কারণ পরমেশ্বর আমাদের দিকে। তিনি দুর্ব্বলের দিকে থাকেন, তিনি উপায়হীন দাসের দিকে থাকেন, আর তাঁহার নিকট ইংরাজ, হিন্দু, সাদা, কালা, খ্রীষ্টিয়ান পৌত্তলিক সব সমান।

আমাদের লাইবেল মকর্দ্দমার এত গোল হইবার কারণ এই। যদি বাঙ্গালিরা একজন ইংরাজকে জব্দ করিতে পারে, তবে ইংরাজের "প্রেষ্টিজ" আর থাকিবে না, অতএব সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, এরূপ কথন করিতে দেওয়া হইবে না, এক্ষণে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের এই রাজনীতি। এরূপ বাঙ্গালিদিগের প্রশ্রয় দিলে, আমারদিগের বাঙ্গলা শাসনের অনেক বাধা জন্মিবে, অতএব একটি রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই একটু কুকর্ম্ম করায় দোষ নাই এইরূপ তর্ক করিয়া অনেক প্রকৃত সৎ ইংরাজও এইরূপ উদ্ধত বাঙ্গালিদিগকে খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত জুটবদ্ধ হয়েন। এরূপ রাজনীতি ভাল কি মন্দ, আমরা কিছু বলিব না, আমরা কেবল রোজ রোজ যাহা হইতেছে তাহাই লিখিতেছি।

রাইট সাহেবকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেক ইংরাজ দলবদ্ধ হয়েন। হাইকোর্টে এক্ষণে মকর্দ্দমার আপীল হইতেছে, সুতরাং

তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকুন, মকর্দ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেলেই, তাহাদের নাম ও ব্যবহার যে প্রকাশ করিলাম না, এ ত্রুটি সংশোধন করা যাইবে।...(৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৮)

আমাদের লাইবেল মকর্দ্দমা।—একটি অত্যাচার আর মহারাণীর ১০ সহস্র সৈন্য নষ্ট হওয়া, একটি অত্যাচার আর মহারাণীর ১০ সহস্র শত্রু বৃদ্ধি হওয়া সমান। একটি অত্যাচারে সহস্রং উপকার ধুইয়া যায়। একটি অত্যাচার হয় আর ব্রিটিশ রাজ্যের আয়ু শত বর্ষ কমিয়া যায়। কারণ কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিতে ও ক্রোধ ক্ষান্ত করিতে যত্ন করিতে হয়, একটি আস্তে আস্তে আইসে শীঘ্র যায়, আর একটি শীঘ্র আইসে আস্তে যায়।

সচরাচর অশুভ ঘটনার হেতু অপেক্ষা বক্তাই অধিক দোষী হইয়া থাকে, কিন্তু সেটি কি অন্যায় না? আমরা বলিলাম বলিয়া আমরা রাজবিদ্রোহী, না যাহারা করেন তাঁহারা রাজবিদ্রোহী। কাহারা মহারাণীর পরম শত্রু কাহারাই বা মিত্র? অপার বুদ্ধিকৌশলে, বিস্তর যত্নে ও শোণিত পতনে, জগদীশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে ইংরাজেরা ভারতাধিকার করিয়া তাঁহাদের আধিপত্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। মফঃসলস্থ হাকিমেরা একটি একটি অত্যাচার করেন, আর এই ভিত্তি-ভূমিতে কুঠার মারেন। এই কুঠারের শব্দ সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্ট শুনিতে পান না বাঙ্গালিরা অনেক সময় শুনিয়া থাকেন, আর উভয়ে কেহ শুনুন না শুনুন, নিসর্গ সমুদায় শুনিয়া থাকেন। সেখানে ইহার একটাও অশ্রুত থাকে না।

এ পত্রিকা সংক্রান্ত লাইবেল মকর্দ্দমায় যে কিরূপ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ অদ্য লিখিব। যৎকিঞ্চিৎ, বেশী নয়। এ পত্রিকায় [১৭শ সংখ্যা, ১২ জুন ১৮৬৮] একটি প্রস্তাব বাহির হয়

তাহার মর্ম্ম এই। "দুই বৎসর গত হইল কোন এক জন নিম্নশ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেট বল পূর্ব্বক একটি স্ত্রীলোককে আক্রমণ করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু গ্রামস্থ লোকেরা একজুঠ হইয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে দেয় নাই। এ কথাটি দেশময় রাষ্ট বলিয়া আমরা প্রকাশ করিলাম যদি গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করেন তবে আমরা কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারি" আমরা ঝকমারি করিয়া এই কয়েকটি কথা লিখি, এই আমাদের অপরাধ। কাহার নাম ধাম নির্দ্দেশ নাই, কোনরূপ রাগদ্বেষ প্রকাশ নাই। এক্ষণে আমরা সর্ব্বসাধারণ্যে জিজ্ঞাসা করি, গবর্ণমেণ্টকেও জিজ্ঞাসা করি, কমিশনর চ্যাপমান সাহেবকেও জিজ্ঞাসা করি যে, ঐ প্রস্তাবটি লেখা কর্ত্তব্য হইয়াছিল না অকর্ত্তব্য হইয়াছিল। যাহারা এরূপ দেশময় রাষ্ট কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করে তাহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে দণ্ড না পুরস্কার পাইবার যোগ্য? তার পরে। তখনকার মাজিষ্ট্রেট মনরো আমাদের কাছে একখানি পত্র লিখিয়া উহা এই বলিয়া শেষ করিলেন "আমি আপনাদের কাছে সাহায্য চাই, কারণ আমি ইহার শেষ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিব।" মনরো সাহেব এইরূপ পত্র লিখিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পত্র লিখিয়াই অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিলেন। এ কি কমিশনর চ্যাপমান সাহেবের আজ্ঞাক্রমে ক্ষান্ত দিলেন, কি কি কারণে ক্ষান্ত দিলেন তাহার বিন্দু বিসর্গও আমরা জানি না। কিছু অনুসন্ধান হইয়াছিল বটে কিন্তু সে সমুদায় কাগজপত্র যাহার বিরুদ্ধে সেই অনুসন্ধান হইতেছিল অর্থাৎ সেই রাইট সাহেবকেই দেওয়া হইল। দিয়া, অপবাদের মকর্দ্দমা করিতে বলা হইল।

মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে চ্যাপমান সাহেব পত্রচ্ছলে আসামীদিগের জানাইলেন যে, রাইট সাহেব দোষী কি নির্দ্দোষী এক্ষণে জানা যাইবে, রাইট সাহেব দোষী হয় আসামীরা প্রমাণ করিয়া দিউক। কথায় বলিবে যে পাত কাটিবে সে। গবর্ণমেণ্ট নিদ্রা গেলেন, আর হতভাগ্য

আসামীরা গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে গিয়া এই দায়ে ঠেকিয়া গেল ? তাহাই হউক। ন্যায্যই হউক অন্যায্যই হউক দেশ সমেত লোকের মনের বিশ্বাস যে এই মকর্দ্দমায় সাহেবেরা সব একদিকে। এরূপ বিশ্বাস না হইবেই বা কেন, ইহার মধ্যে আসামীদিগের উপর যত ঝঞ্ঝাট গিয়াছিল তাহাতে সেই বিশ্বাস লোকের মনে ক্রমেই দৃঢ় হইতে লাগিল। এমত অবস্থায় রাইট সাহেব দোষীই হউন আর নির্দ্দোষীই হউন, কোন বাঙ্গালীর সাহস হয় যে সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় ? বিশেষতঃ যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহারা সকলেই ঝিনেদহ সাবডিবিসন নিবাসী। যখন আসামীরা রাইট সাহেবের বদলির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিল তাহা অগ্রাহ্য হইল, ইহা পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিয়াছিল যে অন্ততঃ কিছু কাল ঝিনুদহ পরিত্যাগ করিয়া রাইট সাহেব সদর সবডিবিসনের কায কর্ম্ম করুন। না তাহা হইবে না, রাইট সাহেব সেখানেই থাকিবেন অথচ তোমরা প্রমাণ করিয়া দিবা। গবর্ণমেণ্টের এ আবদার কুলান আসামীদিগের সাধ্য কি ? আসামীরা ভাবিল যে আমরা অপরাধ করিয়াছি রাইট সাহেব এই বলিয়া আমাদের নামে নালিস করিয়াছেন, আমরা নির্দ্দোষী তাহাই প্রমাণ করিব, রাইট সাহেব দোষী নির্দ্দোষী তাহা প্রমাণ করিবার আমাদের প্রয়োজন কি ? ইহাই ভাবিয়া তাহারা সাক্ষী ডাকিল না। সুতরাং রাইট সাহেব দোষী কি নির্দ্দোষী আদৌ সে বিষয় অদ্যাপি প্রমাণ হয় নাই।···

আসামীদিগের সহস্র২ মুদ্রা ব্যয় হইল, অথচ রাইট সাহেবের ব্যয়ভার গবর্ণমেণ্ট লইলেন। রাইট সাহেবের সাক্ষীর পাথের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট ১০০০ টাকা দিলেন, আসামীদিগের সাক্ষীর ব্যয় আসামীদিগকে দিতে লফোর্ড জজ হুকুম দিলেন, আসামীরা ৮ মাস পর্য্যন্ত যাবদিক কষ্ট পাইয়া পরে দুই জনে ফাটকে গেল। রাইট সাহেব চাকুরী করিতে লাগিলেন, মকর্দ্দমা করিবার নিমিত্ত ছুটি পাইলেন, আর

মাজের থিকে ক্ষতি পূরণ বলিয়া সহস্র টাকা পাইবার হুকুম বাহির করিলেন। এক্ষণে রাইট সাহেব ঝিনেদহ হইতে বদলী হইয়া মেদিনীপুরে গিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট কি এ বিষয় অনুসন্ধান করিবেন? আসামীদিগের জন্যে, রাইট সাহেবের জন্যে, ও সমাজের জন্যে এটি করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত উচিত, কারণ আমরা দুঃখিত হইয়া ব্যক্ত করিতেছি যে এই মকর্দ্দমায় গবর্ণমেণ্টের ও ইংরাজদিগের সাধারণ্যে একটি ভয়ংকর অখ্যাতি হইয়াছে। এই অখ্যাতি এইরূপ একটি বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে যাইবে না। আর আমরা এই সময়ে সম্পাদকগণকে সানুনয়ে নিবেদিতেছি যে, তাঁহারা এই বিষয় লইয়া একটু আন্দোলন করুন। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক ও এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইলে এরূপ সমুদায় ঘটনা বাহির হইবে যে পৃথিবী সমেত লোক অবাক হইবেন। (২৯ জুলাই ১৮৬৯)

এই মানহানি-মামলার যিনি প্রধান উপলক্ষ্য, সেই শিশিরকুমারই শেষ পর্য্যন্ত বিচারে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। প্রবলপ্রতাপান্বিত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী সিভিলিয়ান-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি ব্যক্তিগত বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে এক দিকে যেমন নিঃসম্বল উৎপীড়িত দেশবাসীর মনে আশা ও সাহসের সঞ্চার করিয়াছিল, তেমনি আবার সুদূর মফস্বলের এক নগণ্য পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র খ্যাতি বহু দূর প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

শিশিরকুমার 'অমৃত বাজারে'র সেবায় কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিলেন, পত্রিকাখানিকে অধিকতর জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত রহিল না। দ্বিতীয় বর্ষে ইহা দ্বিভাষিক পত্রে

পরিণত হয় বলা চলে ; ১৮৬৯, ২৫এ ফেব্রুয়ারি হইতে পত্রিকায় কিছু কিছু ইংরেজী রচনাও স্থান পাইতে লাগিল। পত্রিকার আর একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল—উহা তাহার রস-রচনা। এগুলি সম্বন্ধে রসরাজ অমৃতলাল বসু নিজের স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> রস-সাহিত্য রচনার জন্ম আমি আর একজনের নিকট অত্যন্ত ঋণী। তিনি 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশির ঘোষ। কাশীতে যখন লোকনাথ বাবুর বাসায় ছিলাম, 'অমৃত বাজার পত্রিকা' পাঠ করিতাম। তখন কাগজখানি বাংলা ভাষায় পরিচালিত হইত ; যশোর হইতে নিয়মিতভাবে কাগজ বাহির হইত ; কলিকাতা সহরে তখনও বড় একটা জাহির হয় নাই। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ 'বিবিধ' নামে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। তেমন সরস Comic titbits আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। পঞ্চানন্দের প্রথম আমলে অনেকটা ইন্দ্রনাথে সেই খাঁটি রস উপভোগ করা যাইত। আমি পত্রিকার সেই অংশটার রসপ্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ২য় পর্য্যায়)

১৮৭০-৭১ সনে শিশিরকুমারের জন্মপল্লীতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইল, জ্বরের প্রকোপে ঘরে ঘরে গ্রামের লোকেরা শয্যাশায়ী হইল। তাহার উপর ১৮৭১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ঘোর জলপ্লাবন দেখা দিল। "অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও বলিতেছেন যে, তাঁহারা এরূপ জলোচ্ছ্বাস কখন দেখেন নাই।" রাস্তাঘাটে লোকচলাচল বন্ধ। এদিকে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'ও বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। এই সকল নৈসর্গিক উৎপাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া—পত্রিকার উন্নতির জন্যও বটে, শিশিরকুমার সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। জন্মপল্লী অমৃত বাজার হইতে পত্রিকার শেষ সংখ্যার প্রকাশকাল—৪ অক্টোবর ১৮৭১।

ইহার প্রায় আড়াই মাস পরে ২১এ ডিসেম্বর বউবাজার ৫২ নং হিদেরাম ব্যানার্জ্জীর লেন হইতে পত্রিকা পুনঃপ্রচারিত হয়। এই সংখ্যায় শিশিরকুমার লিখিলেন :—

> এই অবধি অমৃত বাজার পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইবে। আমাদের বরাবর সাধ ছিল পত্রিকাখানির ক্রমে ক্রমে উন্নতি করি। কিন্তু মফস্বলে থাকিয়া সে সাধ মিটাইবার বড় উপায় ছিল না। আবার কয়েকটি মমতার নিমিত্তেও অমৃত বাজার পরিত্যাগ করিতে পারিতাম না। অমৃত বাজার কপোতাক্ষী নদীর ধারে। কপোতাক্ষী নদীর অতি পরিষ্কার জল, আমরা সেই নদীতে মৎস্য ধরিতাম। আমাদের ওখানে কুম্ভীরের ভয় নাই, সুতরাং গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে মনের সাধে সন্তরণ দিতাম। কখন কখন শতাবধি লোক একত্রিত হইয়া সজারু ও খরগোশ শিকার করিতে যাইতাম। সেখানে গাছের ফল পাড়িয়া ভক্ষণ, গাভী দোহন করিয়া দুগ্ধ পান করিয়াছি। এই সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে পারিতাম না, মনে বড় কষ্ট হইত। কলিকাতায় বেড়াইতে আইলে যমযন্ত্রণা হইত আর যে পর্য্যন্ত পল্লিগ্রামের পরিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে না পারিতাম সে পর্য্যন্ত স্থির হইতে পারিতাম না। এখন কি না সেই কলিকাতায় বাস করিতে হইল ? যশোহর যে পরিত্যাগ করিব ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, সেই যশোহর কোথা আর আমরা কোথা !··· ···আমাদের গ্রাহকবর্গকে একটি নিগূঢ় কথা বলি। অমৃত বাজার পত্রিকার জন্তে পূর্ব্বে আমরা যত কষ্টই পাই, কি অর্থব্যয়ই করি এখন উহা কর্ত্তৃক আমরা অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ উপকৃত হইতেছিলাম। এইরূপ একটি লাভের ব্যবসায় লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্থানান্তরিত করে না। পত্রিকাখানি ভাল করিব এই আমাদের সাধ আর ইহারই নিমিত্ত আমরা আপাতত অর্থ সম্বন্ধে অনেক ক্ষতি দিলাম। যাঁহারা ভাবিলেন যে অমৃত বাজার

পত্রিকা সহরে স্থানান্তরিত হওয়াতে উহার ভাব পরিবর্ত্তিত হইবে তাঁহাদিগকে একটি কথা। যে লেখকেরা পূর্ব্বে অমৃত বাজার পত্রিকা চালাইত তাহাদের হস্তেই পত্রিকা রহিয়াছে। তাহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তবে আমরা কিছু বিপদে পড়িয়াছি। আমাদের ব্যয় শতগুণে বাড়িয়াছে। সাধারণে একটু অনুগ্রহ করেন, কলিকাতার লোকে একটু কৃপাদৃষ্টি করেন কাগজ চলিবে, নতুবা অমৃত বাজার পত্রিকার মৃত্যু হইবে।

ঘটনাচক্রে জন্মপল্লী পরিত্যাগ করিয়া মহানগরীতে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া আসিতে বাধ্য হওয়ায় শিশিরকুমার অন্তরে যে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত রচনাংশের মধ্যে তাহা বড় মর্ম্মস্পর্শীভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের প্রতি যে তাঁহার কি অপরিসীম দরদ ছিল, রচনাটি অনুধাবন করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

কলিকাতায় আসিয়া শিশিরকুমার স্বীয় অমায়িক ব্যবহারগুণে এবং কৃতিত্বের দ্বারা অচিরাৎ সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া উঠিলেন। এখন হইতে সমাজ ও দেশহিতকর বিভিন্ন প্রচেষ্টার সহিত সাক্ষাৎভাবে যোগ স্থাপন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল। পত্রিকাতে এ সকলের বিবরণ ছাড়া আর একটি অভিনবত্বের আমদানি করা হইল। ১৮৭২, ২৮এ ফেব্রুয়ারি হইতে পত্রিকায় মাঝে মাঝে ব্যঙ্গচিত্র স্থান পাইতে লাগিল; প্রথম যে ব্যঙ্গচিত্রটি প্রকাশিত হয় তাঁহার বিষয়—"মিউনিসিপাল সভা! গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীদিগকে মিউনিসিপাল সভা দ্বারা রাজ্যশাসন শিখাইতেছেন!" বাংলা সংবাদপত্রে ব্যঙ্গচিত্রের প্রবর্ত্তন বোধ হয় ইহাই প্রথম। ১৮৭৪, ৩রা ডিসেম্বর হইতে পত্রিকার একখানি "অতিরিক্ত" ক্রোড়পত্র প্রকাশেরও ব্যবস্থা হইল; এ সম্বন্ধে শিশিরকুমার লিখিলেন:—

...অনেকের ইচ্ছা করে যে, ভারতবর্ষের সমুদয় কাগজগুলি পড়েন, কিন্তু অর্থ কি সময় অভাবে তাঁহারা সে আশা পূর্ণ করিতে পারেন না। আমরা অতিরিক্তের দ্বারা সেই আশা পূর্ণ করিব আশা করিতেছি। অমৃত বাজারের অতিরিক্ত এক খণ্ড পাঠ করিলে সকলেই ভারতবর্ষের কোন্ সম্পাদক কোন্ উৎকৃষ্ট প্রস্তাবটি লিখিয়াছেন অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।...

আমরা আর একটি কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতেছি। আমরা অদ্য হইতে ভারতবর্ষের যত দেশীয় সম্বাদপত্র আছে তাহার সারাংশ ইংরাজিতে কতক উদ্ধৃত এবং কতক অনুবাদ করিয়া ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের নিকট বিতরণ করিব। আমাদের অভাব, মনোবেদনা, কষ্ট এইরূপ প্রতি সপ্তাহে আমরা ইংলণ্ডবাসীদিগকে জ্ঞাত করিব। শুনিয়াছি ইংলণ্ডবাসীগণ অতি মহৎ। কেশব বাবু যখন আমাদের কথঞ্চিৎ দুরবস্থার কথা সেখানে বলেন, তখন তাহারা না কি অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে তাহা শুনেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত যুবারাও বলেন যে তাহাদের প্রতি বিলাতের ইংরাজেরা অত্যন্ত সমাদর করিয়া থাকেন। আমরা এবার তাঁহাদের,নিকট রোদন করিব। ভারতবর্ষে বিস্তর রোদন করা গেল, তাই এখন ইংলণ্ডে রোদনে কি ফল দর্শায়।

এমনি ভাবে বিবিধ বৈচিত্র্যের অবতারণায় 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এদেশীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পত্রিকা নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিল।

বউবাজারের আবাসে প্রায় তিন বৎসর অবস্থানের পর ১৮৭৪, ২রা এপ্রিল পত্রিকা ২ নং আনন্দমোহন চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, বাগবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

১৮৭৮, ২১এ মার্চ হইতে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' পুরাদস্তুর ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত হয় এবং বাংলা অংশের অভাব পূরণের জন্য পরবর্ত্তী

এপ্রিল হইতে 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক প্রচারের ব্যবস্থা হয়। এরূপ করিবার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির সমালোচনায় ক্ষিপ্ত হইয়া, সেগুলির স্বাধীনতা সঙ্কোচ মানসে, ১৪ মার্চ ১৮৭৮ তারিখে বড়লাট লর্ড লিটন এক দিনেই ভার্ণাক্যুলর প্রেস অ্যাক্ট বা দেশীয় সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন পাস করেন। প্রকৃতপক্ষে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'কে জব্দ করাই রাজ-পুরুষদের লক্ষ্য ছিল। এই আইনের নাগপাশে প'ড়িলে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র পক্ষে স্বাধীনভাবে পত্রিকা পরিচালন করা অসম্ভব হইত। কর্ম্মবীর শিশিরকুমার আসন্ন বিপদ হইতে 'পত্রিকা'কে রক্ষা করিবার জন্য, নূতন আইন-জারির সপ্তাহ কালের মধ্যেই উহাকে রূপান্তরিত করিয়া সরকারী চা'ল ব্যাহত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে, সম্মতি-আইনের (Age of Consent Bill) বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের জন্য একখানি ইংরেজী দৈনিকের অভাব অনুভূত হওয়ায়, ১৮৯১ সনের ১৯এ ফেব্রুয়ারি হইতে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু শিশিরকুমার তখন পত্রিকা-সম্পাদক ছিলেন না; বৎসর-চারেক পূর্ব্বে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পত্রিকা-সম্পাদন-ভার অনুজ মতিলালের সক্ষম হস্তে অর্পণ করিয়া অবসর লইয়াছিলেন। তবে বলাই বাহুল্য, নামে সম্পাদক না থাকিলেও তিনি সর্ব্বদাই পত্রিকার কল্যাণকামী ছিলেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলেই স্বীয় রচনা দানে সাহায্য করিতে বিরত হইতেন না। 'পত্রিকা'র পরবর্ত্তী ইতিহাস আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

শিশিরকুমার-সম্পাদিত 'অমৃত বাজার পত্রিকা' শিক্ষিত-মহলে স্বদেশভক্তির প্রেরণা সঞ্চারে যে কিরূপ সহায়ক হইয়াছিল, তাহা

বলিয়া শেষ করা যায় না। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন এ সম্পর্কে লিখিয়া গিয়াছেন :—

শিশির তখন মাতৃভূমির দুঃখের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিতেন, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইতেন।...যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও 'পলাশির যুদ্ধে' স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক।

রাজনীতিক্ষেত্রে

জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষসাধনে শিশিরকুমারের বিবিধ প্রচেষ্টা সবিস্তারে বর্ণনা করা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তবে একটির কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। তখনকার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ছিল জমিদারদের সভা, কিন্তু দেশের প্রকৃত শক্তিস্বরূপ সাধারণ জনগণের কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তখন বিদ্যমান ছিল না। শিশিরকুমারই এই অভাব পূরণে প্রথমে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে ১৮৭৫, ২৫এ সেপ্টেম্বর 'ইণ্ডিয়ান লীগ' জন্মগ্রহণ করে। ইহার উদ্দেশ্যগুলি এইরূপ ছিল :—

১। কি করিলে সর্ব্বসাধারণের রাজকীয় ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সকলের মত সংগ্রহ ও প্রচার করণ।

২। সাধারণের ইষ্টসাধন ও তাহাদের যাহাতে রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মে তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ ও তৎসমুদায় প্রতিষ্ঠা করণ।

৩। বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত ন্যায়সঙ্গত উপায় নির্দ্ধারিত ও তৎসমুদায় অবলম্বন করণ।

৪। সর্ব্বসাধারণের মনে যাহাতে একজাতিত্ব ভাবের উদয় হয়, তন্নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করণ।

৫। দেশের অর্থোৎপাদিকা শক্তি যাহাতে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করে, তাহার উপায় অবলম্বন করণ। (১৮৭৫, ১৫ই আগস্টের 'সাধারণী'তে উদ্ধৃত)

লীগ হইয়া অনেক বাদবিসম্বাদ ও সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার দ্বারা অনেক সৎকর্ম্মও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতায় 'এলবার্ট টেম্পল্ অব সায়েন্স' নামক শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তন লীগেরই কীর্ত্তি। ১৮৭৬, ২১এ সেপ্টেম্বর 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখেন :—

...গত বৎসর ইণ্ডিয়ান লীগের সংস্থাপনে বঙ্গদেশে আবার রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এদেশে যে সমুদয় রাজনৈতিক আন্দোলন হইয়াছে তাহার কোন একটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।...কিন্তু লীগ কোন বিশেষ আন্দোলনের নিমিত্ত স্থাপিত হয় না। এদেশবাসীদিগের হৃদয়ে রাজনৈতিক উন্নতির স্পৃহা উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত লীগ অনুষ্ঠিত হয় এবং এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় লীগের আশা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে। লীগ এক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি প্রধান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহার যত্নে কলিকাতার মিউনিসিপাল ইলেকশন কার্য্যটি সমাধা হইয়াছে। আর কয়েকটি কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত লীগের সভ্যেরা এখন উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু লীগের দ্বারা আরও কয়েকটি উপকার হইয়াছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশন ক্রমে নির্জ্জীব হইয়াছে।...লীগ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশনকে এই নির্জ্জীব অবস্থা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে

জাগরিত করিয়াছেন। যদিও কলিকাতার ইলেকটীব প্রথা লইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশন পরাস্ত হন, যদিও এই সদনুষ্ঠানের প্রতি বাধা দিয়া তাহারাও স্বার্থপরতার পরিচয় প্রদান করেন তথাচ ইহার নিমিত্ত তাঁহারা এরূপ উদ্যোগ ও পরিশ্রম করেন যে অনেকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন।...ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের বিজ্ঞান সভা যে এত শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইল তাহারও মূল লীগ। লীগের অনুষ্ঠিত কলেজ দ্বারা মহেন্দ্র বাবু বিশেষ উদ্যোগী হন। মহেন্দ্র বাবু বিজ্ঞান সভার নিমিত্ত গত ছয় বৎসর অবধি ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ইহার নিমিত্ত যে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, আপনার অনেক সুখস্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করিলে মহা পাপ হইবে। তবে লীগের কলেজের অনুষ্ঠান না হইলে এত শীঘ্র তাহার সভা প্রতিষ্ঠিত বোধ হয় হইত না। এতদ্ভিন্ন লীগ কর্ত্তৃক এদেশের মধ্যে যে রাজনীতি সম্বন্ধীয় একটি ঘোর আন্দোলন হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রতি কলিকাতায় যে ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশন হইয়াছে এ লীগের ছায়া। এটি লীগের অবিকল নকল। যদি লীগের সভ্যদিগের মধ্যে পরস্পর মনোবাদ না হইত তাহা হইলে বোধ হয় ইহার সৃষ্টি হইত না। যদি ইণ্ডিয়াম য়্যাসোশিয়েশনের উদ্দেশ্য দেশের মঙ্গল করা হয় তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে কালে লীগ একত্রিত হইবেন। যদি লীগকে অপদস্থ করার নিমিত্ত তাহারা এই অনুষ্ঠানটি করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।...লীগে শুদ্ধ এদেশীয়দিগের মধ্যে এই আন্দোলন উত্থিত করে নাই, এদেশীয় ফিরিঙ্গিদিগের মধ্যে এইরূপ অনুষ্ঠান হইতেছে।

এ দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে শিশিরকুমারের দান অপরিসীম। কোন কোন রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহাকে অগ্রণী বলা যাইতে পারে; ভারতবাসীকে নিজেদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের কথা প্রথম তিনিই স্মরণ করাইয়া দেন, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাসমূহকে একটা সর্ব্বভারতীয়

৩। বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত ন্যায়সঙ্গত উপায় নির্দ্ধারিত ও তৎসমুদায় অবলম্বন করণ।

৪। সর্ব্বসাধারণের মনে যাহাতে একজাতিত্ব ভাবের উদয় হয়, তন্নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করণ।

৫। দেশের অর্থোৎপাদিকা শক্তি যাহাতে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করে, তাহার উপায় অবলম্বন করণ। (১৮৭৫, ১৫ই আগস্টের 'সাধারণী'তে উদ্ধৃত)

লীগ হইয়া অনেক বাদবিসম্বাদ ও সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার দ্বারা অনেক সৎকর্ম্মও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতায় 'এলবার্ট টেম্পল্ অব সায়েন্স' নামক শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তন লীগেরই কীর্ত্তি। ১৮৭৬, ২১এ সেপ্টেম্বর 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখেন :—

...গত বৎসর ইণ্ডিয়ান লীগের সংস্থাপনে বঙ্গদেশে আবার রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এদেশে যে সমুদয় রাজনৈতিক আন্দোলন হইয়াছে তাহার কোন একটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।...কিন্তু লীগ কোন বিশেষ আন্দোলনের নিমিত্ত স্থাপিত হয় না। এদেশবাসীদিগের হৃদয়ে রাজনৈতিক উন্নতির স্পৃহা উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত লীগ অনুষ্ঠিত হয় এবং এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় লীগের আশা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে। লীগ এক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি প্রধান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহার যত্নে কলিকাতার মিউনিসিপাল ইলেকশন কার্য্যটি সমাধা হইয়াছে। আর কয়েকটি কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত লীগের সভ্যেরা এখন উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু লীগের দ্বারা আরও কয়েকটি উপকার হইয়াছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশন ক্রমে নির্জীব হইয়াছে।...লীগ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশনকে এই নির্জীব অবস্থা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে

জাগরিত করিয়াছেন। যদিও কলিকাতার ইলেকটীব প্রথা লইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশন পরাস্ত হন, যদিও এই সদনুষ্ঠানের প্রতি বাধা দিয়া তাহারাও স্বার্থপরতার পরিচয় প্রদান করেন তথাচ ইহার নিমিত্ত তাঁহারা এরূপ উদ্যোগ ও পরিশ্রম করেন যে অনেকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন।...ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের বিজ্ঞান সভা যে এত শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইল তাহারও মূল লীগ। লীগের অনুষ্ঠিত কলেজ দ্বারা মহেন্দ্র বাবু বিশেষ উদ্যোগী হন। মহেন্দ্র বাবু বিজ্ঞান সভার নিমিত্ত গত ছয় বৎসর অবধি ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ইহার নিমিত্ত যে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, আপনার অনেক সুখস্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করিলে মহা পাপ হইবে। তবে লীগের কলেজের অনুষ্ঠান না হইলে এত শীঘ্র তাহার সভা প্রতিষ্ঠিত বোধ হয় হইত না। এতদ্ভিন্ন লীগ কর্তৃক এদেশের মধ্যে যে রাজনীতি সম্বন্ধীয় একটি ঘোর আন্দোলন হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রতি কলিকাতায় যে ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশন হইয়াছে এ লীগের ছায়া। এটি লীগের অবিকল নকল। যদি লীগের সভ্যদিগের মধ্যে পরস্পর মনোবাদ না হইত তাহা হইলে বোধ হয় ইহার সৃষ্টি হইত না। যদি ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশনের উদ্দেশ্য দেশের মঙ্গল করা হয় তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে কালে লীগ একত্রিত হইবেন। যদি লীগকে অপদস্থ করার নিমিত্ত তাহারা এই অনুষ্ঠানটি করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।...লীগে শুদ্ধ এদেশীয়দিগের মধ্যে এই আন্দোলন উত্থিত করে নাই, এদেশীয় ফিরিঙ্গিদিগের মধ্যে এইরূপ অনুষ্ঠান হইতেছে।

এ দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে শিশিরকুমারের দান অপরিসীম। কোন কোন রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহাকে অগ্রণী বলা যাইতে পারে; ভারতবাসীকে নিজেদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের কথা প্রথম তিনিই স্মরণ করাইয়া দেন, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাসমূহকে একটা সর্ব্বভারতীয়

দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিচার তিনিই সর্ব্বপ্রথম করেন। তাঁহার অনুজ মতিলাল যথার্থই লিখিয়াছেন :—

সেজদাদার পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রধান প্রধান ভারতবাসী রাজনৈতিক চর্চ্চা করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু একটি বিষয় তাঁহারা অজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহাদের মনে এই দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ইংরেজদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সহিত একযোগে ও তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ রাজনৈতিক আলোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইহার ফলে যখন ভারতবাসিগণ ইংরাজভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, সেই সময় সেজদাদা এই সত্য প্রচার করিলেন যে "We are we and they are they" অর্থাৎ ভারতবাসিগণ ইংরাজ নহে, ভারতবাসিগণ ইংরাজ হইতে স্বতন্ত্র এবং সেই ভাবেই আমাদের মাতৃভূমির সেবা করিতে হইবে। এই ভাবটি সেজদাদাই প্রথমে তাঁহার স্বদেশবাসিগণের হৃদয়ে পরিস্ফুট করিয়া দেন। আর একটি বিষয়ও তিনি নিজে আচরিয়া তাহাদের শিক্ষা দেন, সেটি এই ;—উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা কহিবার সময় রাজকর্ম্মচারিগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিতে হইবে।

আর একটি কার্য্যও সেজদাদার দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের স্বার্থ যে একই সূত্রে জড়িত, এ কথা তিনি সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্য তিনি বাঙ্গালী হইয়াও গাইকোয়ারের রাজ্যচ্যুতির ব্যাপার লইয়া অমৃত বাজার পত্রিকায় তীব্র আন্দোলন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে রাজনীতির আন্দোলন চলিতেছে, তাহা সেজদাদারই নির্দ্দিষ্ট। আমাদের জাতীয় মহাসমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠায় দেশের অনেকেই সহায়তা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই মহাসমিতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে

যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা সেজদাদাই মিষ্টার হিউমকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। (ভূমিকা : 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ,' ১৩২৭।)

সমাজ-সংস্কার ক্ষেত্রে

সমাজ-সংস্কার কার্য্যেও শিশিরকুমারের উদ্যম স্মরণীয়। তিনি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বিধবা-বিবাহের ফল যে কল্যাণকর হইবে, এই ধারণা তিনি পোষণ করিতেন। তিনি স্বীয় পত্রিকায় লেখেন :—

বিধবা বিবাহ—আমাদের স্বদেশীয়গণকে আমরা গুটি কয়েক কথা বলিব। আমরা খ্রীষ্টিয়ান কি ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহারদিগকে বলিতেছি না। আমরা বাঙ্গালি, গার্হস্থ্য সুখানুরত বাঙ্গালি, ও শুদ্ধ এই পরিচয় দিয়া বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা বলিতেছি। তাঁহাদের মনে ধরে গ্রহণ করিবেন, না হয় করিবেন না।

বিধবা বিবাহ নূতন কথা নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তর কথা বার্ত্তা তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আইন প্রচলিত হইয়াছে, ও অনেকে বিধবা বিবাহও করিয়াছেন কিন্তু আমাদের দেশে যত জন বিধবা অদ্যাপি বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে তাহা ধরিতে গেলে কয়েকটি বিধবা আশ্রয় পাইয়াছে। মোটে না বলিলেও হয়। তবে আশার মধ্যে আমাদের এই আছে যে, বিধবা বিবাহের প্রকৃত বিরোধী কেহ নাই। মুখে যিনি যাহা বলুন, মনোগত প্রায় তাবতের ইচ্ছা ইহা প্রচলিত হয়।

বিধবা বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র সিদ্ধ, ব্যবহার বিরুদ্ধ। ব্যবহার চিরকাল একরূপ থাকে না, সমুদায়ই ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতেছে।

স্ত্রীলোকদিগকে লেখা পড়া শিখান পূর্ব্বে কোন কালে ছিল, কিন্তু এক্ষণে ভদ্রলোক মাত্রই বালিকাদিগকে লেখা পড়া শিখাইয়া থাকেন। এই রূপেও বিধবা বিবাহ ক্রমে হিন্দু সমাজে প্রকাশ করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা এই আশার উপর নির্ভর করিয়া এক্ষণে ক্ষান্ত থাকিতে পারি, কিন্তু উপস্থিত বিধবাগণের উপায় কি? সেই বিধবাগণের ভ্রাতা ভগ্নিগণের যে বিলম্ব সহ্য হয় না?

বিধবা বিবাহ করিলে জাতি কেন যায়, বুঝিতে পারি না। আমরা, এক জাতির অন্য জাতির সহিত বিবাহ হউক এ কথা বলি না। ঠিক এক্ষণে যেরূপ গোত্র কুল দেখা হইয়া থাকে সেইরূপ হউক, কেবল পাত্রীটি বিধবা হইবে। ব্রাহ্মণ কন্যার হাতে ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ কন্যার হাতে কায়স্থ অন্ন খাইবে ইহাতে কেন জাতি যাইবে? বেশ্যা গমনে, উপপত্নী রাখিলে, ব্যভিচারে আমাদের দেশে জাতি যায় না, ইহাতে জাতি গেলে কয়টি লোকের জাতি আছে? যে বিধবা বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহারা ব্রহ্মচর্য্য করুক। কিন্তু যাহারা দায় পড়িয়া ব্রহ্মচর্য্য করে, কি কুকর্ম্মে রত হইবার উদ্যোগী, তাহারদিগকে ধরিয়া বান্ধিয়া ব্রহ্মচর্য্য করার কি ফল? যখন বিধবারা সহমৃতা যাইত, তখন ছিল ভাল, কারণ ব্রহ্মচর্য্য করাপেক্ষা সহমরণ যাওয়া অনেক গুণে ভাল। এক্ষণে উহা উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই এ দেশীয় বিধবারা নিরুপায়ে পড়িয়াছে। যে দেশীয় স্ত্রীলোকে স্বামীর চিতার উপর আনন্দ সহকারে ও অবলীলাক্রমে ঝম্প প্রদান করিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিতে অপারগ হইয়াছে। এই সহস্র২ বিধবা নারীর দুঃখ দেখিয়া দেখিয়া এদেশীয়গণের বুক পাষাণ হইয়া গিয়াছে। আর তাঁহাদের এক্ষণে তত দুঃখ বোধ হয় না। কিন্তু তাঁহাদের বুক পাষাণ হইয়াছে বলিয়া, বিধবাদিগের দুঃখ কমে নাই। তাহাদের সেই আর্ত্তনাদ বরাবর সমান রহিয়াছে। লোকে টের পায় না, কিন্তু দুঃখানলে দগ্ধ

হইয়া তাহাদের হৃদয় অঙ্গার হইয়া যাইতেছে। তাহাদের চোখের জল তাহারা চোখে নিবারণ করে বলিয়া রক্ষা, নতুবা তাহারা যদি মনের দুঃখ বলিতে জানিত, তবে কত কঠিন পাষাণ গলিয়া যাইত।

আমাদের দেশে যতটি প্রকাশ্য বেশ্যা আছে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন বিধবা, বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বেশ্যা হইয়াছে। গ্রাম মাত্রেই কিছু কিছু কুকাণ্ড আছে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে কুকাণ্ডের হেতু বিধবারা। বৎসর বৎসর লাম্পট্য দোষের নিমিত্ত যতটি খুন হয় এত আর কিছুতেই নয়, কিন্তু লাম্পট্য দোষ এত প্রচলিত হইবার প্রধান কারণ বিধবাদিগের বিবাহ না দেওয়া। কত শত প্রধান লোকে ঘরের মধ্যে কত কুকাণ্ড দেখিতে বাধ্য হইতেছেন, কত প্রধান লোকের কন্যা, ভগ্নি প্রভৃতি বৈধব্য যন্ত্রণার নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হওয়াতে তাহাদের বুকে বিষাক্ত শেল বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কত প্রধান লোকে বাধ্য হইয়া আপনার কন্যা, কি ভগ্নির উপপতি আপনি যোগাইতেছেন—তবু সমাজের ভয়ে বিধবা বিবাহ দিতে পারেন না। শত শত ভ্রূণহত্যায় দেশ কলংকিত হইতেছে ও সেই ভ্রূণহত্যার সহকারিতা কত ভদ্রলোকের করিতে হইতেছে। এ সমুদায় কি মিথ্যা কথা, কবির বর্ণন? এরূপ চোখের উপর আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি না?…
(১১ মার্চ ১৮৬৯)

জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপনে সহযোগিতা

জাতীয়তার উন্মেষসাধনে বঙ্গীয় নাট্যশালার সহায়তা যে অপরিহার্য্য, এ কথা শিশিরকুমারের অবিদিত ছিল না। তাই আমরা তাঁহাকে এই সমাজ-কল্যাণকর কার্য্যেও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট দেখি।

পূর্ব্বে নাট্যাভিনয় ধনীর গৃহেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। উত্তর-কলিকাতার কয়েক জন উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দ্বারা কলিকাতায় প্রথম সাধারণ-রঙ্গালয়—'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র দ্বারোদ্ঘাটন হয় (৭ ডিসেম্বর ১৮৭২)। এই সহায়সম্বলহীন যুবকদলকে শিশিরকুমার ও হেমন্তকুমার উভয়েই নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। নবজাত রঙ্গালয়টির উন্নতি ও স্থায়িত্ব বিধান কল্পে শিশিরকুমার স্বীয় পত্রিকায় কেবলমাত্র উৎসাহ-বাণী প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অভিনয়ের জন্য 'নয়শো রুপেয়া' ও 'বাজারের লড়াই' নামে দুইখানি প্রহসনও রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমখানি ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ ও দ্বিতীয়খানি ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ তারিখে সমারোহের সহিত ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। শিশিরকুমার এই রঙ্গালয়ের একজন ডিরেক্টরও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩)।*

বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগ

রাজনীতিক্ষেত্রের ন্যায় ধর্ম্মনীতিক্ষেত্রেও শিশিরকুমারের প্রতিষ্ঠা সুবিদিত। সাংবাদিকের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করেন। শিশিরকুমার প্রথম জীবনে একজন প্রগতিশীল ব্রাহ্ম ছিলেন; কলিকাতায় আসিলে উপাসনাতেও যোগ দিতেন। ১৮৬৯ সনে নরপূজার ঘটা দেখিয়া তিনি ও হেমন্তকুমার বিরক্তিভরে ব্রাহ্ম-

* 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে (৩য় সং. পৃ. ১১৩-১৪, ১২১) বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সমাজের সংসর্গ ত্যাগ করেন।* এই সময় শিশিরকুমারের হৃদয়ে ধর্ম্মজীবনের জন্য একটি প্রগাঢ় ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল, কিন্তু একটা স্থায়ী আশ্রয় না পাইয়া তিনি যেন চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিলেন। ১৮৭৯ সনে মাদাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল ওলকট্ থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্র স্থাপনে বোম্বাই আগমন করিলে শিশিরকুমার দিনকতক থিয়সফি বা ব্রহ্মবিদ্যাতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।† কিন্তু এ

* "ক্রমে কেশব বাবুর দলের লোকদিগের যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক হইয়া পড়ে।...খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মভাব যে অনুতাপ ও প্রার্থনা, তাহা উন্নতিশীল দলকে প্রবলরূপে অধিকার করে।... ১৮৬৮ সালে নরপূজার হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। এই পাপবোধ ও ব্যাকুলতার ভাব হইতেই ব্রাহ্মেরা কেশব বাবুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতেন।...ব্রাহ্মদের মধ্যে এক দল লোক বলিতে লাগিলেন, 'এত অনুতাপ ও ক্রন্দন কেন? প্রেমময়ের গৃহে এত ক্রন্দনের রোল কেন? আনন্দময়ের মুখ দেখিয়া আনন্দিত হও।' এই দলকে ব্রাহ্মেরা তখন 'আনন্দবাদী দল' বলিতেন। শিশির বাবু ইঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। নরপূজার হাঙ্গামা দেখিয়া ইঁহারা আমাদের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িলেন। ১৮৬৯ সালের মাঘোৎসবে এক জন মুঙ্গের হইতে সমাগত ব্রাহ্ম উপাসনান্তে কেশব বাবুর চরণ ধরিয়া কি প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিশির বাবুর দাদা হেমন্তবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া, এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া, রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।...ইহার পরে অমৃতবাজারের দলকে আর আমাদের উপাসনাতে বড় আসিতে দেখিতাম না। কলিকাতা পটলডাঙ্গা, পটুয়াটোলা লেনে যশোরের লোকদের এক বাসা ছিল। শিশির বাবু সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি আসিলেই আনন্দবাদী দলের সমাগম হইত। তাঁহারা আমাকে ডাকিতেন। সে সময়ে প্রধানতঃ সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইত।" (শিবনাথ শাস্ত্রী: 'আত্মচরিত,' পৃ. ১৬৬-৬৮)

† শিশিরকুমার আজীবন পরলোকতত্ত্বের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৬ সনে (ভাদ্র ১২৭৩) অনুজ হীরালালের উদ্বন্ধনে অকাল মৃত্যু হয়; ভ্রাতৃবিয়োগবিধুর শিশিরকুমার সেই হইতেই পরলোকতত্ত্ব অনুশীলনে প্রণোদিত হন। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সূচনা হইতে তিনি পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনামূলক প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। পরলোকতত্ত্ব প্রচারের জন্য তিনি শেষ জীবনে *Hindu Spiritual Magazine* নামে

সকলে তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই; শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি পরম শান্তি লাভ করেন। এই রূপান্তরের মূলে ছিল তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমারের প্রভাব। তিনিই "রাজনীতি চর্চ্চায় বিব্রত" শুষ্ক কঠিন জ্ঞানমার্গী শিশিরকুমারকে ভক্তিপথের পথিক, শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্তে পরিণত করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার নিজেই ১২৯৯ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'য় লিখিয়া গিয়াছেন :—

কয়েক বৎসর গত হইল, আমরা দুই ভাই একটি শোক পাইয়া ব্যথিত হই। তখন আমরা ভাবিলাম যে যখন সকলকেই মরিতে হইবে, তখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কি করিব, কোথায় যাইব? মরিবার জন্য প্রস্তুত কিরূপে হইতে হয়? ইহা লইয়া দুই ভাই চিন্তা ও বিচার করিতে লাগিলাম।

পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে মুক্ত হইবার দুইটি পথ আছে। এক জ্ঞান-পথ, আর এক ভক্তি-পথ। কিন্তু ইহার কোন্‌টি ভাল? কোন্ পথে আমরা যাইব? তখন এ সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া দুই ভাই দুইটি পথ ভাগ করিয়া লইলাম। মেজদাদা লইলেন ভক্তি-পথ, আমি লইলাম জ্ঞান-পথ। এরূপ ভাগে আমরা কেহই অসন্তুষ্ট হইলাম না। কারণ আমার মেজদাদা মধুর প্রকৃতি, ভক্তিময় ও সর্ব্বজীবে দয়ালু; আর আমি জ্ঞানাভিমানী, তেজীয়ান্, ভক্তিহীন ও হৃদয়শূন্য।

মেজদাদার আমার অপেক্ষা অনেক সুবিধা ছিল। কারণ ভক্তিপথ শ্রীনবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

একখানি মাসিকপত্রও প্রকাশ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ১৯০৭, ১১ই ফেব্রুয়ারি 'কলিকাতা সাইকিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ও জে. জি. মিউজেন এই সমিতির সহকারী সভাপতি ছিলেন।

সে পথ দিয়া অন্ধ লোকেও যাইতে পারে। অতএব তিনি শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়িলাম। জ্ঞান-পথের গুরু কোথায়?

অগ্রে আমার কথা কিছু বলিয়া লই। আমি যখন ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান-পথের অনুসন্ধান করিতেছি, তখন শুনিলাম বোম্বাই নগরে আমেরিকা দেশ হইতে ব্ল্যাভাটস্কী নাম্নী একটি মেম ও অলকট নামক একটি সাহেব আসিয়াছেন, ইঁহারা পরম যোগী সিদ্ধপুরুষ, অনেক অলৌকিক ক্রিয়াও করিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া আমি বোম্বাই নগরে তাঁহাদের নিকট যাত্রা করিলাম ও তিন সপ্তাহকাল তাঁহাদের গৃহে বাস করিলাম। তাঁহাদের নিকট কিছু কিছু দেখিলাম ও কিছু কিছু শিখিলাম। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেহ অপটু আর কলিকাতা জনাকীর্ণ স্থান। এই নিমিত্ত কৃষ্ণনগর জেলায় চূর্ণী নদীর ধারে, হাঁসখালি গ্রামে একটি পরিত্যক্ত নীল কুঠিয়ালের বাড়ী ভাড়া লইয়া সেখানে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলাম। আর সেখানে নির্জ্জনে কিছু কিছু মনঃসংযমের কার্য্যও অভ্যাস করিতে লাগিলাম।

এদিকে আমার মেজদাদা মহাশয় আমাদের জন্মস্থান যশোহর জেলাস্থ মাগুরা (অমৃতবাজার) গ্রামে সপরিবারে থাকিয়া ভক্তি-চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রামস্থ লোক লইয়া একটি হরিসঙ্কীর্ত্তনের দল করিলেন। সন্ধ্যাকালে হরিসঙ্কীর্ত্তন করেন, আর অন্যান্য সময়ে ভক্তিগ্রন্থানুশীলন করেন। মেজদাদা মহাশয়ের ভক্তিরস ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল ও তাঁহার সঙ্গগুণে গ্রামস্থ অনেক লোকেও ভক্তিমান হইতে লাগিলেন।...

আমাদের প্রায় দুই মাস দেখাশুনা নাই। কিন্তু মেজদাদা সমস্ত দিবা কিরূপে যাপন করেন, তাহা প্রত্যহ আমাকে লিখেন। আমিও প্রত্যহ পত্র লিখি। কিন্তু আমার লিখিবার কিছু নাই, সুতরাং বিষয় কথা ব্যতীত পরমার্থ কথা কিছুই লিখি না। এমন সময় আমাকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, মেজদাদা মহাশয় হাঁসখালিতে শুভাগমন করিলেন।

দেখি, মেজদাদা মালা ধারণ করিয়াছেন। মুখের আকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন হৃদয়ে মলামাত্র নাই। নয়ন দেখিয়া বোধ হইল যেন অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতেছে। মেজদাদার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, মেজদাদা যে পথ লইয়াছেন, ইহাতে অবশ্য কিছু আছে।

মেজদাদাকে দর্শন করিয়া বড় সুখ বোধ হইল। তিনি তখন এক সন্ধ্যা আহার করেন; মৎস্যাদি সমুদায় ত্যাগ করিয়াছেন। আমি যত্ন করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলাম। মাংস রহিল না বটে, কিন্তু মৎস্যাদি বহু প্রকার রহিল। দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিলাম। মেজদাদার থালে মোটা চিঙড়ী মাছের দুটি ভাজা মাথা ছিল। মেজদাদা আসনে বসিলেন। কিন্তু চিঙড়ীর মাথা ও অন্যান্য মৎস্যের ব্যঞ্জন দেখিয়া কাতরভাবে আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, বৈষ্ণবগণ মৎস্যাদি খাইয়া থাকেন, তুমি কেন খাইবে না? তাহার পর বলিলাম, যে ধর্ম্মে খাইলে ধর্ম্ম যায়, না খাইলে ধর্ম্ম হয়, অর্থাৎ খাওয়ার সঙ্গে যে ধর্ম্মের ভাল মন্দ সম্বন্ধ আছে, সে ধর্ম্ম আমি মানি না।

মেজদাদা কোন উত্তর না দিয়া কাতরভাবে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আমি হাসিয়া বলিলাম, ভণ্ডামি করিতে হয়

বাহিরে করিও, আমার এখানে কেন? তবু মেজদাদা থালায় হাত দিলেন না। তখন বলিলাম, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ যত্ন করিয়া অতি ভক্তিপূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত স্বীয় হস্তে পাক করিয়াছে। তুমি ভক্তবৎসলের পূজা কর, ভক্তের দ্রব্য কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? ইহাই বলিয়া একটু মৎস্য হাতে করিয়া মেজদাদার মুখে দিলাম। আমি যখন নিজ হস্তে তাঁহার মুখে মৎস্য দিতে গেলাম, তখন মেজদাদা হাঁ না করিতে পারিলেন না। এইরূপে আমি মেজদাদার ধর্ম্ম নষ্ট করিলাম।

দেখা অবধি দুই জনে কথা চলিতেছে। এক মুহূর্ত্তও ফাঁক নাই। কখন সুখ দুঃখের কথা বলিতেছি। ধর্ম্মের কথা আরম্ভ হইলে ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল। এইরূপে সারাদিন তর্কে গেল। আমি মেজদাদাকে বলিলাম, তোমার গৌর আমার বড় প্রিয় বস্তু। যদিও তাঁহার মতের সহিত আমার সমুদায় মিলে না, তবু তাঁহার নাম করিলে আমার আনন্দ হয়। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকের কি দুর্ব্বলচেতা মনুষ্যের জন্য। তেজস্বী পুরুষের স্ত্রীলোকের মত কান্দিলে চলিবে কেন? পুরুষ জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারিলে আর কান্নাকাটির মধ্যে কেন যাইবে?

ভক্ত পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতেছেন যে, তখন আমার শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস ছিল না। এমন কি, মেজদাদা যদিও হরিনামে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তবু তিনিও তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সে যাহা হউক, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়, এই কথা লইয়া তর্ক হইল। আমি বলি জ্ঞান বড়, মেজদাদা বলেন ভক্তি বড়। কিন্তু মেজদাদা আমার সহিত কখন তর্কে পারিতেন না। তবে আমার আন্তরিক টান বরাবরই ভক্তির দিকে ছিল। মেজদাদা যদিও তর্কে পারিলেন না, কিন্তু আমি মনে বুঝিলাম যে, তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, আর আমি পাছে পড়িয়া গিয়াছি।... ...

বিকালে দুই ভাই গাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম। গাড়ীতেও ঐ কথা। ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল। তখন গাড়ী মধ্যে কথা-বার্ত্তা বন্ধ হইল। মেজদাদা আপনার ভাবে রহিলেন, আমি আমার ভাবে রহিলাম।

একটু পরে মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া গীত গাহিতে লাগিলেন। গীতটির সমুদায় কথা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু কথা বুঝিবার প্রয়োজন হইল না। সেই গীতটি আমার হৃদয় কোমল ও শ্রবণ তৃপ্ত করিতে লাগিল। ফল কথা, ভক্তের কণ্ঠস্বর একরূপ মন্ত্র বিশেষ। ভক্তের শুদ্ধ কণ্ঠস্বরেই জীবমাত্রের হৃদয় স্পর্শ করে।

মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া গাইতেছেন, আর আমার বোধ হইতেছে যেন শ্রীভগবান আমার হৃদয়ে বসিয়া করুণস্বরে রোদন করিতেছেন। আমি মনোনিবেশপূর্ব্বক সেই করুণ ও মধুর স্বর শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে উহা আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর ক্রমে আমাকে অস্থির করিতে লাগিল। সেই গুন্ গুন্ স্বরটি শেষে হৃদয়ে রহিয়া গেল,—অদ্যাপিও আছে।

মেজদাদা যে গীতটি গাইতেছিলেন তাহা আমি পরে শিখিয়া-ছিলাম। সে গীতটি তাঁহার নিজের কৃত। সেটি এই—

হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধূলায় পড়িল গোরা।
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ দু-নয়নে বহে ধারা॥
ক্ষণেক চেতনা পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই,
এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনোচোরা॥
হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে,
তুমি আমার প্রাণধন, তুমি আমার নয়নতারা॥...

সে যাহা হউক, পর-দিবস মেজদাদা বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি গেলেন বটে, কিন্তু কিছু রাখিয়া গেলেন। তাঁহার সেই করুণ

স্বরটুকু আমার হৃদয়ে রহিয়া গেল। মেজদাদা বাড়ী যাইয়া আমাকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার ভাবার্থ এই ; –'শিশির! আমি জুড়াইবার নিমিত্ত তোমার কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে জুড়াও নাই।'

মেজদাদার এই পত্রে আমি মর্ম্মাহত হইলাম। কারণ, আমি বুঝিলাম যে মেজদাদা যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা সমুদায় ন্যায্য। আমি আগেও বুঝিয়াছিলাম, তখন আরো বুঝিলাম, যে আমি বৃথা জ্ঞানের কথা বলিয়া মেজদাদার হৃদয়ে বড় ব্যথা দিয়াছি। তখন হৃদয়মাঝারে সেই গুন্ গুন্ শব্দটি আরো যেন কান্দিয়া উঠিল।

তখন ভাবিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রিয়বস্তু, আর মেজদাদাও আমার প্রিয়বস্তু। এ উভয়ের অনুরোধে আমার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কিছু জানা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেও গৌরাঙ্গের লীলা কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম, এবং শুনিয়া উহার প্রতি বড় লোভ জন্মিয়াছিল। যখনই গৌরাঙ্গ-লীলা শুনিতাম, তখনই উহা আমার নিকট মধু হইতেও মধুরতর বোধ হইত।

আর বিলম্ব না করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাঠাইতে লিখিলাম, আর মেজদাদার পত্রের উত্তর দিলাম। মেজদাদাকে যাহা লিখিলাম, তাহার ভাবার্থ এই ;—'এবার তুমি আমার সঙ্গে যে দুঃখ পাইয়াছ, অন্য বারে আমি তাহা দূর করিব। বিচিত্র কি, হয়ত আমিও তোমার মত হরিবোলা হইব।'

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি আসিল। আমি উহার প্যাকেট খুলিলাম। পুস্তকখানি হাতে করিলাম, আর কি জানি কেন, আমার অঙ্গ দিয়া যেন একটি আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। পিপাসাতুরের জলপান করিয়া যেরূপ অঙ্গ শীতল হয়, পুস্তকখানি স্পর্শ করিয়া সেইরূপ আমার তাপিত হৃদয় শীতল হইল। আমি চৈতন্যভাগবত অল্প অল্প করিয়া পড়িতে লাগিলাম। অল্প অল্প বলি কেন, না, অতি অল্পেই আমার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল।

মেজদাদা মহাশয় কখন কখন আবিষ্ট হইতেন ও আবিষ্ট হইয়া আমাকে পত্র লিখিতেন, সে সমুদয় পত্রগুলি যেন তাঁহার হৃদয়ে কেহ প্রবেশ করিয়া লেখাইতেন। সেই আবিষ্ট অবস্থার আদেশগুলি আমি বড় মান্য করিতাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মেজদাদাকে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম যে, পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইলে আর তাঁহাকে দুঃখ দিব না। সেই পত্রের উত্তর আসিল।

তখন সকাল বেলা, প্রায় আটটার সময়। আমি ঘরে একেলা আছি। আমার ঘরের মেঝে বাঁশের চাঁচ দ্বারা মণ্ডিত। মেজদাদার পত্রখানি খুলিলাম, তাহাতে যাহা লেখা ছিল, তাহার ভাব এই ;—'শিশির! কোন্ দেবতা, আমি তাঁহাকে চিনি না, আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বলিলেন যে, তোমার কনিষ্ঠ শিশির, ওটি শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস। ঐ দেহ দ্বারা মহাপ্রভু অনেক কার্য্য সাধন করিবেন।'

এই পত্রখানি পড়িয়া আমি সেই চাঁচের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

একটু পরে উঠিয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। আমি এইমাত্র বলিয়াছি যে, মেজদাদা এরূপ আবিষ্ট হইয়া আমাকে যে উপদেশগুলি পাঠাইতেন, আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম। মেজদাদার পত্রে সুতরাং যাহা লেখা ছিল, আমি তাহা বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু আমি মনে মনে এইরূপ ভাবিলাম, 'এ আবার শ্রীভগবানের কি লীলা? প্রেমভক্তি প্রচারের জন্ত কি আর দেহ মিলিল না? আমি কঠিন, কর্কশ, ভক্তিশূন্ত, রাজনীতি লইয়া বিব্রত, ইংরেজী পড়িয়া এক প্রকার নাস্তিক হইয়াছি।' আবার ভাবিলাম, 'আমা দ্বারা শ্রীভগবান প্রেমভক্তি প্রচারের কার্য্য করিবেন, তাহা তাঁহার পক্ষে বৈচিত্র্য কি? তিনি ইচ্ছা করিলে অন্ধের দিব্য চক্ষু হয়। তাঁহার ইচ্ছা হইলে এই পাষাণবৎ হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর হইবে, তাহার আর বৈচিত্র্য কি?'

আমার এখন বোধ হয় যে, সে পত্রখানি দ্বারা মেজদাদা মহাশয় আমাকে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন।

আমি তখন অতি কাতরভাবে করযোড়ে শ্রীভগবানকে নিবেদন করিলাম যে, 'ভগবান! যদি তুমি অসাধনে, কেবল আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, দয়ালু হইয়া, নিজগুণে আমার প্রতি এরূপ কৃপা কর, তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যথাসাধ্য সরল মনে তোমার চরণ ভজন ও জগতে তোমার গুণগান করিব।'*

ক্রমে ক্রমে শিশিরকুমার সত্যই "শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস" হইয়া দাঁড়াইলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও প্রসার এক্ষণে তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মমূলক গ্রন্থ রচনায় ও পত্রিকা পরিচালনে সচেষ্ট হইলেন। 'অমিয়নিমাই-চরিত' তাঁহারই অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত। তাঁহার *Lord Gauranga* পাশ্চাত্যে গৌরাঙ্গকথা প্রচার করিয়াছে। আমেরিকার বহু শিক্ষিত নরনারী গৌরাঙ্গলীলা পাঠ করিয়া মুগ্ধচিত্তে বৈষ্ণবধর্ম্ম বরণ করিয়াছেন। শিশিরকুমারের চেষ্টায় আমেরিকার শিকাগোতে একটি বৈষ্ণব-মঠও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতায় স্থাপিত গৌরাঙ্গ-সমাজ তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নের ফল। এই সমাজ হইতেই তিনি মহাপ্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কলিকাতায় মহা-মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন (১৪ চৈত্র ১৩০৫)। প্রকৃত কথা বলিতে কি, তখনকার দিনের নব্য শিক্ষিতগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত বৈষ্ণব-সমাজের নানারূপ উন্নতিসাধন করিয়া তিনি উহাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

* 'শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'য় মুদ্রিত (আশ্বিন, ৪১৬ গৌরাব্দ) "আত্মকাহিনী' শিশিরকুমার কেমন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরক্ত হন, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গল সাধনে শিশিরকুমার জননীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা একখানি পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।

প্রাণাধিক শিশির,—যদিও আমার জীবন শুষ্ক কাষ্ঠবৎ হইয়া আছে, তথাচ তোমার পত্রখানি পাইয়া তাহাতেও আবার রসের সঞ্চার হইল। বাপ, আমি গোলোকেই বাস করিতেছিলাম, জানি না কি অপরাধে আমি এখন গোলোকভ্রষ্ট হইয়াছি। আমার দেহের কষ্টে দুঃখ নাই, কিন্তু গৌরাঙ্গবিরহে আমার দেহ মন জরজর হইতেছে। আমি গোলোকের পথ জানিতাম না, তুমিই আমার পথপ্রদর্শক। আমি তোমা হেন সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া ধন্য। আমার জগতে আর কোন সাধ নাই, কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ। বাপ, এখন আমাকে শীঘ্র গোলোকে পাঠাইয়া আমায় সেই চরণসেবায় নিযুক্ত কর।

বাপ, আমার জন্য তুমি চিন্তা করিও না। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া জগতের মঙ্গল কর, আমি অন্তরের সহিত তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করি। সন্তানের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি আমাকে ঢের করিয়াছ। বাপ, জীবের পরম সম্পদ গৌরাঙ্গ নাম, তাহা আমি তোমার নিকটেই প্রাপ্ত হইয়াছি। ভক্তের বাঞ্ছা ভগবান পূর্ণ করিয়া থাকেন, অবশ্যই তোমার বাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবেন। ইতি—
আশীর্ব্বাদিকা তোমার মা।*

এই পত্রখানিতে শিশিরকুমারের ভক্তিমতী মাতৃহৃদয়ের মহিমা যেমন পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তেমনি কৃতী পুত্রের প্রতি সেই

* 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' গ্রন্থের ৩৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

পুণ্যবতী মহিলার স্নেহও যেন সহস্র ধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে—ইহার ছত্রে ছত্রে যেন অমৃতকণা ঝরিয়া পড়িতেছে!

মৃত্যু

অতিরিক্ত পরিশ্রমে যৌবনেই শিশিরকুমারের শরীর ভাঙ্গিয়াছিল; তিনি অজীর্ণ রোগে ও অনিদ্রায় দীর্ঘ কাল কষ্ট পাইয়াছেন, তবুও পরিশ্রমে কখনও কাতর হন নাই। কিন্তু বার্দ্ধক্যে শরীর ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় মাঝে মাঝে দেওঘরের বাড়ীতে কাটাইয়াছেন। ১৩১৭ সালের ২৬এ পৌষ (১০ জানুয়ারি ১৯১১), ৭২ বৎসর বয়সে, জন্মভূমির একনিষ্ঠ মুক্তিসাধক শিশিরকুমারের জীবনের উপর যবনিকাপাত হইল।

গ্রন্থাবলী—বাংলা ও ইংরেজী

সারাজীবন বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও শিশিরকুমার অবসর-মত সাহিত্য সাধনা দ্বারা, রচনা-সম্ভারে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শিশিরকুমারের রচনাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার এক জন চরিতকার এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

> শিশিরকুমারের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা তাঁহাকে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও সুপরিচিত ও সম্মানিত করিয়াছে। দীনা মাতৃভাষার উন্নতি বিধান কল্পে শিশিরকুমার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই; রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতির প্রচার, প্রসার ও সংস্কার উদ্দেশ্যেই তিনি বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ

করিয়াছিলেন।...বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র আপন আপন প্রতিভাবলে বঙ্গসাহিত্যের এক এক বিভাগে এক একটি রচনা-রীতি দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে ভাষা কিরূপে মনোজ্ঞ করিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায়, শিশিরকুমারই তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। শিশিরকুমার কোন বিষয়ে অনুকরণপ্রিয় ছিলেন না, সুতরাং বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আপন ভাবেই লেখনী সঞ্চালন করিয়া গিয়াছেন।...শিশিরকুমারের রচনার মধ্যে এমন একটি আকর্ষণীশক্তি আছে যে, তাঁহার গ্রন্থ অজ্ঞাতভাবে পাঠকের হৃদয় আকৃষ্ট করে।... শিশিরকুমার ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও, তাঁহার বাঙ্গালা রচনা আদৌ ইংরাজী ভাবাপন্ন নহে; অনেকে বরং তাঁহার ইংরাজীকে বাঙ্গালা ভাবাপন্ন বলিয়া থাকেন। রাজনীতি-চর্চ্চার ন্যায় সাহিত্যেরও প্রচারে শিশিরকুমারের জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ('মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ,' পৃ. ৩৫৮-৫৯)

আমরা শিশিরকুমারের বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থগুলির সঠিক প্রকাশকাল সহ একটি তালিকা প্রদান করিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে ইংরেজী প্রকাশকাল বঙ্গীয় সরকারের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত :—

১। **সর্পাঘাতের চিকিৎসা**। (১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮)। পৃ. ৩৮।

মালবৈদ্যগণের মতে সর্পদংশন চিকিৎসা। ১ম সংস্করণের পুস্তকের এক খণ্ড ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে আছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহা "চন্দ্রনাথ কর্ম্মকার সম্পাদিত; ...প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী—প্রমথনাথ ঘোষ, মাগুরা, যশোহর; ...অমৃতবাজার—যশোহরে মুদ্রিত, মূল্য ।০।" পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম মুদ্রিত হয় নাই।

'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই পুস্তক "শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার নেটিব ডাক্তার অমৃত বাজার-এর নিকট লিখিলে পাইতে পারিবেন" বলিয়া বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইত। ১৮৭১ সনের জুন মাসে প্রকাশিত ২য় সংস্করণে "ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।"

শিশিরকুমার "একজন মালবৈদ্যকে মাসিক বেতন দিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়া সর্পদংশনের চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিলেন।" 'সর্পাঘাতের চিকিৎসা'র উপক্রমণিকায় প্রকাশ :—

"সর্পাঘাতে মৃত্যু কিরূপ ভয়ঙ্কর ও যন্ত্রণাদায়ক, তাহা যাঁহারা কখন না দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না।...সর্পাঘাতের মৃত্যু হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা-প্রণালী বাহির করা। ডাক্তার সর্ট, ফেয়ার, ওয়াল, রিচার্ড প্রভৃতি প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ সর্পদংশনের ঠিক ঔষধ বাহির করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন, কেহ কেহ এখনও করিতেছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহারা কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমরা এই পুস্তকে সর্পাঘাতের এক প্রকার চিকিৎসা-প্রণালীর কথা বলিব। যদি ঠিক এই প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করা যায়, তবে সর্পদষ্ট ব্যক্তি মরিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যদি কখন মরে, তবে সে অনবধানতা বা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ, চিকিৎসার দোষে নহে। এই চিকিৎসা-প্রণালী অতি সহজ ও বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রসম্মত। বহু দিবস যাবৎ এই চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া এবং এই প্রণালী অনুসারে বহুসংখ্যক সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিতে দেখিয়া ও করিয়া, আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়াছে। এদেশে মালবৈদ্য, সাপুড়িয়া প্রভৃতি কতকগুলি জাতি আছে। ইহারা উল্লিখিত প্রণালী

অনুসারে সর্প চিকিৎসা করিয়া থাকে। ইহাদের চিকিৎসা-প্রণালী একরূপ অব্যর্থ ... ।"

২। **সংগীত শাস্ত্র**। ইং ১৮৬৯।

'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' গ্রন্থে (১৩২৭, পৃ. ১৩-১৪) প্রকাশ :— "শিশিরকুমার 'সঙ্গীত-শাস্ত্র' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় পুস্তকখানি এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে :—"সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।— উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানাবিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক।...মূল্য ॥০ ...শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য যশোহর অমৃত বাজার।"

৩। **নয়শো রুপেয়া** (প্রহসন)। ১২৭৯ সাল (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩)। পৃ. ৯৭।

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত।

৪। **বাজারের লড়াই** (প্রহসন)। মাঘ ১২৮০ (১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪)। পৃ. ৩৪।

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত।

৫। **শ্রীনরোত্তম চরিত**। ? (১৬ জুলাই ১৮৯১)। পৃ. ১৯২।

৬। **শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত :**

১ম খণ্ড।	(১ ডিসেম্বর ১৮৯২)।	পৃ. ২২৮।
২য় খণ্ড।	(২২ মার্চ ১৮৯৩)।	পৃ. ৩৫২।
৩য় খণ্ড।	(৫ আগষ্ট ১৮৯৪)।	পৃ. ৩০৬।

৪র্থ খণ্ড। (২৭ জুন ১৮৯৬)। পৃ. ২৭৭।
৫ম খণ্ড। ১৩০৮ সাল (২ ডিসেম্বর ১৯০১)। পৃ. ২৩৬।
৬ষ্ঠ খণ্ড। ১৩১৭ সাল (৮ মার্চ ১৯১১)। পৃ. ২৮৭।

৭। **শ্রীকালাচাঁদ-গীতা** (কাব্য)। ১৩০২ সাল (১ মার্চ ১৮৯৬)।
পৃ. ২৩২ + ক-ল, ব।

"শ্রীমতিলাল ঘোষ কর্ত্তৃক ভূমিকা ও টীকা সহ প্রকাশিত।"

৮। **শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপাল ভট্ট**। ? (৪ নবেম্বর ১৮৯৬)।
পৃ. ৯৯।

৯। বৈষ্ণবদাস কর্ত্তৃক গ্রন্থিত **পদকল্পতরু**, ১-৩ খণ্ড : ইং ১৮৯৭।
শিশিরকুমারের "যত্নে, তত্ত্বাবধানে ও পর্য্যবেক্ষণে" প্রকাশিত।

১০। **শ্রীনিমাই-সন্ন্যাস** (নাটক)। ? (১৫ জানুয়ারি ১৯০৯)।
পৃ. ১১২।

"ইহাতে প্রকৃত ঘটনা লিখিত হইয়াছে, বিন্দুমাত্রও কল্পনা নাই।"

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১১। **ধ্রুপদ ভজনাবলী** (সংগ্রহ-গ্রন্থ)। ইং ১৯১৩। পৃ. ১৭১।

"তানসেন, নেওলকিশোর, আনন্দকিশোর, ব্রজবাউরা, রামদাস বাবাজী রচিত আদিম এক শত পঞ্চদশ ভিন্ন ভিন্ন সুরের ধ্রুপদ সঙ্গীত সংগ্রহ।"

"শিশিরকুমার ঘোষের সাধের ধ্রুপদ ভজনাবলী ছাপান হইল।... ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে একদা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় রামলাল [মৈত্র] বাবুর সংগৃহীত গানের মধ্য হইতে দুই একখানি গান শ্রবণ করিয়া

মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি তানসেনের রচনায় উচ্চ বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাব ও ভগবদ্ প্রেমসুধা নিহিত দেখিয়া এই গানগুলি ছাপাইয়া জনসমাজে প্রকাশ বাসনা করেন।"

1. *Snakes : Snake-bites and Their Treatment* :
   By A Hindu. 1889.

ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। ইহা 'সর্পাঘাতের চিকিৎসা'র ইংরেজী রূপ ; কেবল পরিশিষ্টে ১৮৭১, সেপ্টেম্বর মাসের ভীষণ বন্যায় চৈতালের জলাভূমিতে সর্প দর্শনের চিত্রটি অতিরিক্ত আছে। চিত্রটি সম্ভবতঃ 'অমৃত বাজার পত্রিকা' হইতে গৃহীত। বাংলায়—অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে ইহা ৪-১০-৭১ তারিখের পত্রিকায় পাইতেছি।

2. *Lord Gauranga* or Salvation for All :
   Vol. I. 1897 (16 Aug.) p. vi + lv + 236 + 4.
   Vol. II. (20 Dec. 1898), p. 348.

3. *Indian Sketches.* 1898 (5 July), p. 235.

'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত শিশিরকুমারের ৩৮টি ইংরেজী রচনা,—মতিলাল ঘোষ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও W. S. Caine-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। ১৯২৩ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণটি পরিবর্দ্ধিত, ইহাতে আরও ৬টি প্রবন্ধ নূতন সংযোজিত হইয়াছে।

4. *Pictures of Indian Life.* Madras, Dec. 1917. p. 268.

রাসবিহারী ঘোষ-লিখিত ভূমিকা ও গ্রন্থকারের জীবনী সহ। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ১৮৯৮ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাগুলি হইতে সঙ্কলিত ১৯টি ইংরেজী রচনার সমষ্টি।

সাময়িক-পত্র : বাংলা ও ইংরেজী

শিশিরকুমার যে-সকল সাময়িক-পত্র পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, সেগুলিরও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' :

বাংলা সাপ্তাহিক ...	যশোহর হইতে	২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ (৯ ফাল্গুন ১২৭৪)
ইংরেজী-বাংলা সাপ্তাহিক...	ঐ	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯
...যশোহর হইতে শেষ সংখ্যা		৪ অক্টোবর ১৮৭১
...কলিকাতা, বউবাজার হইতে		২১ ডিসেম্বর ১৮৭১
...কলিকাতা, বাগবাজার হইতে		২ এপ্রিল ১৮৭৪- ১৪ মার্চ ১৮৭৮

প্রথম তিন বৎসরের (ইং ১৮৬৮-১৮৭০) 'অমৃত বাজার পত্রিকা' হইতে কতকগুলি বাংলা রচনা সঙ্কলন করিয়া শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (পৌষ ১৩৫৪) পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন ; এই সকল রচনার অধিকাংশই সম্পাদকীয় এবং শিশির-কুমারের লিখিত।

২। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (পাক্ষিক···)। ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—১ চৈত্র, ৪০৫ চৈতন্যাব্দ (ইং ১৮৯০)।

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সৃষ্টি, শিশির বাবুর অন্যতম অনুপম কীর্ত্তি।" "বৈষ্ণব ধর্ম্মের চর্চ্চা ও প্রচার এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।" ইহা পত্রিকা-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং রাধিকানাথ গোস্বামী ও কেদারনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। পাক্ষিক 'বিষ্ণুপ্রিয়া' কিছু দিন পরে

মাসিকপত্রে পরিণত হয়। এই ভাবে কয়েক বৎসর চলিবার পর সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সহিত সম্মিলিত হইয়া "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা' নাম ধারণ করে। ১৩২৮ সালের ২৯এ ফাল্গুন হইতে ইহার "নব পর্য্যায়"-রূপে বর্ত্তমান "আনন্দবাজার পত্রিকা'খানি দৈনিক আকারে প্রকাশিত হইতেছে।

৩। **শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা** (মাসিক)। ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—ফাল্গুন ৪১৬ গৌরাব্দ (ইং ১৯০১)। "শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের মুখপত্র। শ্রীগৌরভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।"

1. *Amrita Bazar Patrika.*

১৮৭৮, ২১এ মার্চ 'অমৃত বাজার পত্রিকা' দ্বিভাষিক কলেবর ত্যাগ করিয়া পুরাদস্তুর ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৮৯১, ১৯এ ফেব্রুয়ারি হইতে ইংরেজী দৈনিকে রূপান্তরিত হইবার চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ভগ্নস্বাস্থ্য শিশিরকুমার পত্রিকা-সম্পাদন-ভার অনুজ মতিলালের হস্তে অর্পণ করেন।

2. *Hindu Spiritual Magazine.*

পারলৌকিক-তত্ত্ব বিষয়ক মাসিকপত্র। প্রথম সংখ্যার প্রকাশ-কাল—মার্চ ১৯০৬।

পরিশিষ্ট

শিশিরকুমার সম্পর্কে নবীনচন্দ্রের স্মৃতিকথা

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র বিরুদ্ধে যখন লাইবেলের মকদ্দমা সুরু হয়, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন সেই সময়ে (২৪ জুলাই ১৮৬৮) যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি যশোহরে বৎসরাধিক কাল ছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এই মানহানির মামলা সম্পর্কে অনেক কথা তিনি 'আমার জীবন' পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে "অমৃত বাজার পত্রিকা" ও "শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ" অধ্যায় দুইটিতে লিখিয়া গিয়াছেন। শিশিরকুমারের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়ও এইখানেই ঘটে। নবীনচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে শিশিরকুমার সম্বন্ধে যে অনবদ্য বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্বের উপর অভিনব আলোক-সম্পাত করে। কবি তাঁহার নিপুণ তুলিকায় এমন অপরূপ ছবি আঁকিয়াছেন যে শিশিরকুমারের বাহ্য আকৃতি এবং মনের চেহারা দুই-ই যেন আমাদের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠে। এই বর্ণনায় ভিতর হইতে দৈহিক সৌন্দর্য্যের অনধিকারী যুবক শিশিরকুমার যেন তাঁহার বিরাট্ ব্যক্তিত্ব, উৎকট ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগ, একগুঁয়েমি, স্নেহপ্রবণতা, সঙ্গীতকুশলতা, বাদননৈপুণ্য ইত্যাদি যাবতীয় দোষগুণ লইয়া একেবারে রক্তমাংসের মানুষ হইয়া আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সেই অপূর্ব্ব ও জীবন্ত বর্ণনাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

অমৃত বাজার পত্রিকা।— 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ও তাহার সম্পাদক ভারতবিখ্যাত শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁহার কনিষ্ঠ মতিলাল ঘোষকে আজ কে না চেনেন? আমি যশোহরে অবতীর্ণ হইবার

কিছু দিন পূর্ব্বে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ভূমিষ্ঠ হয়। বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা; কাগজ কদর্য্য, ছাপা কদর্য্য, ভাষা কদর্য্য। শুনিলাম উহার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, কম্পোজিটর শিশিরকুমার ঘোষ, প্রিণ্টার শিশিরকুমার ঘোষ, এমন কি উহার প্রেস ও অক্ষর প্রস্তুতকারক পর্য্যন্ত শিশিরকুমার ঘোষ। কাগজখানির নামটি যে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়, তাহার অক্ষর, লোকের বিশ্বাস, লাউ কাটিয়া, কি কাঠ কাটিয়া, প্রস্তুত করিয়াছেন শিশিরকুমার ঘোষ। শিশিরকুমার নিজ গ্রামে এক বাজার স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মাতার নাম অমৃতময়ী। বাজারের নাম রাখিয়াছেন অমৃত বাজার। আর সেই জন্য কাগজখানির নাম হইয়াছে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'। লোকের মুখে এ সকল কথা যেন উপাখ্যানের মত শুনিতে লাগিলাম। আর শুনিলাম তিনি একজন মহাব্রাহ্ম। দিনকতক যখন এসেসর ছিলেন, তাঁহার পাল্কির বাঁশের সঙ্গে মুর্গি বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন এবং শিশিরকুমারের কুক্কুটধ্বজ হিন্দুজগতে তারস্বরে তাঁহার ব্রাহ্মত্ব প্রচার করিত। তিনি মনরো সাহেবের আন্তরিক প্রিয়পাত্র ও তাঁহার প্রধান শাসনাস্ত্র। এ হেন দুরন্ত সাহেব তাঁহার করে যেন মোমের পুতুল। সাহেব মহোদয়ের দীর্ঘ কর্ণ দুখানি শিশিরকুমারের করন্যস্ত। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়েও শিশিরকুমার অবাধে তাঁহার দাম্পত্য কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিতেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে শিশিরকুমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—'অমুক স্থানে একটা দাঙ্গার আয়োজন হইয়াছে। প্রভাত হইলে কত লোক মারা যাইবে ঠিক নাই।' সাহেব বলিলেন—'শিশির! আমি অতি প্রত্যুষে যাইব।' শিশির বলিলেন—'তাহা হইলে হইবে না। আপনাকে এখনই যাইতে হইবে।' সাহেব আর কথাটি না কহিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিলেন, এবং প্রভাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে এমন সময়

দুই পক্ষের মধ্যস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'বেশ বাবা! খুব যুঢ়্‌ঢ় কচ্চো।' আর মুহূর্ত্তমধ্যে লাঠিয়াল সকল লাঠি ফেলিয়া পলায়ন করিল এবং উভয় পক্ষের নেতৃগণ ধৃত হইল। লোকের বিশ্বাস মনরো সাহেবই কাগজখানি খোলাইয়াছেন..এবং তিনি বাধ্য করিয়া যশোহরের আপামর সাধারণকে তাহার গ্রাহক করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।' 'অতি' সবই মন্দ! অতি বন্ধুতায় ইদানীং বিষোৎপন্ন হইয়াছে। 'অমৃত বাজারে'র এক সংখ্যায় 'ঘোরতর অত্যাচার' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখা থাকে যে কোনও সবডিভিসনাল অফিসার একটি সাক্ষীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছেন, এবং অন্য প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় যে তিনি উপদংশ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন! ফৌজদারি হেডক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্র মেজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠান যে এই দুই প্রবন্ধের লক্ষ্য তাঁহার অধীনস্থ কোনও কর্ম্মচারী। সাহেব জিজ্ঞাসা করেন সে কে। রাজকৃষ্ণ বলেন তিনি বলিতে পারেন না। সাহেব সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কি—আমার হুকুম অমান্য! শিমুলস্তূপে অগ্নিকণা পড়িল, আর হুহুঙ্কার শব্দে সাহেবের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন দশ মিনিটের মধ্যে রাজকৃষ্ণের উত্তর দিতে হইবে। তাহার পর পাঁচ মিনিট। তাহার পর দুই মিনিট। কিন্তু রাজকৃষ্ণ উত্তর দিলেন না। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম হইতে সস্‌পেণ্ড করিয়া তিনি শিশিরকুমারকে পত্র লিখিলেন। শিশিরকুমার লিখিলেন যে প্রবন্ধে যাহা আছে তাহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছু বলিতে বাধ্য নন। এবার সাহেবের ক্রোধ দাবানলে পরিণত হইল। তিনি তখন অমৃত বাজারের সম্পাদক বা সম্পাদকগণ, মুদ্রাকর বা মুদ্রাকরগণ, প্রকাশক বা প্রকাশকগণের নামে যথাশাস্ত্র এক 'অফিসিয়াল' পত্র ঝাড়িলেন। শিশিরকুমার এ পত্রেরও

ঐরূপ উত্তর দিলেন। তখন সাহেব চুপ করিয়া থাকিলে কেহ তাঁহার দোষ দিত না। কিন্তু তিনি সেরূপ পাত্র নহেন। বিধাতার নীতি টলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার হুকুম টলিবে না। তাঁহার হুকুম যতই অসঙ্গত ও নীতিবিরুদ্ধ হউক না, তাহার একটি অক্ষর যে পালন না করিবে, সে যতই তাঁহার বন্ধু হউক না, যতই নির্দ্দোষী হউক না, তিনি তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া ছাড়িবেন না। তিনি তখন তদন্ত করিয়া জানিলেন যে উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের লক্ষ্য ঝিনাইদহের সবডিভিসনাল অফিসার রাইট (Wright) সাহেব। তখন উহার দ্বারা শিশিরকুমার ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মিত্র, এবং একজন প্রিণ্টারের নামে অপবাদ বা 'লাইবেল' অভিযোগ উপস্থিত হইল। যশোহরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, যেন একটা খণ্ড প্রলয় হইয়াছে। এ সময়ে আমি সশরীরে যশোহরে ধর্ম্মাবতারের সিংহাসন আরোহণ করি।... (পৃ. ১১-১৩)

* * *

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ।—যদিও মাজিষ্ট্রেট মনরো মহোদয়ের অধীনে আমি এক পক্ষকাল মাত্র কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তথাপি তিনি আমাকে এত স্নেহ করিতেন যে তিনি স্থানান্তরিত হওয়ায় আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম; এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে একটি 'সনেট' লিখিয়া 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় ছাপাইতে পাঠাইলাম। "মনরো সাহেবের বদলিতে আর ত কেহ কাঁদিল না, কেবল নবীন বাবুই কাঁদিলেন"—এরূপ এক অন্তর টিপ্পনি সহ পত্রিকাতে কবিতাটি ছাপা হইল। আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র লিখিলাম, এবং পত্রিকা উহা না ছাপিলে উহা অন্য কাগজে ছাপাইব বলিয়া ভয় দেখাইলাম। তাহার কিছু দিন পরে বেলা তিনটার সময়ে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আমার এজলাসে

আসিয়া উপস্থিত। একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিশেষ বলিলেও চলে। বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর। সমস্ত শরীরে কেবল কয়েকখানি হাড়। নাকের, মুখের এমন কি সর্ব্বশরীরের অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু কোটরস্থ, কিন্তু তীব্র, উজ্জ্বল, হাস্যময়। মুখে গালভরা পান, ও গালভরা কেমন একপ্রকার বিদ্রূপাত্মক হাস্য। পানের অলক্ত রসে অধরপ্রান্তদ্বয় প্লাবিত। পরিধান সামান্য সাদা ধুতি, সামান্য পিরাণ, তাহারও নাস্তি বোতাম। তাহার উপর একখানি চাদরের দড়ি—বুকের উপর অঙ্কশাস্ত্রের পূরণের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া প্রান্তদ্বয় স্কন্ধের উপর দিয়া পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। এই ত রূপ! কিন্তু মূর্ত্তিখানি দেখিলে বোধ হয় কি যেন একটি অদ্বিতীয় লোক। মূর্ত্তি আমার দিকে সহাস্যবদনে অগ্রসর হইতেছে, আমি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিয়াছি। পার্শ্ব হইতে আমার সেই মুসলমান পেশকার চুপে চুপে বলিল—'শিশিরবাবু!' এবং উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বলিবার বড় প্রয়োজন ছিল না। মূর্ত্তি আমার এজলাসের সমক্ষে আসিয়া বলিল—'আপনার পরিচয় আপনিই দিই। আমার নাম শিশিরকুমার ঘোষ। আপনার কি এখন বড় কায?' আমি উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার করমর্দ্দন করিলাম। চেয়ার আনিবার অপেক্ষা না করিয়া তিনি পেশকারের পার্শ্বে টুলের উপর বসিলেন। এজলাসে অন্য আসন ছিল না। আমাকে বসিতে বলিলেন। যদিও তাঁহার অনেক নিন্দার কথা শুনিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া কিরূপ আমার হৃদয়ে গভীর ভক্তি ও আনন্দের সঞ্চার হইল। তিনি বসিয়াই বলিলেন—'আপনার কায কখন শেষ হইবে? আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এই অল্প দিনে যশোহরে আপনার এত প্রশংসা হইয়াছে যে আপনাকে একবার না দেখিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে চাহেন কেন? আমাকে

ইংরাজদের সঙ্গে এত ঝগড়া করিতে হইতেছে যে বাঙ্গালীর সঙ্গে ঝগড়া করিবার আমার সত্য সত্যই সময় নাই। যাক্, আপনি কখন বাড়ী যাইবেন?'...নানাবিধ কথা কহিতে কহিতে বাড়ী চলিলাম। বাড়ী পঁহুছিয়া তিনি বলিলেন—'তোমার বয়স এত অল্প, তোমাকে আপনি বলা আমার পোষায় না। তাই 'তুমি' বলিব। তোমাকে দেখিয়াই তোমার উপর কেমন আমার ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ হইয়াছে।' আমি বড়ই প্রীত হইলাম এবং বলিলাম আমিও সেইরূপ স্নেহ তাঁহার কাছে চাহি। তাহার পর আমার 'সনেটে'র কথা তুলিয়া তিনি বলিলেন—'তুমি এখনও বালক। তুমি মনরো সাহেবকে চেন নাই। আমার মত তাঁহার বন্ধু যশোহরে কেহ ছিল না। এমন ভয়ানক লোক ভূভারতে নাই।' কথাটি আমি তখন বিশ্বাস করি নাই। ইদানীং আমার বুকের রক্ত দিয়া বিশ্বাস করিতে হইয়াছে।... তখন তিনি তাঁহার মোকদ্দমার কথা ও বিপদের কথা তুলিয়া বলিলেন—'আমার এই বিপদ। তাহাতে মনরো সাহেবের বন্ধু ছিলাম বলিয়া আমি সকলের সহানুভূতি হারাইয়াছি। তোমাদের হাকিম সম্প্রদায় আমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। তোমাকে আমার একটা উপকার করিতে হইবে। তাঁহারা সকলে, আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের কাছে লইয়া যাইবে এবং যাহাতে আমার প্রতি তাঁহাদের এ ঘৃণার ভাব দূর হয় তাহা করিতে হইবে।' বাস্তবিকই হাকিম সম্প্রদায় তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, ততোধিক ভয় করিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে মনরো সাহেবের একজন প্রধান গোয়েন্দা বলিয়া জানিতেন। তিনি আসিতেছেন শুনিলে অমনি গান বাজনা বন্ধ হইত, পানীয় উপকরণ লুকাইবার ধুম পড়িয়া যাইত, এবং সকলে শিষ্টাচারসঙ্গত ভাব গ্রহণ

করিয়া বসিতেন—ঠিক যেন একটা ব্রাহ্মসমাজ। যতক্ষণ তিনি থাকিতেন অতি সাবধানে কথা কহিতেন। আমি বলিলাম—'আপনি যাহা সন্দেহ করিয়াছেন তাহা অমূলক নহে। আমি কি করিলে আপনার এ উপকার হইতে পারে তাহা বলিয়া দিলে আমি সেইরূপ করিব।'

তিনি। তাঁহাদের আমাকে ঘৃণা করিবার প্রধান কারণ এখন নাই। মনরো সাহেব এখন আমার মহাশত্রু, এবং তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আর এক কারণ আমি মদ খাই না। আমার এই শরীর, মদ খাইলে আমি মরিয়া যাইব। তাই খাই না। আচ্ছা, এরূপ কোনও মদ আছে যাহা খাইতে ভাল, নেশা হয় না, বুক জ্বালা করে না?

আমি। কেন?

তিনি। আমি তোমার সাক্ষাৎ একটুক খাইব। তুমি তাঁহাদের সে কথা বলিবে। তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন, এবং বুঝিবেন তাঁহারা মদ খান বলিয়া যে আমি তাঁহাদের মন্দ বলি তাহা নহে।···

আমি হাসিলাম এবং শিশির বাবুকে বলিলাম তাঁহার মদ খাইতে হইবে না। মদ যে তাঁহার ও হাকিমদের মধ্যে অন্তরায় হইয়াছে আমার এমন বোধ হয় না। কারণ তাঁহাদের সম্প্রদায়ে মদ না খান এমন লোকও আছেন। আমি দুজনের নামও করিলাম। কিন্তু শিশির বাবুকে যে চিনে সে জানে যে তিনি যাহা গোঁ ধরিবেন, তাহা কখনও ছাড়িবেন না। তিনি আমার কাছে 'রোজলিকার' মিষ্ট ও প্রায় নেশাহীন শুনিয়া জিদ করিয়া এক বোতল আনাইলেন, এবং ঘটিরামের মত একটুকু মুখে দিলেন। তাহার পর বলিলেন—'চল, আমার সঙ্গে এখন চল!' উভয়ে স্কুলের হেডমাষ্টার বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত

হইলাম। পূর্ব্বেই তাঁহাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ পরিচয় ছিল। শিশিরবাবু বলিলেন—'নবীনকে জিজ্ঞাসা কর আমি এখনই তাহার বাসায় মদ খাইয়া আসিতেছি। বল, তোমরা আর আমাকে ঘৃণা করিবে না।' হেডমাষ্টার বাবু—'ব্রেভো শিশির!'—বলিয়া খুব বাহবা দিলেন। তখন অন্যান্য বন্ধুরাও আসিয়া জুটিলেন। শিশির বাবুর পান সংবাদ শুনিয়া একটা হাসির তুফান উঠিল। তাহার পর খুব আমোদ আরম্ভ হইল। শিশিরকুমার, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একজন অদ্বিতীয় লোক। সঙ্গীতের সকল কলা তাঁহার পূর্ণরূপে আয়ত্ত। পাকোয়াজে তিনি একজন সিদ্ধহস্ত, এবং কি কীর্ত্তন, কি কালোয়াত, কি টপ্পা, সকলেই তাঁহার সমান অধিকার। সকলে তাঁহাকে গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন—'তোমরা আমার সাক্ষাৎ মদ না খাইলে, আমাকে আপনার বলিয়া না জানিলে, আমি গাইব না। দেখ বড় মনের দুঃখে আজ আমি তোমাদের কাছে নবীনকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি; কারণ নবীন তোমাদের বড় স্নেহের পাত্র। আজ হইতে আমারও বড় স্নেহের পাত্র। আমি তাহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। ভরসা করি নবীন আমাকে তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে পারিবে। আমাকে তোমরা আর দূরে রাখিও না।' কথাগুলি শিশির বাবু এমন আগ্রহ ও সহৃদয়তার সহিত বলিলেন যে সকলে গলিয়া গেলেন। তখন সুরাদেবী আসিয়া দর্শন দিলেন এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত শিশির বাবু তাঁহার সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন। আমি সে দিন হইতে, সেই প্রথম পরিচয় হইতে, তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখিলাম এবং সেই ভক্তি উত্তরোত্তর এক জীবন বৃদ্ধি হয়। আজ তাঁহাকে—'অমিয়নিমাই-চরিতে'র আদিষ্ট ও আবিষ্ট শিশিরকুমারকে,—আমি দেবতার মত পূজা করি। তাঁহার পায়ে পড়িয়া তাঁহার পদধূলি

গ্রহণ করি। এই অবধি শিশির বাবু আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। যেখানে আমাদের একটা নিমন্ত্রণ হইত—প্রায় প্রত্যেক শনিবারে ও রবিবারেই হইত—তিনিও নিমন্ত্রিত হইতেন। তাহার দুইটা গল্প বলিব।

১। যশোহরে একটা সাইক্লোন হয় [৯ জুন ১৮৬৯]। তাহার কথা পরে বলিব। আমরা স্কুলগৃহে আশ্রয় লইয়াছি। পরদিন প্রাতে শিশির বাবুও স্কুলগৃহে আসিলেন। তিনি পূর্ব্বরাত্রিতে ঝড়ের সময়ে কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—ঝড়ের পূর্ণবেগে যখন প্রলয় উপস্থিত করিয়াছিল তখন তিনি একখানি কাঁথা গায়ে দিয়া কাচারির মাঠে গিয়া পড়িয়া রহিয়াছিলেন, এবং ঝড়বেগে ভূমিতে কাষ্ঠখণ্ডবৎ তাড়িত হইতেছিলেন। সকলে শুনিয়া অবাক। এই খেয়াল কেন হইল? তিনি একটুক হাসিয়া বলিলেন—'ঝড়ের বেগ (velocity) মাপ করিতেছিলাম।'

২। শ্রদ্ধাস্পদ দীনবন্ধু বাবু যশোহর আসিয়াছেন, ও আমার বাসায় আছেন। শিশির বাবু তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কথায় কথায় বলিলেন,—'দীনবন্ধু, তুমি এবার যদি অমৃত বাজারে পোষ্টাফিস দেখিতে যাও, তবে একবার আমার স্কুলটি দেখিয়া আসিও। দেখিও কি কাণ্ডকারখানা করিয়াছি!

দী। কি করিয়াছ?

উ। ছেলেদের ড্রিল (কোয়াদ) শিখাইতেছি।

দী। এত বন্দুক সঙ্গীন কোথায় পাইলে?

উ। পাকা বাঁশের লাঠি। যদি এরূপ ভাবে দেশের সকল স্কুলে 'ড্রিল' শিক্ষা দেয়, তবে তুমি দেখিবে একটা bloodshed (রক্তপাত) না হইয়া যাইবে না।

দীনবন্ধু অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'কি? Bloodshed (রক্তপাত)?—Menstruation (রজস্বলা)?' একটা হাসির তোলপাড় উঠিল। দীনবন্ধু এরূপ ভাবে ও এরূপ কণ্ঠে কথাটি বলিলেন যে সকলে হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শিশির বড়ই অপ্রতিভ হইলেন এবং চটিয়া বলিলেন—'তোমার কাছে কোনও serious (গুরুতর) কথা বলা বৃথা।' দীনবন্ধু আবার বলিলেন বাঙ্গালীর রজস্বলা ভিন্ন আর 'ব্লডশেড' কি হইতে পারে? শিশির তখন মাতৃভূমির দুঃখের কথা কহিতে কহিতে কাঁদিয়া ফেলিতেন, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইতেন। সত্য মিথ্যা জানি না, শুনিয়াছি তাঁহার একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা (হীরালাল) উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—'আমার দ্বারা যখন মাতৃভূমির কিছুই হইবে না, তখন এ জীবন রাখিয়া কি ফল?' যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও 'পলাশির যুদ্ধে' স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক। (পৃ. ২০-২৬)

নীলকর-অত্যাচার প্রতিরোধে শিশিরকুমার

নীলকরদের অত্যাচারে উৎপীড়িত প্রজাদের অপরিসীম দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া যুবক শিশিরকুমার অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, কখনও পদব্রজে, কখনও বা নৌকাযোগে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যশোহর ও নদীয়ার কতকাংশের প্রজাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহার অভয় বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা নীল বোনা বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। শিশিরকুমার "Jessore Correspondent"-রূপে, প্রধানতঃ "M. L. L" স্বাক্ষরে, নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক বিবরণ নিয়মিতভাবে দেশপ্রাণ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশ করিয়া গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন; এই সকল পত্রে এক দিকে যেমন অত্যাচরিত প্রজাবর্গের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, অন্য দিকে কিরূপ দৃঢ় মনোবল লইয়া তাহারা অত্যাচার-প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানাভাবে শিশিরকুমারের সকল পত্র সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব নয়, আমরা মাত্র একখানি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

[The *Hindoo Patriot*, 22 August 1860]

The following are from our Jessore Correspondent :—

Dear Sir,—To elude the acute search of Mr. Skinner, I thought fit to shift my place of residence and now I have turned a complete *errantes*. I followed Mr. Molony, tho' not very closely, to the indigo districts, and am now somewhere near the Hajrapore concern. Mr. Molony with 100 Sepoys under Capt. Howard, first went up to Jhenada, thence to Magoora, and now, if I mistake not, he is residing with his friend Mr. Oman of Bijlay.

Mr. Editor, it is a pity that the Indigo Commission had no time to come to this district to see how far the statements of Mr. Forlong, that the ryots in the indigo districts are contented and prosperous, are true. It is a most shameful falsehood. A hundredth part of the actual oppression has not been reported to the Commission. Even now traces of house-burning, plunder etc., many persons outcasted for the grossest outrages on their seraglios, innumerable rich men ruined to satisfy the unquenchable thirst for gain of the Planters, can be seen in the indigo districts. It is a truth when I say, that here females have been forced to break the clods in the indigo fields, in the absence of their husbands. Brahmins and Kayastas are not spared when coolies are wanting ; and wives and daughters are carried and confined in the godown, where they are of course treated with the greatest insolence that can be imagined, to compel the men to cultivate Indigo. One Ramtanu Adhikari, an inhabitant of the village whence I am writing this, was attacked in his house in the month of February by the Hajeepur Planter, Mr. Oates. Ramtanu fled, but the females could not ; at first the fury of the lattials fell upon the house and furniture, the former was demolished, the latter looted, when the females were arrested, deprived of their clothes and made to stand naked in the yard. I shudder to write the remainder of the tale. The man has been outcasted. The Adhikari brought a complaint against Oates before Mr. Skinner, (who I hear from this place is related to Mr. Oates) who lost no time in dismissing it. Another respectable family, the Shahs of Lautara suffered a few months ago similarly from Mr. Oates. Their houses were looted and burnt down ; a case

was also soon instituted which was as soon dismissed by Mr. Skinner. It would be foolishness on my part to attempt to write all, it is impossible. From my own personal observation I declare that, keeping aside the unprofitableness of the crop, there is scarcely any man here, rich or poor, virtuous or vicious, that have not suffered some such oppressions, independent of the indigo cultivation. Shame to the English Government, that in a manner winks at such tyrannical proceedings. Woe to their heavenly born religion.

The villages of Bakhri, Panamee, Serampore, Bogro, Ramchandrapore, Harishankapara, Durgapore etc. etc. have all formally combined to resist the attack of Mr. Oates, which they foresaw must ensue in the cutting season. The names of a few principal villages I have mentioned, but there are innumerable other minor ones under as great excitement ; in short, Mr. Oates has no very good prospects before him. He is obliged to measure and pay for the indigo bundles in the fields from which they are cut. This is not the only difficulty which he is labouring under. Fifty of his coolies brought with high promises from the south, have very lately fled with their hackeries ; and the number he has at present is very insufficient. His dewan, Obhoy Charan Majoomdar a prototype of his master, lately suffered a severe licking from the infuriated mob. I must leave Oates here, and begin with Oman of Bijlay where the *golemal* is the greatest.

Mr. Oman is considered by his ryots and the surrounding people as the most oppressive of all the planters, and consequently his concern is in great danger of being closed this year, unless assisted by Mr. Molony

with all the powers of a Magistrate. His dewan, Essan Chandra, at the beginning of this row, issued an order to cut down the bamboos of the disturbed villages, and to carry away their women should they refuse to cut the indigo plant. The first part of the order was executed by hundreds of Lattials with promptitude, but in the second they met with a check, and thus those who were at first wavering immediately joined the combination. Eshan Chandra has been since imprisoned by Mr. Taylor for 3 months with a fine of 100 Rs. The village of Soolkoppa is one of the largest in Bengal ; its male population alone is upwards of 8000, most of whom are tall bearded Mahomedans ; and Bishtoode, Ummedpore etc. are villages of considerable magnitude. Mr. Oman is to contend with 28 such *Moujahs*. He has commenced cutting but has succeeded *very little.*

The appearance of the dreaded Mr. Molony has produced a great sensation among the people ; they think that Government is determined to ruin them, or else why should it send a man whose greatest dishonesty will be passed over by his mere denial, in a district where lately he has acted more like a Planter himself than a Magistrate ? Yesterday a Ryot, (a mundol) asked my advice how they can manage themselves when *the Boro Patramara Saheb* has come again. My first question was who was *Boro Patramara.* It was Mr. Molony, and Mr. Skinner is the Choto Patramara Saheb. You understand what is *patra mara*, one who lives on another's (here Planter's) bounty. M. Editor, is this not a very appropriate name for them ? Mr. Molony has not as yet done anything important, and whatever he does will be reported to you.

The Meergunge concern is in the same state, the indignation of the Ryots against the very name of a Planter has not as yet cooled a bit. A rumour is afloat that 42 soldiers have been sent thither, but I am not sure of it. Mr. Mackenzie, the Magistrate of that quarter has, like Mr. Taylor, considerably changed. And with such Magistrates there is a great hope of our obtaining justice this time. Mr. Skinner is going to persecute Shishir Babu, but I repeat, let him remember Mr. Halliday no longer governs Bengal.

If I don't fall sick I shall inform you every particular more fully in the next week.

August 8, 1860.

Yours sincerely
M. L. L.

লোকমান্য তিলকের শ্রদ্ধাঞ্জলি

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন শিশিরকুমারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত। তিনি তাঁহাকে পিতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। শিশিরকুমারের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী সভায় (২৯-১২-১৯১৭) তিলক সভাপতির ভাষণে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন, তাহা দীর্ঘ হইলেও উদ্ধারযোগ্য ; তিনি বলেন :—

...I must say first that I had the pleasure and honour of being personally acquainted with Shishir Babu. I have learnt many lessons sitting at his feet. I revered him as my father and I venture again to say that he in return, loved me as his son....

To me, Shishir Babu figures as the pioneer of journalists in this country. After the Mutiny when he was only 15 years of age, came the establishment of the British Bureaucracy in this country—it was a despotic rule and the country wanted a man who would cope with their devices,—who would see the inner meaning of their devices,—who was courageous enough to meet them, bold and honest enough to expose them, and take defeat calmly and coolly in order to resuscitate for future strength. Such was Shishir Kumar Ghose. The "Patrika" is the manifestation of the spirit of which he was full—nobody may talk of the "Patrika" without being reminded of Shishir Kumar Ghose. At this time a man was required with a feeling heart to realise the position of the masses who were then governed by a despotic rule—one who must have sympathy with the people who were unjustly treated and did not know what to do but only looked up to heaven for help.

The people were dumb, bureaucracy had full power. The Mutiny had just been over and British Rule had been firmly established in the land. At such a time a man was required to steer the national ship to a safe harbour constitutionally and legally—a man of courage, a man who could see through the actions of the bureaucracy—actions which were calculated to bear fruit in the distant future.

It is a very difficult task now to criticise the Government—it was more so in those days and not only biting sarcasm but great resourcefulness, great courage, great insight and large sympathy was required to make honest journalism a success in the land. Shishir Babu had these qualities in abundance. The authorities feared him. They could not raise their finger to crush him. You have just now heard the story of Sir Ashley Eden who wanted to strike at him but could not. What was it due to ? It was not due to legal or any other protection—it was due to the character of the man which was his only protection. Sir Ashley feared not so much the writing of the man, but the character of the man who would persist in writing such things so long as the injustice was not removed. ...

Journalism—independent and free journalism—was not an easy task in those days—60 years ago, when many of you were charmed with Government Service. You looked upon such a man as rather eccentric—he might be independent, might be honest, but certainly not worldly. He had calmly to bear the reproaches of friends for having refused Government favours and other things that make life happy and easy. He stood alone and his conscience was his stand. He thought that he had a message to give to the world—he thought that he had a duty to do and he did it

unflinchingly. That was the man who led Bengal in the last decades of the 19th century. ...

These high ideals are out of the reach of the common people and the common people judge these men by their own standards, attribute to them motives which are foreign to them. Shishir Babu also had to face this and he did the work which can truly be called the work of an angel. He saw that the service of humanity was a stepping stone to the service of God. When he gave up, owing to physical feebleness, his work at the "Patrika" office, he devoted his time to the service of God with the same enthusiasm and fervour with which he did service to the people. Such was the man we have lost. ...

I know with what enthusiasm and eagerness the "Patrika" was awaited in my province every week 40 years ago. I know how people were delighted to read his sarcasm, his pithy and critical notes written in his racy style, simple but at the same time effective. How people longed to see the paper on the day it was due by post, how people enjoyed it—I know it personally. You in Bengal cannot know what we felt and thought in the Maharastra....I may further tell you that when we started our paper in vernacular, we tried to follow the editor of the "A. B. Patrika."...

Babu Shishir Kumar was a true political saint and I regret as much as you do that that kind of character is getting rare in these days, as it is bound to be by the demoralization of the despotic government. We thank God that we had such a man in the early years of journalism in India. He was a hero in the true sense of the word. He did not see his aspirations fulfilled. It might be fulfilled in a generation or two or more, but we cannot forget that it was he who laid the foundation. ...

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৮৭

অধরলাল সেন, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

অধরলাল সেন, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫৮

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
৭.২—২১।২।১৯৫২

অধরলাল সেন

১৮৫৫—১৮৮৫

বাংলা দেশের যে কয়জন সাহিত্যসেবীর উপর পরমহংসদেবের কৃপা হইয়াছিল, অধরলাল সেন তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ (মাঘী অমাবস্যা শুক্রবার) দ্বিপ্রহরে প্রথম দর্শনের পর ১৮৮৫ সনের জানুয়ারি মাসে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় এক বৎসর দশ মাস কাল অধরলাল রামকৃষ্ণ পরমহংসের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন; ইহার অনেক লিখিত বিবরণ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র পৃষ্ঠায় আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিতান্ত অকাল মৃত্যুর জন্য অধরলাল স্বয়ং পরমহংস-প্রসঙ্গ কিছু লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। পরমহংসদেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহাকে "আত্মীয়" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ সনের ১৮ই আগষ্ট তারিখে তিনি অধরের জিহ্বা স্পর্শ করিয়া ও সেখানে বীজমন্ত্র লিখিয়া দিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার বেনেটোলার (সভাবাজার) বাড়ীতে পরমহংস-দেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যোগাযোগ হইয়াছিল। 'কথামৃত'-পাঠক ও পরমহংস ভক্তদের কাছে অধরলাল সেন অত্যন্ত পরিচিত নাম।

বংশ-পরিচয় ঃ জন্ম

১২৬১ সালের ১৯এ ফাল্গুন (২ মার্চ ১৮৫৫) এক সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক্-পরিবারে অধরলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামগোপাল

সেন। রামগোপাল কলিকাতা আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীটে সুতার কারবার করিতেন; তাঁহার বসতবাটী ছিল সভাবাজার বেনেটোলায়।

বিবাহ ঃ বিদ্যাশিক্ষা

অতি অল্প বয়সেই অধরলালের বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বারো বৎসরে পদার্পণ করিলে রামগোপাল পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন; পাত্রীর বয়স তখন সাত।

অধরলালের ছাত্র-জীবন বিলক্ষণ উজ্জ্বল ছিল। তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; ক্যালেণ্ডারে তাহার বিবরণ এইরূপ :—

ইং ১৮৭১...এনট্রান্স, ১ম বিভাগ, ৮ম স্থান...হিন্দু স্কুল।
১৮৭৩...এফ. এ., ১ম বিভাগ, ৪র্থ স্থান...প্রেসিডেন্সী কলেজ।
Duff-বৃত্তি লাভ।
১৮৭৭...বি. এ., ১ম বিভাগ, ২১শ স্থান...প্রেসিডেন্সী কলেজ।

অধরলাল প্রেসিডেন্সী কলেজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহপাঠী ছিলেন।

রাজকার্য্য

চব্বিশ বৎসর বয়সে অধরলাল রাজকার্য্যে যোগদান করেন; ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি কলেক্টর-রূপে তাঁহাকে চট্টগ্রাম যাত্রা করিতে হয়। ১৮৮০ সনে যশোহরে এবং শেষে ১৮৮২ সনে তিনি কলিকাতায় বদলি হন। রাজসরকারে তাঁহার সুনাম ছিল।

১৮৮৪ সনে 'ফেলো' এবং ফ্যাকাল্টি-অব-আর্টসের সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিরও সভ্য ছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ

কলেজের ছাত্রাবস্থা হইতেই অধরলাল কাব্য-সরস্বতীর উপাসক। উনিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম রচনা 'ললিতা-সুন্দরী' সমালোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (শ্রাবণ ১২৮১) মন্তব্য করিয়াছিলেন :—"লেখক অতি তরুণবয়স্ক, আমরা জানিয়াছি।... উপস্থিত কাব্যে নবীনত্বের বিশেষ অভাব, কিন্তু দেখিয়া বোধ হয় বয়োবৃদ্ধি হইলে ইঁহার রচনা বিশেষ প্রশংসনীয় হইতে পারিবে।" স্বল্পায়ু জীবনে অধরলাল মাতৃভাষায় পাঁচখানি কাব্য ও ইংরেজীতে তথ্যমূলক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; সেগুলি—

১। **ললিতা-সুন্দরী,** ১ম সর্গ (কাব্য)। সম্বৎ ১৯৩১ (১৪ এপ্রিল ১৮৭৪)। পৃ. ৪৮।

১৮৭৮ সনে ইহার সহিত কয়েকটি খণ্ড-কবিতা যুক্ত হইয়া 'ললিতাসুন্দরী ও কবিতাবলী' (পৃ. ৪৮+১৬) নাম ধারণ করে। 'ললিতাসুন্দরী' ১৮৭০-৭৪ সনে ও 'কবিতাবলী' ১৮৭৮ সনে লিখিত।

২। **মেনকা** (গীতিকাব্য)। সম্বৎ ১৯৩১ (ইং ১৮৭৪)। পৃ. ৫১।

মূরের 'লাল্লা রূখ্' কাব্যের অন্তর্গত "প্যারাডাইজ এণ্ড দি পেরী" কবিতার অনুসরণে লিখিত।

৩। **নলিনী** (কাব্য)। সম্বৎ ১৯৩৪ (১৩ জুন ১৮৭৭)। পৃ. ৩২।

৪। **কুসুম-কানন** (কাব্য) :

১ম ভাগ। সম্বৎ ১৯৩৪ (৮ অক্টোবর ১৮৭৭)। পৃ. ৬৪।

২য় ভাগ। সম্বৎ ১৯৩৫ (২৩ এপ্রিল ১৮৭৮)। পৃ. ৫১।

১৮৮৩ সনে প্রকাশিত ২য় সংস্করণে সমগ্র গ্রন্থ একত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। **লিটোনিয়ানা** (কাব্য)। (৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০)। পৃ. ৮৩।

লর্ড লিটনের কতকগুলি কবিতার পদ্যানুবাদ।

৬। *The Shrines of Sitakund* in the District of Chittagong in Bengal. 1884, June, pp. 55.

১৮৮০ সনে শিবচতুর্দ্দশীর উৎসব উপলক্ষ্যে অধরলাল সীতাকুণ্ড পরিদর্শন করেন। এই সময়ে তিনি যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া পর-বৎসর ২রা মার্চ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই পুস্তকখানি সেই প্রবন্ধেরই সংস্কৃত রূপ।

মৃত্যু

১৮৮৫ সনের ৬ই জানুয়ারি অধরলাল মাণিকতলা ডিষ্টিলারি পরিদর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার বাঁ-হাতের কব্জী ভাঙিয়া যায়; ইহা হইতেই শেষে ধনুষ্টঙ্কার দেখা দেয়। আট দিন রোগ ভোগের পর ২ মাঘ ১২৯১ (১৪ই জানুয়ারি) সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৩০ বৎসর হইয়াছিল। এই

আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে পরমহংসদেব অনেক ক্ষণ ধরিয়া মা'র কাছে কাঁদিয়াছিলেন।

অধরলাল ও বাংলা-সাহিত্য

কবি সতীশচন্দ্র রায়কে স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "জীবনে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সফলতা লাভ করিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। কিন্তু যাহার মধ্যে সফলতার বীজ ছিল অথচ তাহা অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু যাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, তাহার সম্বন্ধে পরম দুঃখ এই যে, আমার দুঃখ সকলের দুঃখ হইয়া উঠিল না।" কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে অধরলাল সম্বন্ধেও আমাদের দুঃখ অনুরূপ। তথাপি তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তির যে মুদ্রিত পরিচয় আছে, তাহা হইতেই তাঁহার সফলতার সম্ভাবনা সহৃদয় পাঠক লক্ষ্য করিতে পারিবেন, এই ভরসায় কিছু নমুনা নীচে উদ্ধৃত হইল।—

'ললিতাসুন্দরী ও কবিতাবলী' :

৪

যে নারীর রূপ ভাবি মহেশ পাগল,
মধুকালে নিধুবনে কেশব বিকল,
বাজে আজো ব্রজপুরে রাধা রাধা রব,
যমুনা লহরী খেলে—প্রণয়-উৎসব ;
শোনা যায় দূরদেশে নূপুরের ধ্বনি ;
উজলে কদম্বতলে চারু চূড়ামণি ;
নাহি তথা কালাচাঁদ, বাজিছে বাঁশরী,
কুহরে কোকিলকুল, "কোথা প্রাণেশ্বরী !"

দেখা যায় শ্যামরূপ শশীর কিরণে,
প্রেম অভিমান যেন সাধেন চরণে ;
সেই রমণীর রূপ চির শোভাময়,
উজল লাবণ্যরাশি, পূর্ণচন্দ্রোদয় ; (পৃ. ৫-৬)

'মেনকা' :

৮৯

কি প্রভাত আজি ভারতে উদয়,
কি প্রভাত আজি মানসে উদয়,
এমন সরেস নাহিক আর !
প্রাচীতে উদয় নবীন রবি,
হৃদয়ে উদয় নবীন রবি !
নাহিক ধরায় অন্ধকার আর,
নাহিক হৃদয়ে কোন পাপ আর ;
উজল হয়েছে বসুমতী ধাম,
উজল হয়েছে হৃদয়াগার !

৯০

তদবধি নাহি দস্যু রত্নাকর,
হয়েছে বাল্মীকি মহামুনিবর,
জটাজুটশির প্রশান্তমুখ ;
সতত বদনে—"যোগেশ জয়,
পতিতপাবন করুণাময়" ;
প্রসন্ন মুরতি, নিটোল গঠন,
রসনায় বেদ, বাকল বসন

স্নেহের নিলয় যুগল লোচন,
হৃদয়ে সতত পরম সুখ।

৯১

তদবধি সেই বিজন কাননে
হরিণ হরিণী হরষিতমনে
বিহরে সতত নাহিক ভয় ;
কুসুম সুবাস বিতরে লতা,
তরু পরিহরে পথের ব্যথা।
তদবধি সেই বিজন কানন
বাল্মীকি মুনির হ'ল তপোবন,
নাহি হত্যা হিংসা, নাহি কোন পাপ
সে সব সেখানে পাইল লয়।

৯২

সে বিজন বনে বসিয়ে যখন
করিতেন মুনি দেব আরাধন,
নীরব নিস্তব্ধ থাকিত সবে ;
বহিত না বায়ু বেগের ভরে,
পড়িত না পাতা শবদ ক'রে,
সিংহের শাবক বিস্মিত নয়নে
চাহিয়ে দেখিত তাঁহার বদনে,
হরিণ হরিণী স্থির হয়ে দোঁহে
সুদূরে দাঁড়ায়ে থাকিত তবে।

১৩

গুণ্ গুণ্ রব ত্যজি মধুকর,
ত্যজি মধুময় কুসুম নিকর,
নীরব নিস্তব্ধ মোহিত প্রায়।
ঝুরু ঝুরু করি সমীর ধীরে
চূতের মঞ্জরী বরষে শিরে।
সুমধুর স্বরে করি কল কল,
পবিত্র সলিলা তমসার জল,
পরশি দস্যুর পবিত্র চরণ,
পবিত্র হইয়ে চলিয়ে যায়!

'নলিনী':

১৪

কোথায় সে প্রেম? কাল সব ফক্কিকার!
বাজে কি শ্যামের বাঁশী যমুনার তীরে?
আঁধার, আঁধার মন, আঁধার, আঁধার!
চলে যাই দুই জনে, চাই ফিরে ফিরে!
সে প্রেম কোথায়?
ভালবেসে পরিশেষে কিবে সুখ হ'ল?
তামাসা ফুরায়ে গেল, হৃদয় শ্মশান হ'ল,
চক্রবাক, চক্রবাকী কাঁদে উভরায়,
বাজে 'হায়! হায়! হায়!'

১৫

দাঁড়া'য়ে বিষাদে শেষে দুপারে দুজনে,
মাঝে বয় কুলুস্বরে বিরাগের নদী,
অভিমান ম্লানমুখে দাঁড়া'য়ে পিছনে,
জ্বলিবে, দাঁড়া'বে কিম্বা পার হ'বে যদি।
উদ্দেশে দোঁহার*
প্রসারিব কর আর করিব চুম্বন,
পবনেতে আলিঙ্গন, পবনেতে সম্মিলন—
চারি দিক সে বিষাদে করে হাহাকার,
ওরে নলিনি আমার। (পৃ. ৮)

'কুসুম-কানন' :

এখনও নীরব নহে

... ...

জীবন-মরণ যদি নিদ্রা-জাগরণ,
হয় না তা হ'লে কেন অনন্ত মরণ ?
জনম-মন্তন, হায়, ভুলিব তা' হ'লে
হৃদয়ের অনির্ব্বাণ অনন্ত-জ্বলন।

ভুলিব তা' হ'লে মম সুখসরোবরে
দুলিত কিরূপে ফুল্ল কবিতা-কমল,
বাসনা-সমীরে আর আশার সৌরভে
কোন্ ভাবে ভ্রমিতাম পীযূষ-চপল।

* "We stand on either side the sea," etc.—Swinburne.

ভুলিব তা' হ'লে মম যৌবন কাননে
কিরূপে উঠিল এক কামিনী-কণ্টক,
নাশিল কোমল মম সুখের লতায়,
করিল আমার মনে বিকট নরক।

ভুলিব তা' হ'লে সেই প্রিয়সখাগণে,
যা'দের প্রণয়মণি হৃদয়-আকর
আঁধারি, গিয়েছে চুরি কালের করেতে,
উজ্জল করিতে, হায়, ত্রিদিব-নগর।

এস সবে প্রাণসম প্রিয় সখাগণ,
একবার তোমাদিগে হৃদয়েতে ধরি।
আয় রে শৈশবকাল সুখের সময়,
আয় রে বারেক তো'রে আলিঙ্গন করি।

তখন ক'জনে মিলে হৃদয়ে হৃদয়ে
কি সুখেই কেটে যেত সুখময় দিন!
কি সুখের মদিরায় ছিলাম মগন,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমে করিয়ে বিলীন!

কবিতায় ভাসমান পরাণ-নিকর,
তোমাদেরই রাগে ছিল এ চিত রঞ্জিত;
জীবনে মরুভূমে শ্যাম ওয়েসিস,
জুড়ায়েছ শান্তিদানে হৃদয় তাপিত।

আসিব না আর আমি তোমাদের কাছে
শুনাইতে হৃদয়ের বিষাদের গান ;
চাহিব না স্নেহজল প্রণয়ের কর,
দূরদেশে নিবে' যা'বে আমার পরাণ।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী যোগশাস্ত্রী

?—১৯০৩

কয়েকখানি উপন্যাস প্রহসন বা নাটক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি আজ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তীকে স্মরণ করিতে বসি নাই, বাস্তব-ইতিহাসের সহিত উপন্যাস-কল্পনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহার জীবনী লিখিতেছি না,—বাংলা-সাহিত্যের প্রতি যে সুগভীর অনুরাগ তাঁহাকে প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী করিয়াছিল তাহাই স্মরণ করিয়া তাঁহাকে আজ সর্ব্বসাধারণের কাছে পরিচিত করিতে বসিয়াছি। কালের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার উপন্যাস-নাটক টিকে নাই, কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তিনি টিকিয়া আছেন। তাঁহার জীবনীর উপকরণ যৎসামান্য পাওয়া গিয়াছে; যেটুকু পাইয়াছি সেইটুকুই পাছে হারাইয়া যায় এই ভয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই ধরিয়া রাখিতেছি।

সাহিত্যানুরাগ

পঠদ্দশা হইতেই মাতৃভাষায় ক্ষেত্রপালের গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭৩ সনে যখন তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসের ছাত্র, তখন হইতেই গ্রন্থকার-রূপে তিনি আত্মপ্রকাশ

করেন।* সেকালের বহু খ্যাতনামা পত্রিকা—'বান্ধব,' 'সহচরী,' 'বঙ্গমহিলা' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় তাঁহার রচনা গৃহীত হইয়াছে। তিনি প্রতিভাশালী কথা-সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা যোগ সমাজ

১৮৮৬ সনে ক্ষেত্রপাল এক দিন ছায়ামূর্ত্তি দেখেন; ইহার অব্যবহিত পরেই পরিবারে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। ইহা হইতেই পরলোকতত্ত্বের আলোচনায় তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়। তিনি যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে হিন্দুধর্ম্ম, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। The Calcutta Psycho-religious Societyর তিনিই প্রতিষ্ঠাতা; ইহাই কিছু দিন পরে Sri Chaitanya Yoga Sadhan Somaj নামে খ্যাত হয়। মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব এই সমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালীকে বিশেষ অগ্রসর দেখিয়া, ১৮৭২ সনে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর জন্ বীম্স বঙ্গদেশে

* "He began efforts as an author when he was only in the first Year Class of the Calcutta Presidency College. Commencing in 1873 he wrote a series of interesting novels in the Vernacular, which earned for him the reputation of being 'one of the best writers of the day'."—Preface : *Lectures on Hindu Religi n...*

একটি সাহিত্য-সমাজ স্থাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন; প্রস্তাবিত সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে—"consolidating the language and giving it a certain uniformity, or in short, for creating a literary language." বীম্‌সের এই প্রস্তাব সুধী সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল* সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। ১৮৮১ সনে ক্ষেত্রপালই প্রস্তাবটি অনুসরণ করিয়া সাময়িক-পত্রাদিতে আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহার নিজেরই ভাষায়—"In 1881 ...while in temporary charge of one of the leading vernacular periodicals of the time, contributed a leader in which he discussed the usefulness of forming such an academy as had been advocated by Mr. Beames." তদবধি কৃতকার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার চেষ্টার বিরাম ছিল না।

১৩০০ সালের ৮ই শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩) সভাবাজারের মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে ও আশ্রয়ে ক্ষেত্রপাল অভীপ্সিত 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' প্রতিষ্ঠিত করেন। বিনয়কৃষ্ণ ইহার সভাপতি এবং ক্ষেত্রপাল সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

"এক দিকে ইংরাজি সাহিত্যের, এবং অন্য দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন, সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল।...সভার কার্য্যবিবরণাদি ইংরাজি ভাষাতে লিপিবদ্ধ হইত, এবং দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার নামক মাসিক পত্রিকাখানির অধিকাংশ ইংরাজিতেই লিখিত হইত। একাডেমি অব লিটারেচারের কার্য্যকলাপে এইরূপ ইংরাজিবহুলতা দেখিয়া কতিপয় সভ্য আপত্তি করেন, এবং জাতীয়-সাহিত্যানুরাগী কোন কোন

* "বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ" : 'বঙ্গদর্শন,' আষাঢ় ১২৭৯ দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তি প্রতিবাদও করিতে থাকেন। একাডেমি অব লিটারেচার এই নাম সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি-সূচক কথা উপস্থিত হয়। এই হেতু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম. এ., সি. এস. মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে একাডেমি অব লিটারেচারের প্রতিশব্দস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নাম পরিগৃহীত হয়। তন্নিমিত্ত সভার পত্রিকাখানি দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এই উভয় আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বাহির হইতে থাকে। ফল কথা, ইংরেজি-বহুলতার নিমিত্ত আপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায়, এবং দেশীয় ভাবে দেশীয় সাহিত্যালোচনার আবশ্যকতা ক্রমশঃ বুঝিতে পারায়, বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারকে পুনর্গঠিত করিয়া নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে অনেকে ইচ্ছুক হইয়া উঠেন।...সভ্যগণ পূর্ব্বোক্ত স্থানে ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ [২৯ এপ্রিল ১৮৯৪] রবিবার অপরাহ্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার, বর্ত্তমান ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নামে অভিহিত করেন।"*

পুনর্গঠিত পরিষদের সহিত ক্ষেত্রপালের কোন যোগসূত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার কারণ বোধ হয় জাতীয়-সাহিত্যানুরাগীদের সহিত তাঁহার মতভেদ।†

যত দিন বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার বিদ্যমান ছিল, ক্ষেত্রপাল অতীব যোগ্যতার সহিত তাহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তিনি শুধু সভার সম্পাদকই ছিলেন না, সহকারী সভাপতি—লিওটার্ড ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরামর্শ অনুসারে সভার

* পরিষদের ১ম বার্ষিক বিবরণী।

† এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর পত্রের উত্তরে তাঁহার বিবৃতি দ্রষ্টব্য (*The Bengal Academy of Literature*, February 1894, pp 5-6.)

মুখপত্রখানিও সম্পাদন করিতেন। *The Bengal Academy of Literature* পত্রের ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—আগস্ট ১৮৯৩; ৮ম সংখ্যা (১৭ মার্চ ১৮৯৪) হইতে ১১শ বা শেষ সংখ্যা (৯ জুন ১৮৯৪) পর্য্যন্ত ইহা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। The Bengal Academy of Literature' এই নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে মুদ্রিত ক্ষেত্রপালের ইংরেজী-বাংলা রচনার মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য :—

Dramas among the Bengalis…৩য়, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা (সমালোচনা)…১১শ সংখ্যা।

শেষোক্ত প্রবন্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন :—

"পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ১২৯৯ সালের 'অনুসন্ধান' নামক পাক্ষিক পত্রে "বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা" নামক একটি প্রবন্ধ খণ্ড২ করিয়া প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটি তিনি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" সম্পাদককে সমালোচনার জন্ত প্রদান করেন। তাঁহারই ইচ্ছামত এই প্রবন্ধটি আমি সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

রচনায় অরাজকতা ঃ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রথমেই লিখিয়াছেন "আজ কাল বাঙ্গালা ভাষায় অরাজকতা প্রবেশ করিয়াছে," এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ কহিয়াছেন, "আজ কাল অধিকাংশ লেখক ব্যাকরণ ত অগ্রাহ্য করেন," অভিধানও তাঁহাদিগের নিকট উপেক্ষিত। সুতরাং সাহিত্যে তাঁহাদের বাহ্যভাবে আস্থা থাকিলেও, কার্য্যতঃ সাহিত্য তাঁহাদের নিকট অনাদৃত হইতেছে। বিশুদ্ধ রীতিসঙ্গত রচনার বিরহে সাহিত্য বিকলাঙ্গ হইয়া যায়।

পূর্ব্বোক্তরূপ শ্রেণীর লেখক সাহিত্য-সমাজে যে কখনই সম্মানিত হইবেন এরূপ আশা করি না; অতএব তাঁহাদিগের উল্লেখ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখি না। তবে যদৃচ্ছাচারিতা-দোষ কিয়ৎ পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষাকে দূষিত করিয়াছে, যথা ইংরাজীমত বাঙ্গালা ভাষার গঠনপ্রণালী অনেক স্থলে দেখা যায়, এবং গ্রাম্য ও সংস্কৃত শব্দের সকলের এক স্থলে প্রয়োগে ভাষার সৌন্দর্য্য একবারে বিনষ্ট হয়, দৃষ্টান্ত যথা—শৈবলিনী "আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশরাশি চিরুণী দিয়ে আঁচ্‌ড়াচ্ছেন।"

বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা: বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতির বাঙ্গালায় আদি রচনাসকল, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রায়-গুণাকরের অন্নদামঙ্গল ও কাশীদাসের মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থসকল বাঙ্গালা ভাষার উষাকাল প্রকাশ করে। অতি শৈশব অবস্থায় কোন ব্যক্তির বাল্য বা যৌবনের কান্তি যেরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না, কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে কোন ভাষার গঠনপ্রণালী স্থিরীকৃত হয় না। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত গঠনপ্রণালী স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহাশয়গণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্র অস্বাস্থ্যকর পতিতভূমি ছিল, ক্রমশঃ কয়েক জন জ্ঞানবান, সুদূরদর্শী ব্যক্তির যত্নে ও পরিশ্রমে উহা এইক্ষণে হৃদয়তোষিণী শস্য-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পতিতভূমি হল-সংমিলনে যে প্রচুর পরিমাণে ফলবতী হইবে তাহা প্রকৃতি-সিদ্ধ, এবং উহাতে যে প্রচুর পরিমাণে অপ্রয়োজনীয় কণ্টকীবৃক্ষ জন্মিবে তাহাও অনিবার্য্য। সম্প্রতি প্রয়োজনীয় বিষয়সকলের সংবর্দ্ধন ও অপ্রয়োজনীয়

এবং অমঙ্গলকর বিষয়ের নিকাশন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কিয়ৎ পরিমাণে

ভাষার একরূপকতা সংস্থাপন করা আবশ্যক। পণ্ডিতেরা রসভেদে বর্ণ, সমাস, সন্ধি প্রভৃতির প্রয়োগের আদেশ ও নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন সময়ের সংস্কৃত লেখকগণের ভাষার একরূপকতা সংরক্ষিত হইয়াছে। এই একরূপকতা সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষ ও বিশেষ সম্মানের অন্যতম কারণ। তাঁহারা যে সকল সুনিয়ম সংস্থাপন এবং পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ সেই সকল অনুকরণ করিয়া ভাষার একরূপকতা সংরক্ষণ করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় সেই সকল নিয়মের উপযোগিতা লক্ষিত হয়।

ভাষার উৎকর্ষ : বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবার নহে, ব্যক্তিগত যত্নে সংসাধিত হওয়া দুরূহ। দেশীয় অধিকাংশ সমালোচকগণ পক্ষপাতশূন্য নহেন, এরূপ অবস্থায় "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" ন্যায় কয়েকটি সাহিত্য সভা সমিতি কর্ত্তৃক উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। সকল ভাষার স্ব২ গঠনপ্রণালী আছে, একের গঠনপ্রণালী অপরে সন্নিবেশ করিলে দেশীয় মূর্ত্তি সংরক্ষিত হয় না। যাহাতে যদৃচ্ছাচারিতা-দোষসকল দূর হয় এবং একরূপকতার সংস্থাপন হয় তাহা বিবেচনা করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

অপর দোষসকল : পূর্ব্বোক্ত দোষসকল ভিন্ন অপর কতকগুলি দোষ সর্ব্বদা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। স্থানীয় সমাজিকতা, স্থানীয় ভূগোল, স্থানীয় ইতিহাসের অনভিজ্ঞতাই উক্ত দোষসকলের কারণ। বাঙ্গালা সমাজিকতা

রাজপুতনায় প্রয়োগ, হুগলী নগরীতে উজ্জয়িনী ভ্রম, বিন্ধ্যাচলের প্রাকৃতিক মূর্ত্তি হিমালয়ে অর্পণ, ইংরাজ স্বাধীনতা, পরাধীন বাঙ্গালীর সংসারে সংঘটন প্রভৃতি দোষসকল সচরাচর লক্ষিত হইতেছে।

বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন "বাঙ্গালা ভাষা কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃতের অনুসারিণী, কোন কোন বিষয়ে ইংরাজীর অনুগতা, কিন্তু সর্ব্বাংশে সংস্কৃত বা ইংরাজীর কখন অনুযায়িনী নয়। বাঙ্গালা অনেকটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাষা।"

বাঙ্গালা ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন হওয়া উচিত, কিন্তু ইহা বলিয়া আমরা উহাকে ইংরাজীর অনুগতা হইতে উপদেশ দি না। ভাষার গঠনপ্রণালী উহার বাহ্য সৌন্দর্য্য, সত্যপ্রকাশ উহার আভ্যন্তরিক শোভা ও সম্পত্তি। এই আভ্যন্তরিক সম্পত্তির জন্য আমরা উহাকে বহু স্থানে ভ্রমণ ও বহু জাতির আচার-ব্যবহার দর্শন করিবার জন্য স্বাধীনতা দিতে পারি; কিন্তু উহাকে বিদেশীয় পরিচ্ছদে বা বিদেশী হাবভাবে সুন্দরী দেখিতে চাহি না।

আমরা এ স্থলে ব্যক্তিগত ভাষার উল্লেখ করিতে চাহি না। লোকসকল সর্ব্বদা বিভিন্ন রুচি সম্পন্ন, সুতরাং রুচিভেদে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাষা তাঁহার নিজেরই থাকিবে। তবে বঙ্গভাষার একরূপকতা সাধনের জন্য দুই চারিটি সাধারণ নিয়মের এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক।

১। ভাষার সরলতা: রচনা সর্ব্বদা সরল ও প্রাঞ্জল হওয়া উচিত। কঠিন ভাষা ও দীর্ঘ রচনা কাহারও প্রীতিকর নহে।

২। রচনা বিশেষে ভাবের গভীরতা: ভাবের গাম্ভীর্য্য প্রার্থনীয়; কিন্তু গাম্ভীর্য্য প্রার্থনীয় হইলেও অস্পষ্টতা প্রার্থনীয়

নহে। কোন রচনায় ভাব অস্পষ্ট থাকিলে লেখকের বিজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া উহা বিপরীত প্রতিপাদন করে। পূর্ব্বের লেখকগণ ভাবের অস্পষ্টতা ও দীর্ঘ সমাস ও সন্ধি সমাচ্ছাদিত রচনা সকলকে অলঙ্কারস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। এখন সে রুচির এককালে পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৩। নূতনত্ব : সামান্য বিষয় লইয়া নূতন ভাবের আবির্ভাব করা সুকল্পনার অধিকৃত। উহা সাধারণে প্রাপ্য নহে এবং উহাই লেখককে সাহিত্যে উচ্চ স্থান প্রদান করে।

৪। রচনার উপকারিতা : যে রচনা সুচিন্তা বা সুকল্পনা প্রসূত নহে অর্থাৎ যাহাতে লেখক ও পাঠক উভয়েরই বিশেষ উপকার দৃষ্ট না হয়, সেইরূপ রচনা নিষ্ফল। উহা জলবিম্ব সদৃশ একবার দেখা দিয়া সময়-স্রোতে বিলীন হয়।

বিদ্যানিধি মহাশয় বর্ত্তমান রচনার ব্যাকরণগত অশুদ্ধি লইয়া বিস্তর বিচার করিয়াছেন, সে সমরক্ষেত্রে অসি ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া আমরা উপস্থিত হইতে প্রস্তুত নহি। যাহা হউক বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার উপস্থিত অবস্থা সমালোচনা করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে সুচিন্তা ও বিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। সময়ে সময়ে এরূপ আলোচনা না হইলে দুষ্ট বেগগামী অশুদ্ধ ভাষা-স্রোত ভাষার একরূপকতার ধ্বংস করে।"

গ্রন্থাবলী

ক্ষেত্রপালের রচিত গ্রন্থগুলির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। আমরা সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি; বন্ধনী-মধ্যে সাল-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা বঙ্গীয় সরকারের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **চন্দ্রনাথ** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ১৮৮।

"আমাদিগের দেশে ধনের কিরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা দর্শান চন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য। অযথা ধন প্রয়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহাতে কয়েকটি বিষয় সমাজোপযোগী ঘটনা-প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।"

উপন্যাসখানি পরে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া সেকালের গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

২। **হীরক অঙ্গুরীয়ক** (প্রহসন)। সম্বৎ ১৯৩১ (১৮ জানুয়ারি ১৮৭৫)। পৃ. ৩২।

৩। **হেমচন্দ্র** (বিয়োগান্ত নাটক)। সম্বৎ ১৯৩২-৩৩ (১০ অক্টোবর ১৮৭৬)। পৃ. ৫১।

৪। **মুরলা** (উপন্যাস)। ? (১৯ জুন ১৮৮০)। পৃ. ৯৪ + ১ শুদ্ধিপত্র।

"এই উপন্যাসের প্রথম চারি পরিচ্ছেদ পূর্ব্বে বঙ্গমহিলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন স্ত্রী-শিক্ষামাত্রই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত

পত্রিকার প্রচার রহিত হইলে, সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য সত্য, প্রেম (স্নেহ ভক্তি ও প্রণয়), দয়া ও ক্ষমা এই চারিটি বিষয় অবলম্বন করিয়া সামাজিক ঘটনাকারে বর্ণিত হইল।"

৫। **মধুযামিনী ও কৃষ্ণা বা কলিকাতা শতাব্দী পূর্ব্বে** (উপন্যাস)। ১২৯২ সাল (২৩ জানুয়ারি ১৮৮৬)। পৃ. ৯৫।

ক্ষেত্রপাল ইংরেজী ভাষাতেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেকালের বহু ইংরেজী সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার রচনার সন্ধান মেলে। আমরা তাঁহার এই কয়খানি ইংরেজী গ্রন্থ দেখিয়াছি :—

1. *Lectures on Hindu Religion, Philosophy and Yoga.* 1893. pp. 158.

ইহাতে এই আটটি বক্তৃতা আছে :—1. Spirit Worship of Ancient India ; 2. Patanjal Yoga Philosophy ; 3. Early Tantras of the Hindus : The Religious Aspects of the Tantras. The Medical Aspects of the Tantras ; 4. Some Thoughts on the Gita ; 5. Raj Yoga ; 6. Chandi ; 7. Tatwas : what they may be. এই বক্তৃতাগুলি ১৮৮৯ ও ১৮৯৩ সনের মধ্যে যোগ সমাজের অধিবেশনে পঠিত ও 'ষ্টেট্‌সম্যান,' 'ইণ্ডিয়ান মিরার,' 'ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিক ওপিনিয়ন,' 'থিয়সফিষ্ট' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দুদর্শন, মনোবিজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের ফলে—রচনা-মাধুর্য্যেও বটে, নীরস বিষয়ও তাঁহার লেখনীতে সরস ও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থপ্রকাশক—বাগবাজার হরি-সভার সহ-সম্পাদক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় স্বীয় বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকারের কৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন।

2. *Sarala* and *Hingana* (Tales descriptive of Indian Life). 1895. pp. 126.

3. *Life of Sri Chaitanya.* 1897. pp. 12.
১৮৯৭, ১৭ই মার্চ তারিখে শ্রীচৈতন্ত যোগ সমাজের ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা ; অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত।

মৃত্যু

১৯০৩ সনের ফেব্রুয়ারি (মাঘ ১৩০৯) মাসে ক্ষেত্রপালের মৃত্যু হয়। পরিষদের আদি প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান হিসাবে পরিষৎ-মন্দিরে তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৮৫৮—১৯০১

কালের কি বিচিত্র গতি! উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসমালা বাঙালী গল্প-পিপাসু পাঠক-সমাজকে মুগ্ধ ও আন্দোলিত করিয়াছিল, বাংলার অন্তঃপুরের সহস্র সহস্র পাঠিকার অবসর-বিনোদনের সঙ্গী হইয়াছিল, আজ মাত্র চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে আমরা তাঁহার নামমাত্র আর শুনিতে পাই না। কালের নিকষে যোগেন্দ্রনাথের রচনা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একদা সাময়িকভাবে সেগুলি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া বাংলার সাহিত্য-সাধক-সমাজে তাঁহাকে আজ আমরা স্মরণ করিতেছি। সাময়িকপত্র-জগতে যোগেন্দ্রনাথের 'কল্পনা' স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহার সম্বন্ধে ইহাও স্মরণীয়।

বংশ-পরিচয় : জন্ম

১২৬৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৫৮) মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাণ্ডা গ্রামে মাতুলালয়ে যোগেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম—গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যোগেন্দ্রনাথ যখন ছয় মাসের শিশু, সেই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।

বিদ্যাশিক্ষা

যোগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় পিতৃব্য প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চাঁপাতলার বাসায় থাকিয়া নয় বৎসর বয়সে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্দ্ধমান মহারাজার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে প্রবেশ করিয়া এফ. এ. শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ

পঠদ্দশা হইতেই যোগেন্দ্রনাথের মাতৃভাষায় প্রবল অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি সাময়িকপত্র পরিচালনে ব্রতী হন। তাঁহার পরিচালিত তিনখানি সাময়িকপত্রের কথা আমরা জানি ; সেগুলি—

'সুধাকর'ঃ পাক্ষিক সংবাদপত্র, ১২৮৪ সালের ভাদ্র (১৮৭৭, আগষ্ট) মাসে প্রকাশিত হয়। 'সুধাকর' প্রকাশ করেন যোগেন্দ্রনাথ ; সম্পাদক-হিসাবে নাম ছিল হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

'কল্পনা'ঃ মাসিক পত্র ; ইহাও যোগেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ; সম্পাদন করিতেন হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬ষ্ঠ বর্ষের (১২৯৬ সাল) পত্রিকায় সম্পাদকরূপে যোগেন্দ্রনাথেরই নাম মুদ্রিত হইয়াছে।

'অবকাশ'ঃ ১২৮৮ সালের মাঘ (ইং ১৮৮২) মাসে কল্পনা-কার্য্যালয় হইতে যোগেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এই নামের একখানি "নবন্যাসপূর্ণ মাসিকপত্র" প্রকাশিত হয়।

যোগেন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কথাশিল্পী ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির সংখ্যা বড় কম নহে। আমরা যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, তাহার একটি তালিকা দিলাম। বন্ধনী-মধ্যে সাল-তারিখ সহ ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। **প্রেম প্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা** (উপন্যাস)। (২ মে ১৮৮৬) পৃ. ১৩৬।

২। **প্রণয় পরিণাম** (সামাজিক উপন্যাস)। ১২৯৪ সাল (১ নবেম্বর ১৮৮৭)। পৃ. ১৬৬।

ইহার আখ্যানভাগ অবলম্বনে 'প্রণয় না বিষ বা রমা পাগ্‌লা' নাটক রচনা করিয়া অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৩ ডিসেম্বর ১৯০৫ তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করেন। ১৩১৪ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'প্রণয় পরিণামে'র পঞ্চম সংস্করণটি "পরিবর্দ্ধিত"।

৩। **ভণ্ড দলপতি দণ্ড** (প্রহসন)। ১২৯৪ সাল (৬ এপ্রিল ১৮৮৮)। পৃ. ১৬।

"বীণা রঙ্গভূমিতে অভিনীত"।

৪। **দুই বন্ধু**। ১২৯৫ সাল (২০ আগষ্ট ১৮৮৮)। পৃ. ২৪।

৫। **ফুলের সাজি**, ১ম ভাগ। ১২৯৭ সাল।

পাঁচখানি উপন্যাসের সমষ্টি :—প্রেমদাস (পৃ. ৬০), দুই বন্ধু (পৃ. ২৪), প্রেমময়ী (পৃ. ২৪), সরলা (পৃ. ২৪) ও কেরাণী জীবন (পৃ. ৩৩)। এগুলির প্রত্যেকটি পূর্ব্বে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৬। **ক'নে-বউ** (সামাজিক উপন্যাস)। আষাঢ় ১২৯৭।

৭। **লীলাময়ী** (সামাজিক উপন্যাস)। ১২৯৮ সাল। পৃ. ৯৬।

৮। **বিমাতা** (সামাজিক উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩০০। পৃ. ১৮৭।

৯। **স্ত্রী ও স্বামী** (সংসার-চিত্র)। ১৩০১ সাল। পৃ. ৬০।

১০। **বড় ভাই** (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩০১ সাল (১ নবেম্বর ১৮৯৪)। পৃ. ১৮৮।

১১। **কলঙ্কিনী** (সমাজ-চিত্র)। ১৩০২ সাল।

১২। **আমাদের ঝি** (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩০২ সাল। পৃ. ৯২।

১৩। **রমাবাই** (উপন্যাস)। ১৩০২ সাল। পৃ. ৪৮।

১৪। **পঞ্চ-প্রদীপ** (গল্প-সমষ্টি)। ১৩০২ সাল। পৃ. ৯১।
সূচী : আমার, ফুলকুমারী, সূর্য্যমুখী, একটি ক্ষুদ্র গল্প, অমরনাথ।

১৫। **উন্মাদিনী** (সামাজিক গল্প)। ১৩০৩ সাল। পৃ. ৪৮।

১৬। **গল্প-গুজব** (গল্প-সমষ্টি)। ১৩০৫ সাল (২ ডিসেম্বর ১৮৯৮)। পৃ. ১২২।
সূচী : সাবিত্রী কি অসতী ?, জীবনে বোকা, টাকার গাছ, মানবী না দানবী ?, দুই সই, যোগমায়া।

১৭। **প্রসন্নকুমারের উইল** (উপন্যাস)। ১৩০৬ সাল (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ১৭০।

১৮। **উপন্যাসলহরী**। ১৩০৭ (?) সাল। পৃ. ১০৪।
সূচী : সংগ্রাম, প্রেমের জয়, লজ্জা, বিমলার বিবাহ, যামিনী।

১৯। **চা-কুলীর আত্ম-কাহিনী** (সত্যঘটনা-মূলক উপন্যাস) ১৩০৮ সাল (৩ নবেম্বর ১৯০১)। পৃ. ১৪০।

২০। **জঙ্গলী মেয়ে** (উপন্যাস)। (৩০ অক্টোবর ১৯০২)। পৃ. ১৪৬।

২১। **প্রতিশোধ** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ১৩১০ সাল (১৬ অক্টোবর ১৯০৪)। পৃ. ২২৬।

২২। **সংসার চিত্র**। (৮ অক্টোবর ১৯০৫)। পৃ. ৩১২।

সূচী : খুকীর বর, কেরাণী জীবন, ভালবাসা, সুখের সংসার, অমর ও সমর, আমার, বিমলার বিবাহ, যামিনী, ফুলকুমারী, সংগ্রাম, লজ্জা, সাবিত্রী কি অসতী ?, বন্ধু বটে, রাজলক্ষ্মী, থিয়েটার, জীবনের ভুল, সংসার-গৃহিণী, শেষ কথা।

২৩। **সমাজ-চিত্র**। ১ বৈশাখ ১৩১৩ (৮-৬-১৯০৬)। পৃ. ২৩৬।

সূচী : লীলা, সূর্য্যমুখী, প্রেমের জয়, বাল-বিধবার সুখ, বিষময় ফল, সতীর স্বর্গারোহণ, কনক-লতা, মানবী না দানবী, হরগৌরী মিলন।

২৪। **পাহাড়ী বাবা** (উপন্যাস)। ১ আশ্বিন ১৩১৩ (২৫-১২-১৯০৬) পৃ. ২৩০।

২৫। **খুড়ী-মা বা প্রায়শ্চিত্ত** ('ক'নে বউ'এর উপসংহার)। ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩১৩ (৫-১-১৯০৭)। পৃ. ২৩৮।

২৬। **অলৌকিক চিত্র**। ১ ফাল্গুন ১৩১৩ (২ মে ১৯০৭)। পৃ. ২৩৬।

সূচী : যোগমায়া, প্রেমদাস, জীবনে বোকা, রাক্ষস গণ, দুই সই, টাকার গাছ, কাম না প্রেম, রমাবাই, শ্মশানে সন্ন্যাসী।

২৭। শোভাসিংহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ (ইং ১৯০৮)। পৃ. ২৮০।

এগুলি ছাড়া যোগেন্দ্রনাথের আরও দুইখানি উপন্যাস—'ঠাকুর-ঝি' ও 'বউদিদি'র উল্লেখ পাইয়াছি।

মৃত্যু

১৯০৯ সনের ২৯এ ফেব্রুয়ারি (১৬ মাঘ ১৩১৫) যোগেন্দ্রনাথ, ৫১ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'জন্মভূমি' দীর্ঘ শোক-সংবাদ লিখিয়াছিলেন; উহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনের আর একটি নক্ষত্রপাত হইয়া গেল। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে অকস্মাৎ ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন।...তাদৃশ উদার প্রকৃতি সহৃদয় বন্ধুবৎসল পরোপকারী নির্ম্মলস্বভাব সজ্জন বন্ধু অধুনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।...জাতীয় সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকাতে তিনি ক্রমান্বয়ে ২৪ খানি উপন্যাস পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, সকলগুলিই সুপাঠ্য, বিশেষতঃ 'ক'নে বউ' ও 'খুড়ী-মা' সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বঙ্গীয় সমাজকে তিনি উত্তমরূপে চিনিয়াছিলেন, তৎপ্রণীত সামাজিক উপন্যাসগুলি প্রকৃত প্রকৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে, সমস্ত পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুললিত। ...তাঁহার বিয়োগে সমস্ত বঙ্গের সাহিত্য-সংসার নিতান্ত শোকাকুল

হইয়াছেন, আমরাও অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।"
(পৌষ ১৩১৫)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৮৮

ক্যাপ্টেন জেম্‌স ষ্টিওয়ার্ট
ফেলিক্স কেরী

ক্যাপ্টেন জেম্‌স ষ্টিওয়ার্ট···শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলিক্স কেরী ··· শ্রীসজনীকান্ত দাস

ক্যাপ্টেন জেম্‌স স্টিওয়ার্ট
ফেলিক্স কেরী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫৮

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭

৭.৫—১৫।৩।১৯৫২

ক্যাপ্টেন জেম্‌স ষ্টিওয়ার্ট

? — ১৮৩৩

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের শেষ দশকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মূলতঃ এ দেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীগণ ব্যতীত কয়েক জন ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠ্য পুস্তকাদি রচনা করিয়া এ দেশের বালক-বালিকাগণকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ শিক্ষিত করিয়া তোলা সেই উদ্দেশ্যের শুভ পরিণতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই সকল সহৃদয় ব্যক্তির জীবন ও কীর্ত্তির বিশদ ইতিহাস বড়-একটা পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ কেহ কেহ ইঁহাদের নামোল্লেখ মাত্র করিয়া গিয়াছেন। মালদহের গোয়ামাল্‌টিতে জন্ এলার্টন্, চুঁচুড়ায় রেভারেণ্ড রবার্ট মে, বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন জেম্‌স ষ্টিওয়ার্ট, কালনা ও চন্দননগরের জন্ ডি. পীয়ার্সন ও জে. হার্লি এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। আজিকার দিনে ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। আমরা ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি।* সেইগুলি সাজাইয়াই বর্ত্তমান নিবন্ধটি রচিত হইল।

* J. Long : *Hand-Book of Bengal Missions* (1848), pp. 79-80, 90-92. First and Second Reports of the Calcutta School-Book Society. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড।

বর্দ্ধমানে স্কুল প্রতিষ্ঠা

ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্ট বর্দ্ধমানস্থিত প্রভিন্‌শিয়াল ব্যাটেলিয়ানের অ্যাড্‌জুটাণ্ট ছিলেন। তাঁহারই যত্ন চেষ্টায় বর্দ্ধমান মিশন গঠিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া এক জন মিশনরীর থাকিবার উপযুক্ত বাসগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। চার্চ মিশনরী সোসাইটির সংস্রবে বর্দ্ধমানে শিক্ষাবিস্তারের কাজ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হয়; তিনি এখানে দুইটি বাংলা স্কুল স্থাপনা করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় দশ, ছাত্র-সংখ্যা এক হাজার। স্কুলসমূহের মাসিক ব্যয় ছিল ২৪০৲ টাকা। কার্য্যারম্ভের সময় ষ্টিওয়ার্টকে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; বিরুদ্ধবাদীরা রটাইয়া দিয়াছিল যে. এ দেশের শিশুদিগকে জাহাজে পুরিয়া বিলাতে চালান দেওয়ার মতলবেই সাহেব স্কুল ফাঁদিয়া বসিয়াছেন! কোন পুস্তকে যীশুখ্রীষ্টের নামোল্লেখেই তখন যথেষ্ট বাধার উদ্ভব হইত। বর্দ্ধমানে তখন পাঁচটি শাস্ত্রানুমোদিত বিদ্যালয় ছিল—মিশনরী স্কুলের প্রভাবে পাছে তাহাদের বিদ্যালয়গুলি ভাঙিয়া যায়, এই ভয়ে শিক্ষকেরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুলে কেহ ছেলে পাঠাইলে ইহারা তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিত। ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্ট যেখানে স্কুল স্থাপনা করিতেন, সেখান হইতেই বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত কর্ম্মঠ শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন*—তাহাতে বিরুদ্ধবাদীদের

* ১৮১৯ সনে প্রকাশিত 'মনোরঞ্জনেতিহাসে'র লেখক তারাচাঁদ দত্ত বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুলের এক জন শিক্ষক ছিলেন। দ্র° কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণ (১৮১৮-১৯), পৃ. ৪।

কথায় লোকের ক্রমশঃ অবিশ্বাস জন্মাইতে থাকে এবং শীঘ্রই ঐ পাঁচটি বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। ছাপা-বই প্রথম প্রবর্ত্তন করার সময়ও বাধার সৃষ্টি হয়—দেশীয়দের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহাদের ছেলেদের ফাঁদে ফেলিয়া জাতি নষ্ট করিবার ইহাও এক প্রকার ষড়্‌যন্ত্র! কারণ, ইতিপূর্ব্বে হাতে-লেখা পুথির সাহায্যে পাঠাভ্যাসই রেওয়াজ ছিল। এমন কি, বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত বহু কষ্টে ছাপার বই পড়িতে পারিতেন—বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করা ত দূরের কথা! ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্ট চুঁচুড়ার পরলোকগত মে সাহেবের পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন; তিনি নিজেও এই পদ্ধতির কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে গ্রহগণিত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত ষ্টিওয়ার্ট সাহেব গবর্মেণ্ট যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য নিরন্তর চেষ্টিত, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য কোম্পানী বাহাদুরের কতকগুলি আইনকানুন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই আইনগুলি পড়িয়া শাসকদের সম্বন্ধে ছাত্রদের সুধারণা বদ্ধমূল হইবে এবং প্রীতি ও প্রেম শেষ পর্য্যন্ত আনুগত্যে পরিণত হইবে।

সুবিধা পাইলে ষ্টিওয়ার্ট সাহেব দেশীয়দের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। তিনি বাংলা বেশ ভাল জানিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারে তিনি কোন দিন ভয় পাইতেন না; হিন্দুধর্ম্মের গুহ্য গায়ত্রী একটি পুস্তিকায় ছাপিয়া তিনি গ্রন্থকার হিসাবে নিজের নামও প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন—সেকালের পক্ষে তাহা দুঃসাহসই বলিতে হইবে। তাঁহার ভয় ছিল, তিনি নাম না দিলে সম্পূর্ণ দোষ মিশনরীদের ঘাড়ে পড়িবে।

ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলগুলির যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটি যখন কলিকাতার অনেকগুলি

বাংলা স্কুলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা নিকোলাস্ উইলার্ড নামে এক জন যুবাপুরুষকে এই সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়া পাঁচ মাসের জন্য ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুলের পদ্ধতি শিক্ষা করিতে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিলেন। এই পদ্ধতিতে পুরাতন পদ্ধতির অর্দ্ধেক ব্যয়ে অল্পসংখ্যক শিক্ষকের সাহায্যে অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল। উইলার্ড ১৮১৯ সনের মে মাসের গোড়ায় বর্দ্ধমান যাত্রা করেন; তাঁহার সহিত পাঁচ জন বাঙালী শিক্ষকও শিক্ষালাভ করিতেছিলেন।

মৃত্যু

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। জীবনের শেষ দিকে তিনি নানা ভাবে শোক দুঃখ পাইয়াছিলেন।

গ্রন্থাবলী

ষ্টিওয়ার্টের রচিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। **ইতিহাস কথা**। ইং ১৮১৬ (?)

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণটি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে '**উপদেশ কথা**' নামে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি 'উপদেশ কথা'র তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ৭২)

প্রকাশ করেন।* পুস্তকে ভূমিকা-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

সমাচার. এই কেতাবের মধ্যে স্বতন্ত্র২ দুই অংশ পাওয়া যায়, প্রথম ভাগ ষ্ট্রেচ্ সাহেবের ইতিহাসছটা নামে গ্রন্থ এবং অন্যোন্য গ্রন্থ-হইতে কতক২ স্থূলার্থ সংগ্রহ করিয়া এ দেশীয় মতে কিঞ্চিৎ সাজাইয়া তর্জ্জমা করা গিয়াছে. দ্বিতীয় ভাগে তিন প্রকরণ, এক ইংলণ্ডীয়ের-দিগের অজ্ঞানতা ও বিধর্ম্মাচরণ বিনাশপূর্ব্বক জ্ঞানশীল পশ্চিম দেশস্থেরদিগের মধ্যে মাননীয় হইবার সংক্ষেপ বিবরণ. দ্বিতীয় এ দেশেতে সাহেব লোকেরদের প্রথম আগমনের কিঞ্চিৎ বিবরণ. তৃতীয় সরকারের রাজস্বের নিয়ম বন্ধনার্থে অন্যোন্য কারণের নিমিত্তে এই বঙ্গদেশের জন্যে কোন২ প্রধান আইন.

দেখ ; পূর্ব্বে এই গ্রন্থ কোন২ সাহেব লোকির নিজ ব্যয়ের দ্বারা দুইবার ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু প্রথমে ইহার নামকরণ ইতিহাস কথা ছিল ; অনন্তর যখন এই গ্রন্থকে শুদ্ধ করিয়া কিছু বাহুল্য করা গেল, তৎকালে উপদেশ কথা খ্যাত হইল.

'উপদেশ কথা' পুস্তকের "নির্ঘণ্ট" নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ; ইহা হইতে পুস্তকের বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যাইবে :—

* 11. About two years ago there was printed, on account of another Institution, and under the title of *Oopodes Cotha*, a selection from Stretch's Beauties of History, with other matter, the whole translated into Bengalee under the superintendence of Captain Stewart. That Gentleman presenting it to the Society with a request to print a second edition, the same number of copies, both Bengalee and Anglo-Bengalee, have been voted as of the '*Pleasing Tales.*'—Second Report of the Calcutta School-Book Society. Second Year, 1818-19. (1819), p. 4.

পুস্তকখানির ৬৮-৭২ পৃষ্ঠায় "অভিধান" অংশে কতকগুলি শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে অর্থসমেত কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা হইল :—

আরোপিত,	কল্পিত, কৃত্রিম, মিথ্যা.
কাল্পনিক,	ভণ্ডতপস্বী, শঠ.
চর্য্যা,	আচারণ, ব্যবহার.
জাতিভ্রষ্ট,	পিরালি, যাহার জাতি গিয়াছে.
নৈত্য,	সীমা, ঠিকানা.

পক্ষপাত,	গণতা.
প্রতিনিধি,	তুল্য.
বিপ্লুত,	বিচলিত.
বিরোধী,	বিবাদী, ঝকড়াউ.
সংঘটিত,	সম্মিলিত.
সঙ্কলন,	আনুকূল্য করণ.

'উপদেশ কথা'র বাংলা-ইংরেজী সংস্করণও ১৮২০ সনের মে ম কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-স ৬৮ + ৬৮ ; দক্ষিণ পৃষ্ঠায় বাংলা, বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী অংশ।

২। **বর্ণমালা***। ইং ১৮১৮।

ছাপার হরফে বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা দিবার ইহাই বোধ হয় প্র প্রচেষ্টা। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিব (১৮১৭-১৮) 'বর্ণমালা' সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :—

> 1. A set of elementary Bengalee Tables, with short rea lessons intermixed, by Lieut. J. Stewart, Adjutant of the Pro cial Battalion of Burdwan. Seven tables in all have been pri at the Serampore Press at the Society's charge ; ...

৩। **তমোনাশক**। ইং ১৮২৮। পৃ. ৩২।

Tomonasuck or *The Destroyer of Darkness*. James Stewart. তমোনাশক অর্থাৎ দেবদেবী বিষয়ক বিব বর্দ্ধমানের জেমেস ষ্টুএর্ট সাহেবের কৃত। কলিকাতায় ছাপা ১২৩৪ শাল। Printed at Calcutta. 1828.

পুস্তকের বিষয়বস্তু :—

* ১৮২৫ সনে "মোং ইটালি শ্রীযুত পিয়ার্স সাহেবের ছাপাখানায়" "ষ্টুয়ার্ট সাহে বর্ণমালা রিপ্রিণ্ট" মুদ্রিত হয়।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩।

'তমোনাশকে'র "ভূমিকা" অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সকল জাতীয় লোকেরদের অন্তঃকরণ দেব পূজা করাতে অদ্বিতীয় চিরস্থায়ি ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়াছে, পূর্ব্বকালে ইংলণ্ড দেশিয়েদের ব্যবহার ও ধর্ম্ম সেই প্রকার অর্থাৎ প্রতিমা পূজাদিতে রত ছিল, তাহাদের দুই দেবতা থর ও ওডন প্রধান রূপে মান্য ছিল যেমন হিন্দুদের কালী ও দুর্গা, এবং ব্রাহ্মণের তুল্য ড্রুইড নামে এক জাতি ছিল, ও তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি বালকের ন্যায় ছিল, আর জগতের বৃত্তান্ত কিছু জানিত না, এক্ষণে ঈশ্বরদত্ত সত্যজ্ঞান পাইয়া পৃথিবীস্থ অন্য লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, ইহা তোমরা দেখিতেছ, আরও তোমরা নিশ্চয় জান, যগুপি একজন এদেশস্থ লোক জজ্ কিম্বা মেজেষ্ট্রেট হইত তবে সকল লোকের ঘুস লইয়া ও পক্ষপাত করিয়া অবিচার দ্বারা কত গোল মাল ইত্যাদি করিত, তোমরা বোধ কর যে ঈশ্বর মহাত্মা, এবং পুতুল আরাধনা করাতে ঈশ্বর হইতে তোমাদের অন্তঃকরণ পুর্ণরূপে গিয়াছে, ইহাতে আমি বলি, স্বয়ংজীবি অপ্রপঞ্চ অতুল্যপরাক্রম ঈশ্বর যিনি তাঁহারি আরাধনা করা কর্ত্তব্য, কোন দেশীয়লোক আপন বুদ্ধিতে বিচারদ্বারা ঈশ্বরকে

কখন জ্ঞাত করিতে পারে নাই, এবং ঈশ্বরকে উপযুক্ত রূপে আরাধনা করিতে পারে না, পাষাণ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি রহিত অদ্বিতীয় ঈশ্বর যিঁহহাকে আরাধনা করিতে হইবে, আর দেখ অদ্বিতীয় ঈশ্বর হইতে মনকে পরাঙ্মুখ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য এক খণ্ড ওজর করিয়া বলে যে কাষ্ঠ কিম্বা পাষাণ ঈশ্বর নহে, কিন্তু ঐ সকলেতে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় এবং তাহারদিগকে এই বিষয়ে যদি প্রমাণ জিজ্ঞাসা করা যায় তবে উত্তর দেয়, যে মন্ত্রের শক্তিতে হয়, সে যাহা হউক, এমত কি মন্ত্রের শক্তি আছে যে ঈশ্বরকে সেই মন্ত্র দ্বারা আবির্ভাব করাণ যায়? এই রূপ আবির্ভাব হইলে তাহারা বড় সন্তুষ্ট হয় কেননা আপন বশীভূত এমন দেবতা পাইয়াছি যে তাহা হইতে পাপ মোচন পাইব এবং মনের বাঞ্ছিত যাহা তাহাও পাইব।

এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে এমত যে কুব্যবহার অমিলন ও মিথ্যা কহা চলিত আছে সে কেবল দেব দেবীর দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয়, কেননা যাহা মনুষ্য ধ্যান করে তাহার চরিত্র সেই প্রকার হয়, দেবদেবীর বিষয়ে যেমত শাস্ত্রেতে লিখিত আছে, তাহা আমি তদ্রূপ লিখি, এবং বুদ্ধিমান লোকেরা এই সকল মনে বিবেচনা করিবেন, বাঙ্গালিরদের প্রতি আমার যেমন স্নেহ ও ভালবাসা উপকার চিন্তা তাহা প্রকাশিত আছে ইহকালে ও পরকালে যেন দুঃখ ভোগ না হয়, ইহা আমার প্রার্থনা, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের বিষয় ভাবনার কথা উপযুক্ত আছে বটে, যেমন আমি শাস্ত্র হইতে এই পুস্তকের মধ্যে প্রমাণ দিতেছি, যে সকল অগ্রাহ্য কথা লিখিত আছে সে কেবল পূর্ব্বলোকেরদের বুদ্ধি অনুসারে রচিত হইয়াছে, এই পুস্তক পড়িলে জ্ঞাত হইবেন, প্রতিমা পূজা করাতে তোমরা সকল কালাফিরিঙ্গীর ন্যায় হইতেছ, উহারা পুত্তলিকাতে পূজা করে, বাঙ্গালির ব্যবহার বিষয়ে আমি কিছু কহি, সাংসারিক ব্যবহার বস্ত্রাদি পরিধানের এবং পরিবারাদির কথা

কহিতে আবশ্যক নাই, সে সকল থাকুক, ভাল, কিন্তু খাদ্যাখাদ্য ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিবেচনা করা এ সকল অতি মূর্খের কথা, ইহার দিষ্টান্ত দেখ, গয়লার ঘরে অপবিত্র স্থানে স্থিত এবং সর্ব্বদা অশুচি যে তাহার স্ত্রীপুত্র তাহাদের স্পর্শেতে দুষ্ট ও অপবিত্র যে ভাণ্ড তাহাহইতে দুগ্ধ লইয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া ব্রাহ্মণ সকল দুগ্ধ খায়, সেই আপন পাত্র যদি অন্য কেহ স্পর্শ করে তবে ব্রাহ্মণের জাতি যায়, এবং ময়রা ও দোকানিরা দুগ্ধাদির দ্বারা মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করে, ব্রাহ্মণ সকল তাহা ভোজন করে ইহাতে কিছু জাতির ক্ষতি হয় না, আর দেশান্তর হইতে নৌকার উপর তণ্ডুলাদি আনে তাহার উপর নাবিকেরা পাক করিয়া খায়, তাহাতে উৎসৃষ্ট মৎস্যাদি থাকে, তাহা ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিলে দোষী হয়েন না, অন্য এক প্রমাণ দেখ, জাহাজের উপর অনেক২ বস্তু অর্থাৎ মরিচ ও এলাচ, লবঙ্গ জায়ফল প্রভৃতি আইসে, তাহা স্বচ্ছন্দে সকলে খায়, কিন্তু সেই জাহাজে আনীত অন্য২ বস্তু অর্থাৎ পিপরমেণ্ট প্রভৃতিকে ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট বলিয়া খায় না, কেননা ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট ভোজন করিলে জাতি নষ্ট হয়, দেশদেশান্তর ব্যবহার থাকুক, কিন্তু এমত করাতে বুঝ না যে ঈশ্বরের বিচারেতে যে কিছু পুণ্য হয়, কিম্বা উদ্ধার হয়, তিনি অর্থাৎ পরমেশ্বর অন্তঃকরণের মালিন্য, ও কুচিন্তা, এবং কুব্যবহার জানিয়া বিচার করেন, জীবের মন যদি পরস্ত্রীর প্রতি কামাভিলাষেতে যায়, ও পরের ধনাদিতে লুব্ধ হয়, তবে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সেই কুকর্ম্ম এবং তাহার উচিত দণ্ড তেঁহ দেন, প্রকৃত কথা এই যে বাহ্য শরীরাদির বিষয় কেবল পশুর তুল্য হয় তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছু সম্বন্ধ নাই কিন্তু মনের সহিত জানিবা, আরো দেখ মনুষ্য মরিলেই প্রেতশরীর হয় পরে পুত্রাদি তাহার শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ণ সম্বৎসরানন্তর সেই মনুষ্য প্রেতশরীর ত্যাগ করিয়া অন্য এক ভোগ শরীর পায়, শ্রাদ্ধ না করিলে

প্রেতই থাকে ইহাতে বুঝা যায় যে সকল বিষয় কেবল মনুষ্যের হস্তগত তাহাতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কিছুই নাই। বাঙ্গালিদের বিবাহের বিষয় দেখ দেখি বড়২ কুলীন ব্রাহ্মণেরা অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনেক২ বিবাহ করেন পরে তাহারা যে স্ত্রীর নিকট লাভের বিষয় অতিশয় বুঝেন তাহারদিগের তত্ত্বাবধারণ করেন অন্য২ দুঃখিনী স্ত্রী সকল মনঃপীড়াতে দগ্ধ হইয়া কালযাপন করে আর তাহার মধ্যে কেহ২ দুঃখ সহিতে না পারিয়া ধর্ম্মবিপর্য্যয় কর্ম্ম করে এবং ঐ কুলীনেরা ব্যয়কুণ্ঠ প্রযুক্ত খরচ করিতে না পারিয়া আপন কন্যা কিম্বা ভগিনীরদের বিবাহ দেন না বলেন যে বর মেলে না আর কোন২ ধনলোভি অনেক ধন পাইবার আশাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা কন্যা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া কন্যাকে অধিক বয়স্কা অর্থাৎ যুবতী প্রায় করিয়া রাখে, পরে জাত্যাদি বিবেচনা না করিয়া এমত বরের চেষ্টা করেন যে তাহাতে বরের একচিহ্নও পাওয়া যায় না, তাহাতে ঐ পরাধীনা কন্যার বৃদ্ধাদি পতিতে মনঃ সন্তোষ না হওয়াতে কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ বিবাহ হওয়াতে দুঃখি ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ কন্যা না পাইয়া অব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্টাদির কন্যা ব্রাহ্মণ কন্যা জ্ঞান করিয়া বিবাহ করেন, পরে অন্য২ প্রধান ব্রাহ্মণ এবং কুটুম্বেরদিগকে বউভাতে খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ বধূর হস্তে সপাত্র অন্ন দিয়া বধূর পরিবেশন দ্বারা ভোজন করান, তাহাতে গৃহস্থ নির্দ্দোষী হয়, হিন্দুদিগের প্রধান যে ব্রাহ্মণ তাহারদিগের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অন্য২ জাতির কথা কি কহিব কেননা গুরুর ব্যবহার জানিলে শিষ্যের বিষয় আপনি জানা যায়, ইহাতে বোধ হয় যে বাঙ্গালিদিগের ধর্ম্মানুসন্ধান প্রায় নাই।

অপর ব্রাহ্মণ সকল যজ্ঞোপবীতকে কর্ণের উপর রাখিয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করে ইহার কারণ তাহারা বলে যে গুরু মন্ত্র প্রদান করিলে কর্ণ পবিত্র স্থান হয়, একি আশ্চর্য্য ঐ নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা

কিছু বিবেচনা করে না যে মন্ত্রদ্বারা যদি কর্ণ পবিত্র হয় তবে আন্তরিক ও শুদ্ধ হইতে পারে তাহাদের এরূপ করাতে কেবল বালকের বুদ্ধি প্রকাশ হয়।

১৮৩৫ সনে ক্যালকাটা খ্রীষ্টিয়ান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি 'তিমিরনাশক'—এই পরিবর্ত্তিত নামে 'তমোনাশকে'র একটি নূতন সংস্করণ (পৃ. ২০) প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ষ্টিওয়ার্ট ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার দিকে যে-সকল বিদেশীয় পণ্ডিত ইহাকে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্ট তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভাষাও অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। এই হিসাবে ষ্টিওয়ার্টের নাম আমাদের স্মরণীয়।

ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টকে স্মরণ করিবার সময় এই কথাটাই বিশেষভাবে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, যে-কারণেই হউক, বাঙালীর ছেলেদের আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য তখনকার দিনে না-ছিল কোনও বিদ্যালয়, না-ছিল কোন পাঠ্য পুস্তক। ইঁহারা নিজেদের চেষ্টায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হন নাই, ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া সেগুলি বিতরণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি ও স্কুল-সোসাইটি পরে এই কার্য্যে অগ্রসর হন। বাংলা দেশের পক্ষে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ফলপ্রসূ হইয়াছে কি না, আজকাল অনেকে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা নিজেরা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যত দিন ইহার প্রাধান্য স্বীকার করিব, তত দিন ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্ট-প্রমুখ সহৃদয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নাম শ্রদ্ধার সহিত আমাদিগকে উচ্চারণ করিতে হইবে।

ফেলিক্স কেরী

১।

বাংলা দেশে ইংরেজ-সমাগমের কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল পাশ্চাত্য ব্যক্তি বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ ও রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহাদের নাম সমাদরের সহিত উল্লেখযোগ্য। সংখ্যায় ইঁহারা নগণ্য নহেন। জোনাথান ডান্‌কান, এন. বি. এড্‌মনস্টোন, হেন্‌রি পিট্‌স ফরস্টার, এ. আপ্‌জন, জন মিলার, জন টমাস, উইলিয়ম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, জন এলার্টন, গ্রেভ্‌স চামনি হটন, ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্ট, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং পরবর্ত্তী মে, হার্লি, পীয়ার্স, পীয়ার্সন, মর্টন, ইয়েট্‌স, ওয়েঙ্গার, মেণ্ডিস, ম্যাক, লসন, রবিনসন, লং, কীথ এবং আরও অনেকে বাংলা গদ্য-ভাষার জন্মকালে ও শৈশবে নিজ নিজ সাধনা ও চেষ্টা দ্বারা নানা ভাবে ইহাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী প্রভৃতি দুই-একজন সৌভাগ্যবানের নাম আমরা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকি। তাঁহার পুত্র ফেলিক্স কেরীর জীবন ও কীর্ত্তি অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব, তিনিও কম স্মরণীয় নহেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার তুল্য অভিজ্ঞ ও অধিকারী ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না বা হন নাই। তিনি লেখক হিসাবে প্রকৃতপক্ষে মাত্র চারি বৎসর বঙ্গভাষার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ রচনাই অকালমৃত্যুর জন্য অসম্পূর্ণ রহিয়া

গিয়াছে। তাঁহার রচনা আমরা মুদ্রিত আকারে যতটুকু পাইয়াছি, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন; মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও তিনি যে পরিমাণ মুদ্রিত বাংলা লেখা রাখিয়া গিয়াছেন, আর কোনও বৈদেশিকের লেখা তাহার সহিত ওজনে তুলনীয় নহে। উৎকর্ষ বিচারে সংস্কৃত রীতির অতিমাত্র অনুসরণ তাঁহার প্রধান দোষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় প্রথম পথপ্রদর্শক, ইহা স্মরণ রাখিলে বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্ম্মাণে তাঁহার দক্ষতা ও দুঃসাহস আমাদিগকে বিস্মিত করিবে। অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদবিদ্যার মত সম্পূর্ণ অভিনব শাস্ত্রের পরিভাষা যে তিনি একান্ত নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষার রত্নভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ সকল দিক্ বিচার করিয়া তাঁহাকে বাংলা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলিলে অন্যায় বলা হইবে না।

জীবনী

ফেলিক্স কেরীর বিচিত্র জীবন। এই জীবন ভুল ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, খামখেয়ালিপনায় বিচিত্র। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারকশ্রেষ্ঠ মহামান্য রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরীর ঘনিষ্ঠ প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে খ্রীষ্টীয় বিনয় ও সংযম আসে নাই। তিনি উদাসীন ভবঘুরে প্রকৃতির লোক ছিলেন অথচ ঐহিক জাঁকজমকের প্রতিও তাঁহার কম আকর্ষণ ছিল না। ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম, মাত্র সাত বৎসর বয়সে বঙ্গদেশে

তাঁহার আগমন, চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতার নিকট তাঁহার দীক্ষা এবং মাত্র একুশ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক হিসাবে তাঁহার ব্রহ্মদেশ যাত্রা—এই পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের গতি পিতার আওতায় চলিয়াছিল। জীবনের বাকী পনর বৎসর খ্রীষ্টধর্ম্মনীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি চলিতে পারেন নাই। রাজনীতিচর্চ্চার ফলে তাঁহার আসক্তি জন্মিয়াছিল ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের প্রতি, উপর্য্যুপরি দুইটি স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহার চরিত্রে শৈথিল্য আসিয়াছিল, মন হইয়াছিল অস্থির। তিনি তিন বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্ব-ভারতবর্ষের অরণ্য-পর্ব্বতে পার্ব্বত্য ও বন্য জাতিদের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া একরকম অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, পরে বাইবেল-বর্ণিত 'প্রডিগাল সানে'র মত শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জীবনের শেষ চারি বৎসর পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত, পালি ও বঙ্গভাষার সাধনা করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে যে পাদরিত্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশের রাজার পররাষ্ট্র-সচিব হইয়াছিলেন, সে পাদরিত্ব আর গ্রহণ করেন নাই। উত্থানপতনময় রোগশোকক্লিষ্ট অতি দুঃখের জীবন ছিল তাঁহার; মিশনরীদের মধ্যে একমাত্র জন টমাসের জীবনের সহিত তাঁহার জীবনের কিছু সাদৃশ্য ছিল, দুই জনেই কল্পনাবিলাসী, অব্যবস্থিতচিত্ত, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ চিন্তায় অধিক রত; দুই জনের জীবনেই কাব্যমহিমা ছিল।

স্বগ্রাম পলার্সপিউরিতে জুতা মেরামতের ব্যবসায় ছাড়িয়া উইলিয়ম কেরী ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন পার্শ্ববর্ত্তী মূলটন গ্রামে গিয়া গ্রাম্য-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র চব্বিশ, নিদারুণ জ্বররোগে তাঁহার প্রথম সন্তান মৃত* এবং তাঁহার নিজের মাথায়ও টাক

* পীয়ার্স কেরী-প্রণীত কেরীর জীবনী দ্রষ্টব্য।

পড়িয়াছে। পত্নী ডরোথিকে লইয়া তিনি মূলটনে যে কুটীরে আশ্রয় লন, সেখানেই ঐ বৎসরের ২০এ অক্টোবর ফেলিক্স কেরীর জন্ম হয়।* কেরীর প্রথম পুত্ররূপেই ইনি গণ্য।

বঙ্গদেশে ব্যাপটিস্ট মিশনরী হিসাবে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় জন টমাসের সহিত উইলিয়ম কেরী যখন যাত্রা করেন, সাড়ে ছয় বৎসরের পুত্র ফেলিক্স একা তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিলেন। পাসপোর্টের হাঙ্গামায় ওয়াইট দ্বীপে তাঁহাদের জাহাজ 'আর্ল অব অক্সফোর্ড'কে ছয় সপ্তাহ আটক করা হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হয়। পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন টমাসের সহিত কেরী সপরিবারে বঙ্গদেশে রওয়ানা হন ও ১১ই নবেম্বর কলিকাতায় পৌঁছেন। পিতা বা পুত্র কেহই আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। ঐ দিনই বাংলা-সাহিত্যে বিখ্যাত রামরাম বসু কেরীর মুন্‌শী নিযুক্ত হন এবং তাঁহার কাছেই ফেলিক্সের বাংলা ভাষায় হাতেখড়ি হয়। কেরীর ইচ্ছা ছিল, প্রথম পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত করিয়া তুলিবেন। বাংলা দেশে পৌঁছিবার মাসাধিক কালের মধ্যেই (১৬ ডিসেম্বর ১৭৯৩) তিনি তাঁহার জর্নালে লিখিয়াছিলেন—

> I had fully intended to devote my *eldest son* to the study of *Shanscrit*, my 2nd to the *Persian*, and my 3rd to *Chinese*.

* ফেলিক্সের জন্মের এই তারিখ 'পিরিওডিকাল অ্যাকাউন্টস' হইতে পাইয়াছি। তাঁহার কবরের উপর স্মৃতি-ফলকের তারিখ হিসাব করিলেও এই তারিখ পাওয়া যায়। J. J. Higginbotham তাঁহার 'The Men whom India has known' (১৮৭৫) পুস্তকে ভ্রমক্রমে জন্ম-বৎসর ১৭৮৭ দিয়াছেন। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার 'History of Bengali Literature in the Nineteenth Century' পুস্তকে "২২ অক্টোবর ১৭৮৬" তারিখ দিয়াছেন। এ তারিখও ভুল।

ফেলিক্স সম্বন্ধে কেরীর এই আশা পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ও পালি ভাষায় সবিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন মালদহে জর্জ উড্নির আশ্রয়ে না-আসা পর্য্যন্ত উইলিয়ম কেরীকে অত্যন্ত দুঃস্থ ও বিপন্নভাবে সহায়সম্পদ্‌হীন অবস্থায় প্রথমে ব্যাণ্ডেল, পরে নদীয়া, কলিকাতার মাণিকতলা, সুন্দরবন অঞ্চলে টাকির সন্নিকটবর্ত্তী দেবহাট্টায় একরকম ভাসিয়া বেড়াইতে হয়। মাণিকতলায় অবস্থানকালে কেরী-পত্নী ও ফেলিক্সের এমন জ্বর হয় যে, তাঁহাদের জীবনের কোনই আশা ছিল না। সাড়ে সাত বৎসর বয়সে ফেলিক্স যখন মালদহ পৌছেন, তখন মুন্‌শী রামরাম বসুর সাহায্যে "ব্রাহ্মণদের এবং অব্রাহ্মণদের মধ্যে কথিত" উভয়বিধ বাংলা ভাষাতেই তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা জন্মিয়াছে।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি পরবর্ত্তী মিশনরীরা ইংলণ্ড হইতে শ্রীরামপুরে আসিয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন এবং তাঁহারাই মালদহ হইতে কেরীকে সপরিবারে সেখানে লইয়া আসেন। কেরী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে কলিকাতায় ক্রীত মুদ্রাযন্ত্রটি সহ নৌকাযোগে শ্রীরামপুর পৌছেন। ওয়ার্ড ছাপাখানার কাজে দক্ষ ছিলেন, তের বৎসর বয়স্ক ফেলিক্স কেরী তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। ২০ জুলাই ১৮০০—ওয়ার্ড তাঁহার জর্নালে লিখিয়াছেন—

> ...our labours for everyday are now regularly arranged. About six o'clock we rise : brother Carey to his garden : brother Marshman to his school at seven : brother Brunsdon, Felix and I, to the printing office....Our compositor having left us, we do without : we print three half-sheets of 2,000 each in a week ; ... Felix is very useful in the office.

ছাপাখানার জন্ম শেষ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রুফ দেখার দায়িত্বও সেই সময় হইতে বালক ফেলিক্সের উপর ন্যস্ত হয়। মালদহে তৃতীয় পুত্র পিটারের মৃত্যুর পরেই ফেলিক্সের মাতা ডরোথি অর্দ্ধোন্মাদ হইয়া যান। শ্রীরামপুরে আসার পর তাঁহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইত। এই ব্যাপারে ফেলিক্স মর্ম্মপীড়ায় অস্থির হইয়া উঠিলে ওয়ার্ড তাঁহাকে শিক্ষা ও সান্ত্বনা দিতেন। ফেলিক্স তাঁহার সঙ্গে ছাপাখানায় সর্ব্বদা কাজ করিতেন, বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভাষা তিনি ঠিক এদেশীয়দের মত আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে না হইলে চলিত না। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা সম্বন্ধে ফেলিক্স মোটেই সজাগ ছিলেন না। তাঁহার বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর মাত্র, কিন্তু তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন, মার্শম্যান তাঁহাকে 'শার্দ্দূল' সম্বোধন করিতেন। তাহা ছাড়া বিকৃতমস্তিষ্ক মাতার স্নেহ হারাইয়া তাঁহার মানসিক কষ্টেরও সীমা ছিল না। ওয়ার্ড বুঝিতে পারিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের আওতা হইতে ফেলিক্স দূরে সরিয়া বিপথে বিপন্ন হইবার জন্ম উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে লইয়া শ্রীরামপুরের পথে পথে প্রচারকার্য্যে বাহির হইতে লাগিলেন; ফেলিক্স চমৎকার বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ওয়ার্ড লিখিয়াছেন, "he never heard a message better fitted for India." সেই দিন হইতে ছাপাখানার কাজের সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্সকে প্রচারকের কাজও দেওয়া হইল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ ডিসেম্বর কেরী স্বয়ং গঙ্গার জলে পুত্রকে দীক্ষা (baptism) দিলেন। ঐ দিন পরে প্রথম ভারতীয় ব্যাপটিস্ট ক্রিশ্চিয়ান কৃষ্ণ পালেরও দীক্ষা দেওয়া হইল। [illegible] আশা করিলেন, "ক্ষুদে পাদরি"র নবজীবনের সূত্রপাত হইল। ১৮০২

খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে লণ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটি ফেলিক্সকে সোসাইটির পাদরি নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু এই কাজে ফেলিক্সের মন সায় দেয় নাই। ধর্ম্মপ্রচার অপেক্ষা ছাপার কাজ ও ভাষাশিক্ষার কাজে তাঁহার আকর্ষণ বেশী। পিতা উইলিয়ম কেরী তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিভাগীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন; বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূর করিবার জন্য ফেলিক্স প্রাণপণে পিতার সহায়তা করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় চ্যাপলেন বুকানন চীন মহাদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দুই জন কর্ম্মী প্রেরণ করিবার ব্যয় বাবদ ছয় শত পাউণ্ড শ্রীরামপুর-গোষ্ঠীর হাতে প্রদান করিলেন। ফেলিক্স (বয়স আঠারো) মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ অক্টোবর কলিকাতায় মার্গারেট কিন্‌সীকে (Margaret Kincey) বিবাহ করা সত্ত্বেও চীনে যাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিলেন। পিতা কেরী আপত্তি করিলেন না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চীন যাওয়া হইল না। জোহানেস লাসার নামক চীনা ভাষায় অভিজ্ঞ একজন আর্ম্মেনিয়ান শ্রীরামপুরে আসিলেন। স্থির হইল, তাঁহার নিকট এখানেই ভাষা শিক্ষা করিয়া চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও মুদ্রণ করিয়া চীন অভিযান করা হইবে। ফেলিক্সের মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। এত দমিয়া গেল যে, তিনি চীনা ভাষায় পাঠ লইলেন না।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর টেলর নামক একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীরামপুরে আসিলেন, ফেলিক্স তাঁহার নিকট হইতে চিকিৎসা-বিদ্যা, বিশেষ করিয়া অস্ত্রোপচার-বিদ্যা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন; ধর্ম্মপ্রচার অপেক্ষা রোগীর রোগ নিরাময় করার কাজে তিনি অনেক বেশী উৎসাহ বোধ করিতে লাগিলেন। বহিঃপৃথিবীতে আপনার ভাগ্য পরীক্ষার

গোপন বাসনাও তাঁহার হইয়াছিল, চিকিৎসা-বিদ্যা জানা থাকিলে জীবনযুদ্ধে তিনি সহজেই জয়ী হইবেন। তিনি কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন।

আবার সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় মিঃ চেটার ও মিঃ মার্ডন রেঙ্গুন গেলেন—সেখানে মিশন স্থাপন করা যায় কি না, ইহা যাচাই করিতে। যে মাসে তাঁহারা ফিরিলেন, কিন্তু মার্ডন পুনরায় যাইতে রাজী হইলেন না। ফেলিক্স যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু

> Mr. Ward and Dr. Carey were averse to his removal; they considered that as he was familiar with the economy of a printing office, he will be able to supply Mr. Ward's place in case of necessity, and that his complete knowledge of Sanskrit and Bengalee would render him a valuable assistant in the translations.—J. C. Marshman: 'History of the Serampore Mission,' Vol. I, p. 298.

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১-১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের জর্নালে কেরীও এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

> Brethren Marshman, Ward, myself and my son Felix are as fully employed as we can be in translating and printing the scriptures. Felix overlooks the printing: he examines the Shangskrit proofs, having studied that language.

কিন্তু ফেলিক্সের যাত্রা কেহ রোধ করিতে পারিল না। মিঃ চেটারের সহযোগী হিসাবে ক্যাপ্টেন টার্নবুলের নেতৃত্বে 'অ্যানা' নামক জাহাজে ১৮ই নবেম্বর (১৮০৭) তিনি কলিকাতায় গেলেন এবং সেখান হইতে ২৯এ নবেম্বর রওয়ানা হইয়া ২রা ডিসেম্বর সাগরদ্বীপে পৌঁছিলেন। সেখানে ফরাসী রণপোতবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে দীর্ঘ

কাল কনভয়ের জন্ম অপেক্ষা করিয়া ডিসেম্বর মাসের ২৯এ তারিখ রেঙ্গুন রওয়ানা হইলেন।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে (পৃ. ৪১২-১৩) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

Mr. Felix Carey possessed much of his father's aptitude for the acquisition of languages, and looked forward with delight to the cultivation of the Burmese language and literature and the translation of the scriptures. It was a new and untrodden field of labour, well suited to his enterprising spirit. He was master of the Sanscrit language, and familiar with the principles of Oriental philology. He had also applied with success to the study of medicine, and walked the hospitals of Calcutta for several years [?]. He was twenty-two years of age when he entered on the undertaking, for which he was well trained in the school of Serampore. He had not been long at Rangoon before he found ample scope for his medical skill, and was thus enabled to obtain favourable access to the heathen. He was the first to introduce the blessing of vaccination into the country, and was so happy as to obtain permission, at the outset of his career, to operate on the child of the governor. He soon discovered, to his delight, that the learned language of the country, the Pali, the parent of the vernacular tongue was a variety of the Sanscrit, adapted to the monosyllabic language of Burman. His literary progress was thus facilitated and he was enabled with the aid of a pundit, to compile a grammar of the Burmese language, and make a rough beginning with the translation of the scriptures.

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ফেলিক্স রেঙ্গুনে পৌছেন। তাঁহার স্ত্রী মার্গারেট ও দুইটি শিশুসন্তান বাংলা দেশেই রহিয়া যান। ব্রহ্মদেশে মিশনরীদের অসুবিধার অন্ত ছিল না। সেই সকল অসুবিধার কথা জানাইয়া ফেলিক্স শ্রীরামপুরে যে পত্র লেখেন, ১৪ই মে তাহা মিশনগোষ্ঠীর হাতে পৌছায়। ফেলিক্সের পত্নী ঠিক সেই সময়ে

মারাত্মক অসুখ লইয়া শ্রীরামপুরে আসেন। ফেলিক্স সংবাদ পাইয়া জুলাই মাসের শেষ নাগাদ চলিয়া আসেন। মার্গারেট দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথমে একটি সন্তান প্রসব করিয়া মারা যান। তিনটি মাতৃহারা শিশুকে লইয়া ফেলিক্স অত্যন্ত মুশ্‌কিলে পড়েন, শেষ পর্য্যন্ত মনস্থির করিয়া মিশনগোষ্ঠীর হাতে সন্তানদের সমর্পণ করিয়া তিনি ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যান। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের মধ্যে কয়েক বার শ্রীরামপুর যাতায়াত করিয়া তিনি পুনরায় ভাষা-শিক্ষার সুবিধার জন্য ব্রহ্মভাষা-ভাষী পোর্তুগীজ-কন্যা মিস ব্ল্যাকওয়েলকে বিবাহ করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ চেটার ব্যক্তিগত কারণে রেঙ্গুন-মিশন পরিত্যাগ করিলে ফেলিক্সের স্কন্ধে মিশনের ভার সম্পূর্ণ অর্পিত হয়। প্রভুত্ব পাইয়া ফেলিক্সের মন বিচলিত হয় ও তিনি পার্থিব বস্তুর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ব্রহ্মভাষার ব্যাকরণ ইতিমধ্যে রচিত এবং অভিধানও অংশতঃ সঙ্কলিত হইয়াছিল, সেণ্ট ম্যাথু প্রভৃতি কয়েকটি মঙ্গলসমাচারের অনুবাদও ফেলিক্স করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় ব্রহ্মদেশীয় গবর্মেণ্টের সহিত ইংরেজ গবর্মেণ্টের মনান্তর উপস্থিত হইলে ফেলিক্স কেরীকে দোভাষীরূপে কাজ করাইবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় গবর্ণর বাধ্য করিতে চাহেন; ফেলিক্স অস্বীকার করিয়া রাজরোষে পতিত হন এবং মে মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রায় দুই মাস ক্যাপ্টেন ক্যানিং পরিচালিত 'আমবয়না' জাহাজে সপরিবারে তাঁহাকে লুকাইয়া থাকিতে হয়। মে মাসে গোলযোগ মিটিয়া যায়। ফেলিক্স ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর মিশনকে লেখেন—"আমি শ্রীরামপুরে গিয়া ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় একটি কি দুইটি মঙ্গলসমাচার ছাপাইতে চাই।" অত্যল্প কাল মধ্যে তিনি শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। মঙ্গলসমাচার

ছাপার সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্স-রচিত ব্রহ্মদেশীয় ব্যাকরণও ছাপা হইতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত রেঙ্গুন-মিশনের প্রয়োজনে ব্যাকরণ ছাপার ভার পিতার হস্তে দিয়া ফেলিক্স নবেম্বর মাসের শেষে রেঙ্গুন চলিয়া যান। ছাপার কাজের সুবিধার জন্য ব্রহ্মদেশে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও হরফাদি লইয়া যাইবার প্রস্তাবও ফেলিক্স করিয়া যান, মিশনগোষ্ঠীও ইহাতে সম্মত হইয়া অক্ষর প্রস্তুত করিতে থাকেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ ফেলিক্স রেঙ্গুন হইতে পিতাকে লেখেন—

> By this conveyance I send you the remainder of my grammar ; the list of Burman verbals ; and a preface, which I must get you to look over : reject what you think improper, and make any addition you think is wanting. In my opinion a Palee translation of the scripture should be begun.

ঠিক এই সময়ে আভার রাজা ফেলিক্স-প্রদত্ত টীকার (vaccination) গুণগান শুনিয়া নিজ পরিবারে টীকা দিবার জন্য ফেলিক্সকে আহ্বান করেন। ফেলিক্স রেঙ্গুন হইতে রাজধানী আভায় যান এবং রাজাকে তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ করিয়া এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, তিনি আভাতে নিজের সম্পূর্ণ ব্যয়ে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া দিবেন, ব্রহ্মভাষায় পুস্তকাদি সেখানেই ছাপা হইবে। হঠাৎ টীকা-বীজ সম্পূর্ণ ফুরাইয়া যাওয়াতে ফেলিক্স স্বয়ং রাজার খরচায় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জানুয়ারি শ্রীরামপুর উপস্থিত হন; ইহার মাসাবধি কাল পূর্ব্বে—১৪ই ডিসেম্বর (১৮১৩) উইলিয়ম কেরী অক্ষরাদি সম্পূর্ণ সরঞ্জাম সহ একটি মুদ্রাযন্ত্র ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। ফেলিক্সও টীকার বীজ লইয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত হন এবং পাকাপাকিভাবে আভায় বাস পরিবর্ত্তন করিবার আয়োজন করিতে থাকেন। প্রেরিত ছাপাখানাটি তত দিনে রেঙ্গুনে গিয়া পৌছে। আভার রাজা ফেলিক্স কেরীকে লইয়া

যাইবার জন্ত নৌকা প্রেরণ করেন। ফেলিক্স সপরিবারে ছাপাখানা সহ ২৩এ মে তারিখে যাত্রা করেন, পথে এক স্থানে নৌকাটিকে সুসজ্জিত করিবার জন্ত প্রায় তিন মাস বিলম্ব হয়। ৩১এ আগস্ট দ্বিপ্রহরে ইরাবতী নদীবক্ষে প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া নৌকাটিকে ডুবাইয়া দেয়। ফেলিক্সের চোখের সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র উইলিয়ম এবং কন্তা সলিল-সমাধি লাভ করেন; ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জাম, ব্রহ্মভাষার অভিধানের, কয়েকটি মঙ্গলসমাচারের বর্ম্মী অনুবাদের এবং বৌদ্ধ সুত্তের ইংরেজী অনুবাদের পাণ্ডুলিপি এক নিমেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলিক্স প্রায় পাগলের মত রাজধানী আভাতে উপস্থিত হন। রাজা অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার চিত্ত স্থির হইলে তাঁহাকে রাজদূত করিয়া বিশেষ জাঁকজমকের মধ্যে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। রাজকীয় ধনভাণ্ডার তাঁহার জন্ত উন্মুক্ত হয়, তাঁহাকে একটি খেতাব দেওয়া হয়। তিনি কলিকাতার রাস্তায় পঞ্চাশ জন অনুচর ও ছত্রধারী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বিশেষ আড়ম্বরের সহিত চলাফেরা করিতে থাকেন। তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করিতে শিখেন এবং অমিতাচারের জন্ত বারংবার ঋণজালে এমন জড়াইয়া পড়েন যে, পুত্রকে ঋণমুক্ত করিবার জন্ত উইলিয়ম কেরী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। পুত্রকে মিশনরী হইতে "অ্যাম্বাসাডারে" রূপান্তরিত হইতে দেখিয়াও উইলিয়ম কেরী মর্ম্মাহত হন। কিন্তু রাজদূত হিসাবে কাজ করিবার যোগ্যতা ফেলিক্সের ছিল না। কয়েকটি ব্যাপারে তাঁহার অক্ষমতা দেখিয়া ব্রহ্মদেশের রাজা এমনই চটিয়া যান যে, সেই বৎসরের শেষে রেঙ্গুনে ফিরিয়া ফেলিক্সকে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসর কাল ফেলিক্স পূর্ব্ব-ভারতবর্ষের অরণ্য-পর্ব্বতে

অত্যন্ত হীনভাবে জীবনযাপন করেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁহার শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে (২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

> ...for several years he was entirely lost to the cause. He wandered among the independent provinces to the east of Bengal, and passed through a series of adventures by land and by sea, which would appear incredible even in a novel. At one time he repaired to the court of one of the barbarous chiefs on the frontier, and was constituted his prime minister and generalissimo and led his forces to a conflict with the Burmese, in which from his utter ignorance of even the rudiments of military science, he was ignominiously defeated, and obliged to take refuge in the jungles. After three years of this wild and romantic life, he accidentally fell in with Mr. Ward, at Chittagong, and was persuaded to return to repose and usefulness at Serampore.

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় ওয়ার্ড নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য জলপথে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া ফেলিক্সকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন অবস্থায় দেখিতে পান। দীর্ঘকাল তাঁহার কোনও সংবাদই পাওয়া যাইতেছিল না। তিনি বাংলা দেশের পূর্ব্বসীমান্তে বন্য জাতিদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন; কাছাড়, জয়ন্তীয়া, মণিপুর হইয়া চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তী পথ অতিশয় দুর্গম বিধায় চীন পৌঁছিতে পারেন নাই। হতাশ হইয়া তিনি ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চল ভেদ করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক ভবঘুরেবৃত্তি চরিতার্থ এবং বিভিন্ন বন্য ও পার্ব্বত্য জাতির ভাষা ধর্ম্ম আচার-ব্যবহারাদি অনুশীলন করিয়া তিনি এক প্রকারের আনন্দ পাইতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ওয়ার্ড তাঁহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া শ্রীরামপুরে লইয়া আসিলেন

এবং বৃদ্ধ কেরী ও মার্শম্যান তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি পুনরায় ছাপা ও অনুবাদের কাজে পিতার সহযোগী হইলেন এবং বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁহার কাজ এখন হইতে আরম্ভ হইল।

ইতিপূর্ব্বে ১৮১২ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার অনূদিত ব্রহ্মভাষায় দুই-একটি মঙ্গলসমাচার মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন হইতে 'A Grammar of the Burman Language to which is added a list of the simple roots from which the language is derived' বইখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রহ্মভাষার অভিধান ও সংস্কৃত অনুবাদ সহ পালি ব্যাকরণও তিনি রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই পুস্তকে বাংলা অনুবাদও ছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কাল হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর ফেলিক্সের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন শান্তিপূর্ণ ও কর্ম্মবহুল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন; জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না, তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ডাক্তারেরা চীনে পাঠাইতে উপদেশ দেন, কিন্তু চীনযাত্রার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। ছয় মাস রোগভোগের পর পিতার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৬ই নবেম্বর 'সমাচার দর্পণ' লেখেন—"মোকাম শ্রীরামপুরে ফিলিক্স কেরি সাহেব ১০ নবেম্বর রবিবার বেলা তিন প্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বর্ম্মা প্রভৃতি নানা বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণস্বরূপে বহু দেশ ব্যাপিনী ছিল।...আর কএক রকম ভাষাতে বাইবেলের পুস্তক পড়িতেন...।" *The Story of the Lall-Bazar Baptist Church* পুস্তকে (১৯০৮) ই. এস, ওয়েঙ্গার লিখিয়াছেন, "তাঁহার বিধবা পরে রেভারেণ্ড জে. উইলিয়াম্সনকে বিবাহ করেন।" ইহা

হইতে অনুমান হয়, শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি তৃতীয় বার বিবাহ করিয়াছিলেন।

ফেলিক্স কেরী ও বাংলা ভাষা

ফেলিক্স কেরীর সহিত বাংলা ভাষার সম্পর্ক এই হিসাবে ঘনিষ্ঠ যে, তিনি ঠিক বাঙালীদের মত বাংলা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। বস্তুতঃ বাংলা ভাষা তাঁহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবঘুরের জীবন সমাপ্ত করিয়া শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত তিনি যদিও বাংলা ভাষায় উপরি-উল্লিখিত পালি ব্যাকরণের অনুবাদ ছাড়া কিছুই লেখেন নাই, কিন্তু বাইবেলের অনুবাদে এবং পিতার ইংরেজী-বাংলা অভিধান রচনায় তাঁহার যে বিশেষ হাত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ রামকমল সেন (কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ) তাঁহার ইংরেজী-বাংলা অভিধানটি মুদ্রণের নিমিত্ত কলিকাতার কোনও ছাপাখানায় প্রদান করেন, কিন্তু বইখানির বিপুল আয়তনের জন্য অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। পরে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে উহা মুদ্রণের জন্য দেওয়া হইলে ফেলিক্স সেই অভিধানটিকে নূতন সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পাদন করিতে থাকেন; স্থির হয়, রামকমল সেন ও ফেলিক্স কেরী উভয়ের নামে উহা প্রকাশিত হইবে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া যায়, ছাপা আরম্ভ হয়, কিন্তু ফেলিক্সের মৃত্যুর জন্য তাহা আর অগ্রসর হয় নাই।* রামকমল সেনের মূল অভিধান ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ফেলিক্সের অভিধান সম্পর্কে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ মার্চ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হয়—

* রামকমল সেনের অভিধান—ভূমিকা ৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই খালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।"—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড (৩য় সং) পৃ. ৭০।

ফেলিক্স ফিরিয়া আসিবার পর বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিকপত্র 'দিগ্দর্শন' (এপ্রিল ১৮১৮) শ্রীরামপুরের মিশনরী-গোষ্ঠী হইতে প্রকাশিত হয়। ফেলিক্সের মৃত্যুর পর 'সমাচার দর্পণে' (১৬ নবেম্বর ১৮২২) যে সংবাদ বাহির হয়, তাহাতে ফেলিক্সের রচনাবলীর মধ্যে 'দিগ্দর্শনে'র উল্লেখ আছে; যথা, "কলিকাতার স্কুলবুক সোসায়িটীর কারণ দিগ্দর্শন।" আজ সঠিক নির্দ্ধারণের উপায় না থাকিলেও অনুমান হয়, 'দিগ্দর্শনে'র বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি সমুদয়ই ফেলিক্সের রচনা। এইগুলিই পরবর্ত্তী কালে রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়া রামমোহনের রচনা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সপ্তম ভাগ বা অক্টোবর ১৮১৮ সংখ্যায় "ছাপা কর্ম্মের উৎপত্তির বিবরণ" ফেলিক্সের লেখা বলিয়া বোধ হয়। দশম ভাগ বা ১৮১৯ জানুয়ারি হইতে "হিন্দুস্থানের ইতিহাস" ধারাবাহিক ভাবে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কাল পর্য্যন্ত বাহির হয়। ইহাও ফেলিক্সের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

ফেলিক্সের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি 'বিদ্যাহারাবলী।' ইংরেজী ভাষায় 'এনসাইক্লোপীডিয়া' বিখ্যাত গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় একখানি সুবৃহৎ কোষ-গ্রন্থ রচনার বাসনা ফেলিক্সের হয়, তাঁহার মত দুঃসাহসী "অ্যাড্‌ভেন্‌চেরারে"ই এইরূপ ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কালে এই ইচ্ছা স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। তিনি 'বিদ্যাহারাবলী' নাম দিয়া এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি নিজে চিকিৎসা-বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন, অস্ত্রোপচারেই তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল, তিনি স্বভাবতই অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা দিয়া 'বিদ্যাহারাবলী' আরম্ভ করিলেন। ইহা যে কত বড় দুরূহ কাজ, এই পুস্তকটি যিনি চোখে দেখিবার সুযোগ পাইবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। পরিভাষার অভাব, দুরূহ এবং অভিনব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনায় ভাবের অভাব, কিছুতেই তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই। তিনি অদম্য উৎসাহে দুই-একজন পণ্ডিত এবং পিতা উইলিয়ম কেরীর সাহায্য লইয়া কাজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন 'সমাচার দর্পণে' সর্ব্বপ্রথম এই পরিকল্পনার কথা এই ভাবে প্রকাশিত হয়—

> "নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ডীয় পুস্তকহইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস২ ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক২ নম্বরের মূল্য ২ টাকা।

প্রথম খণ্ড 'বিদ্যাহারাবলী' প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে, পৃষ্ঠা ৪৮। গোড়াতেই ফেলিক্স কেরীর একটি নিবেদন ছিল। সেটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"বিদ্যাহারাবলীনাম গ্রন্থ লওনের নিমিত্তে

যাঁহারা স্বীকৃত হইয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন কিম্বা ইহার পরে করিবেন তাঁহারদিগের প্রতি

মেং ফিলিক্স কেরি সাহেবের পত্রমিদং।

॥ ১ ॥ যেমত অন্য২ দেশে মনুষ্যজাতি দুইপ্রকার অর্থাৎ মূর্খ এবং জ্ঞানী তদ্রূপ এতদ্দেশেতেও আছে। মূর্খেরা সর্ব্বদা পশুবৎ তাহারদিগের মধ্যে কেহ জ্ঞানাভিলাষী নয় কিন্তু নিতান্ত বিদ্বান যে ব্যক্তি তিনি তদ্রূপ নন তাঁহার চিত্ত অন্যপ্রকার কোনো এক বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে কিম্বা কোনো এক সময় কোন শিল্পকর্ম্ম দেখিলে যাবৎ সে বিষয়ের হেতু কিম্বা সে বিদ্যার আদ্যোপান্তকারণ জ্ঞাত না হন তাবৎ তাহার মনে কোনো সুখ প্রবিষ্ট হইতে পারে না যেহেতুক বিদ্বানেরদিগের মন সর্ব্বদা বর্দ্ধিষ্ণু এবং এক বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহাতে ক্ষান্ত নন কিন্তু সর্ব্বদা আরো জ্ঞাত হইতে বাঞ্ছা করেন।

॥ ২ ॥ পুনশ্চ ঐ বিদ্বানেরদিগের মধ্যে দুইপ্রকার লোক আছেন প্রথমতঃ যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসকরণে আরম্ভমাত্র করিয়াছেন দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা স্বদেশীয় সর্ব্বশাস্ত্রেতে প্রজ্ঞ হইয়া অন্য২ দেশীয় বিদ্যাবিষয়েও জ্ঞাত হওনে অত্যন্তাকাঙ্ক্ষী। এই দুইপ্রকার লোকের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করণে কেবল আরম্ভ মাত্র করিয়াছেন তাঁহারদিগের নিমিত্তে এইক্ষণে কলিকাতায় এবং অন্য২ স্থানে সাহেবানেরা এবং অন্য২ ভাগ্যবান এতদ্দেশীয় লোকেরা হিন্দুস্থানের মধ্যে বিদ্যাবাহুল্যের

জন্তে অনেক২ আয়োজন করিতেছেন এবং ঈশ্বরকৃপায় আরো হউক কেননা বিদ্যা সমুদ্রের ন্যায় তাহার অন্ত পাওয়া অতিদুঃসাধ্য।

॥ ৩ ॥ যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ সাহেবান এবং এতদ্দেশীয় অন্য২ ভাগ্যবান এবং বিশিষ্ট লোকেরদিগের আয়োজন দ্বারা এবং গ্রন্থ দ্বারা নানা বিদ্যার আদি প্রকরণ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানেতে বর্দ্ধিত হইলে অবশ্য তদ্‌গ্রন্থের সমস্ত মূল গ্রন্থ জ্ঞানেচ্ছুক হইবেন অতএব তাঁহারদিগের জ্ঞান যেন অধিক রূপেতে বর্দ্ধিত হয় এতৎপ্রযুক্ত ইউরোপীয়দিগের গ্রাহ্য তাবদায়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদিগ্রন্থাবলী ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অধিকন্তু যাঁহারা বহুকালাবধি ইউরোপ জাতীয়েরদিগের নানা জ্ঞান এবং বিদ্যা দেখিয়া অতিচমৎকৃত হইয়া সে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিদ্যা কিরূপে এবং কিপ্রকার প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই এমত স্বদেশীয় সর্ব্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনানন্তর অন্য২ ইউরোপজাতীয় বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক হইয়াছেন তাঁহারদিগের জ্ঞানবর্দ্ধনার্থে এবং অঙ্গবঙ্গ-কলিঙ্গাদি দেশেতে ইউরোপীয় তাবদায়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদিবর্দ্ধনার্থে এবং তাবদ্বিষয়ের আদ্যোপান্ত কারণ জ্ঞাপনার্থে এই বিদ্যাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জ্জমা হইয়া ছাপা হইবেক।

॥ ৪ ॥ এই গ্রন্থের প্রথম নম্বর অদ্য শ্রীরামপুরের ছাপাখানা-হইতে নির্গত হইয়াছে এবং যদি এই গ্রন্থ সর্ব্বগ্রাহ্য হয় এবং সকলে যদি এতৎকার্য্যে সাহায্যকরণাকাঙ্ক্ষী হন তবে ক্রমে যাবৎ একং২ করিয়া তাবদ্বিদ্যাগ্রন্থ সমাপ্তি না হয় তাবৎ প্রতি মাসে প্রথম দিবসে একং২ নম্বর ছাপা হইবেক। তৎপর যখন একং২ বিদ্যাগ্রন্থ ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ হইবেক তখন সমাচার দেওয়া যাইবে তাহাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা প্রতি মাসের নম্বর একত্র করিয়া বহি

বাঁধিতে পারিবেন ইতি॥ ইংরাজী সন ১৮১৯ আক্তোবর মাসের প্রথম তারিখ॥ বাঙ্গলা ১২২৬ শন ১৬ আশ্বিন।"

চৌদ্দ মাস ধরিয়া ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে ৪৮ পৃষ্ঠা হিসাবে 'বিদ্যাহারাবলী' বাহির হইয়া সূচী ইত্যাদি সহ মোট ৬৩৮ পৃষ্ঠায় প্রথম গ্রন্থ অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা সমাপ্ত হয়। মোট মূল্য ধার্য্য হয় ১৪ × ২৲ = ২৮৲। মূল গ্রন্থের টাইটেল-পেজ—

> বিদ্যাহারাবলী / অর্থাৎ / বাঙ্গালাভাষায়কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদশিল্প / বিদ্যাদি মূল গ্রন্থাবলী। / তৎপ্রথমগ্রন্থ। / ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।

ইহারই অনুরূপ একটি ইংরেজী টাইটেল-পেজও আছে। প্রথম খণ্ডের টাইটেল-পেজ এইরূপ—

> ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। / ফিলিক্স কেরিকর্ত্তৃক / পঞ্চমবারছাপাকৃত এনসক্লোপেদিয়াব্রিটানিকানামগ্রন্থাবলীহইতে বাঙ্গালাভাষায় কৃত। / গরিষ্ঠ উলিয়াম কেরিকর্ত্তৃক তর্জ্জমাবিবেচিত / শ্রীকান্তবিদ্যালঙ্কার-কর্ত্তৃক ভাষাবিবেচিত এবং শ্রীকবিচন্দ্র / তর্কশিরোমণিকর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত। / শ্রীরামপুরে মিশিয়ন্ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। / সন ১৮২০

ইহারও অনুরূপ ইংরেজী টাইটেল-পেজ আছে। সূচী ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই দেওয়া আছে।

বিষয়ের দুর্ব্বোধ্যতা ও দুরূহতা বিবেচনা করিলে ফেলিক্স যে ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই; পুস্তকের দীর্ঘ ঊনচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যবচ্ছেদবিদ্যাভিধান অর্থাৎ এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই পুস্তকের

পরিভাষার দুরূহতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কথা উঠিয়াছিল, কারণ, তৃতীয় সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৮১৯) হইতে মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ফেলিক্স কেরী-রচিত দুইটি শ্লোক মুদ্রিত হইয়াছে। যথা—

সর্ব্বজ্ঞাপনার্থকশ্লোকদ্বয়মিদং।

গ্রন্থে নির্ণীতমত্রামররভসজটাবিশ্বকোষেষু দৃষ্টৈঃ।
শিষ্টৈঃ প্রাচীনশব্দৈঃ সকলজনমুদেঽস্থ্যাদিশারীরতত্ত্বং॥
যৎকোষানাপ্তনাম্না পরমপি রচিতৈঃ কেবলৈর্যৌগিকৈস্তৎ।
মুগ্ধাভির্ব্বেত্ত্বমুদ্যৎসুবিমলমতিভিঃ সাধুসন্ধানপূর্ব্বং॥

দ্রক্ষ্যন্ত্যস্মিন্নবস্থং কমপি যদি পদন্যাসমেবাপ্যবোধ্যং।
সদ্যো বোধ্যং প্রসিদ্ধং বিদধতু ভবতাং সম্মতং সম্মতঞ্চেৎ॥
কিন্ত্বেতদ্বচ্মাবশ্যং পদগতবিষয়ং জ্ঞাপয়িত্বা বিশেষং।
কুর্ব্বীরংস্তেন মাঞ্চাপরমপি পরমানন্দসন্দোহযুক্তং॥

ইহার অর্থ—

অমর, রভস, জটাধর, বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে যে সকল প্রাচীন শিষ্ট শব্দ দেখা যায়, সকলের আনন্দবিধানার্থ এই গ্রন্থে সেই সকল শব্দের সাহায্যে অস্থ্যাদি শারীরতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। আর যে সকল শব্দ কোষসমূহে পাওয়া যাইবে না, তাহাদিগকে কেবল যৌগিক ও সাধু শব্দসকলের মিলন দ্বারা রচিত বলিয়া উদীয়মান সুবিমলবুদ্ধিশালী আপনারা জানিবেন।

এই গ্রন্থে যদি কোনও পদন্যাসকে অবোধ্য ও নিন্দনীয় দর্শন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই পদকে আপনাদের ও সজ্জনগণের সম্মত, প্রসিদ্ধ ও বোধযোগ্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিবেন। কিন্তু ইহাও বলিতেছি যে, সেই পদগত বিষয় ও তাহার বিশেষ জানাইয়া, তদ্দ্বারা আমাকে ও অন্যান্যকে অবশ্যই পরমানন্দিত করিবেন।

পুস্তকের মলাটের "ইস্তাহার" হইতে জানা যায় যে, ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যাসংক্রান্ত ছবি বা প্লেট স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়া সম্ভবতঃ আট আনা মূল্যে প্রত্যেকটি বিক্রীত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের শেষে ফেলিক্স কেরীর গোড়ার নিবেদনটি (যাহা পত্রাকারে উপরে মুদ্রিত হইয়াছে) একটু বাড়াইয়া ছাপা হইয়াছে। প্রথম তিন প্যারা যথাযথ রাখিয়া চতুর্থ প্যারা হইতে নিবেদনটিতে ৪ হইতে ১০ প্যারা নূতন যোজিত হইয়াছে। নূতন ৪—৭ প্যারা এইরূপ—

॥ ৪ ॥ অপর সকল বিদ্যাগ্রন্থে সংজ্ঞাশব্দ না হইলে নির্ব্বাহ হয় না অতএব যে স্থানে উপযুক্তসংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে তাহাই গৃহীতা হইয়াছে কিন্তু যে২ স্থানে উপযুক্তসংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই সেই২ স্থানে সাধ্যানুসারে সংস্কৃতসংজ্ঞা গঠান গিয়াছে এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীর তাবদ্গ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে। অপর কহি উপযুক্তসংজ্ঞা গঠনই অতি দুঃসাধ্য কার্য্য অতএব এই বিদ্যাহারাবলীগ্রন্থেতে যে২ সংজ্ঞা অনুপযুক্তা বোধ হয় সেই সকল জ্ঞাত করাইলে এবং তৎপরিবর্ত্তনে অন্য সংজ্ঞা দেওনে পারক হইলে অত্যাহ্লাদবিষয় হয় জানিবেন।

॥ ৫ ॥ অপর কেহ২ বিবেচনা করিয়া কহিয়াছেন যে সকলের সুবোধগম্য গ্রন্থ ছাপা কর না কেন এবং সহজ ভাষায় কিজন্যে রচনা কর না তদ্বিষয়ে উত্তর করি যে তাবদ্বিদ্যাগ্রন্থ কঠিন অতএব সহজ ভাষায় তর্জ্জমা প্রায় হয় না। অপর ইহাও বিবেচনা করুন যে বহুভ্যাসব্যতিরিক্ত কোনো এক বিদ্যাজ্ঞ হওয়া যায় না এবং যাঁহারা অভ্যাস করে তাঁহারদের মধ্যে সকলেই পরিপক্ক হন না তবে অনেক বিদ্যাতে সকলেই কিপ্রকারে হঠাৎ পরিপক্ক হইতে পারিবেন।

॥ ৬ ॥ অপরঞ্চ ইংলণ্ডীয় তাবদ্বিদ্যাগ্রন্থ তর্জ্জমা করিয়া ছাপা করা অতিবৃহৎ কার্য্য এবং অল্পকালে সম্পূর্ণ হইতে পারে না তাহাতে

সকলের সন্তোষ জন্মান অসাধ্য যেহেতুক সকল বিদ্যাই কঠিন। অপর সকলের প্রতি সকল বিদ্যা সমান সন্তোষজনিকা নয় তৎপ্রযুক্ত এবং অর্থশাস্ত্র সর্ব্বলোকার্থে সুগম করণ প্রায় অসাধ্য তৎপ্রযুক্ত যেং বিদ্যাগ্রন্থে সকলের সন্তোষ এবং হিত জন্মে তাহাই প্রথমে তর্জ্জমা করণের বাঞ্ছা ছিল কিন্তু তদ্বিষয়ে বাধিত হওয়ার কারণ জানাই বিশেষতঃ যে কোনো বিদ্যা বা হউক তাহার মূল গ্রন্থ অগ্রে না ছাপাইলে তন্নির্ভরকারী অন্য২ বিদ্যাগ্রন্থ শুদ্ধ হয় না অতএব দ্বিরুক্তিনিবারণার্থে এবং সংজ্ঞাশব্দ স্থিরকরণার্থে অনুমান হইল যে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা এবং কিমিয়াবিদ্যা অর্থাৎ রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ণ পূর্ব্বে চিকিৎসাবিদ্যা এবং অস্ত্র-চিকিৎসাবিদ্যা এবং ঔষধভেদবিদ্যা আরম্ভকরণে অনেক বাধা জন্মিবে।

॥ ৭ ॥ অতএব প্রথমতঃ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ছাপান গিয়াছে ইহার পরে রসায়নবিদ্যা এবং সংসারবিদ্যা এবং ঔষধচিকিৎসাবিদ্যা এবং অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা এবং ঔষধনির্ম্মাণবিদ্যা ইত্যাদি ক্রমেতে ছাপাকরণের বাঞ্ছা আছে কিন্তু এইক্ষণে স্বাক্ষরকারির ন্যূনতাপ্রযুক্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্র ছাপানের অগ্রে প্রয়োজনপ্রযুক্ত আগামি সালে স্মৃতিশাস্ত্র ছাপান যাবে পরে কথিত বিদ্যা পূর্ব্ববাক্যানুসারে ক্রমেতে ছাপান যাইবে।

ফেলিক্স কেরী স্বয়ং যদিও স্বাক্ষরকারী অর্থাৎ গ্রাহকের ন্যূনতার কথা লিখিয়াছেন, পাদরি লং কিন্তু তাঁহার "ক্যাটালগে" বলিয়াছেন "there were 300 native subscribers to it"। আমাদের মনে হয়, লঙের খবর সত্য নহে, মাসিক ছয় শত টাকা আয় হইলে 'বিদ্যাহারাবলী' বন্ধ হইত না।

'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'র ভাষার নিম্নোদ্ধৃত নমুনা দুইটি দেখিলে ১৩২ বৎসর পূর্ব্বে ফেলিক্স কি দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিব—

(ক) ঐ ব্যবচ্ছেদবিদ্যাভ্যাসকরণে যুগমার্থে চিকিৎসকেরা ব্যবচ্ছেদবিদ্যাকে দুই ভাগ করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। প্রথমতঃ (আনাতোমি) অর্থাৎ শরীর কোন দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত এবং ঐ শরীরের প্রত্যেক অবয়ব কিপ্রকার এবং কিসের দ্বারা সম্মিলিত। দ্বিতীয়তঃ (ফিসিওলজি) অর্থাৎ দৃশ্যাদৃশ্যবস্তুর সংযোগবিদ্যা ফলতঃ শরীরের মধ্যে যে২ দ্রব্য আছে সে সকল কি প্রকার এবং কাহার দ্বারা চালিত হন তদ্বিদ্যা।

শরীর ঘন এবং দ্রব বস্তুদ্বারা নির্ম্মিতপ্রযুক্ত ব্যবচ্ছেদকেরা ব্যবচ্ছেদবিদ্যাকে দ্বিধা করিয়াছেন।

॥ ১ ॥ শরীরমধ্যে ঘনবস্তুর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।

॥ ২ ॥ দ্রববস্তুর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।

॥ প্রথমতঃ ॥ এই দুই বিদ্যার মধ্যে প্রথম ঘনবস্তুর নির্ণয় করি। শরীরের মধ্যে যে২ বস্তু দ্রবীভুত নহে তাহা ঘন এবং ঐ ঘন বস্তুকেও ব্যবচ্ছেদকেরা দ্বিধা করিয়াছেন। বিশেষতঃ

॥ ১ ॥ অতি ঘন অর্থাৎ অস্থি। ঐ অতিঘন বস্তুর ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যাকে (অস্তিওঁলজি) অর্থাৎ অস্থিবিদ্যা কহিয়াছেন ফলতঃ অস্থির নির্ণয়।

॥ ২ ॥ ন্যূনঘনবস্তু। ব্যবচ্ছেদকেরা ঐ ন্যূনঘনবস্তুর (সার্কোলজি) সংজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ মাংসনির্ণয়বিদ্যা।

এই স্থানে আমারদিগের এ কথা কথন উচিত যে ঐপ্রকার ঘন এবং দ্রববস্তু নামেতে শরীরের পৃথক২ নির্ণয়করণ প্রথমতঃ সাধারণ লোকেরদিগের মূর্খতাতে উৎপন্ন হইয়াছিল যেহেতুক তাহারা শরীরের মধ্যে কেবল মাংস এবং অস্থি এই উভয় ভেদজ্ঞ ছিল। শরীরের মধ্যে অনেকপ্রকার কোমল এবং মাংসবদংশপ্রযুক্ত ব্যবচ্ছেদকেরা মাংসবিদ্যা বহুধা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। পৃ. ১-২

(খ) মাংসপেশীর ক্রীড়াবিষয়ে আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে মাংসপেশীর ক্রীড়াসময়ে তন্তুসমস্ত খর্ব্ব এবং স্ফীত হয় কিন্তু ঐ সমস্ত কিপ্রকারে হয় তাহা কথনে অক্ষম। তদ্ভিন্নও ইহা আমরা নিশ্চয় জানি যে মাংসপেশীর ক্রীড়াবিষয়ে শিরার প্রয়োজন আছে যেহেতুক মাংসপেশীতে গমনকারিণী কোনো এক শিরা রজ্জু দিয়া বদ্ধ করিলে কিম্বা ছিন্ন করিলে ঐ মাংসপেশী ক্রীড়াকরণে অক্ষম হয়। অপর মাংসপেশীতে প্রবেশকারিণী কোনো এক রক্তপ্রবাহক নাড়ী রজ্জুদ্বারা ঐরূপে বদ্ধ করিলে ঐ মাংসপেশীও ক্রীড়াকরণে অক্ষম উহাতে প্রমাণ হয় যে মাংসপেশীর ক্রীড়নবিষয়ে রক্তপ্রবাহেরও প্রয়োজন আছে তাহাতে পক্ষাঘাতরোগের কারণ অনুসন্ধান করিলে মাংসপেশীতে পাওয়া যায় না কিন্তু মাংসপেশীগমনকারিণী শিরাতে কিম্বা মস্তিষ্কের কিম্বা কশেরুকামজ্জার শিরাতে পাওয়া যায়। (পৃ. ১২৮)

'বিদ্যাহারাবলী'র দ্বিতীয় গ্রন্থ স্মৃতিশাস্ত্র Jurisprudence (পীয়ার্স কেরী)। ফেলিক্স কেরীর মৃত্যুর পর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ফেলিক্সের রচনাবলীর মধ্যে "A work on law in Bengalee, not finished at press" এই উল্লেখ আছে। 'সমাচার দর্পণে'র মৃত্যু-সংবাদেও (১৬ নবেম্বর ১৮২২) আছে "স্মৃতি নামে এক পুস্তক ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা" করিতেছিলেন। 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'র সর্ব্বশেষ নিবেদনে (উপরে উদ্ধৃত) স্মৃতিশাস্ত্র প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি আছে। 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'র শেষ খণ্ড বাহির হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর। তাহার পর দুই মাস 'বিদ্যাহারাবলী' প্রকাশ বন্ধ থাকে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় গ্রন্থ 'স্মৃতিশাস্ত্রে'র প্রথম সংখ্যা বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪০। মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়—

> স্মৃতিশাস্ত্র সুবোধার্থে যোগ্যশব্দ গঠন অতি দুঃসাধ্যপ্রযুক্ত বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থের এই নম্বরের অনেক গৌণ হইয়াছে কিন্তু ইহার পর পূর্ব্বরীত্যনুসারে মাসে২ এক২ নম্বর ছাপা হইবে। এই নম্বর অবধি করিয়া এক২ পৃষ্ঠেতে পংক্তির সংখ্যা অধিক হওয়াতে কেবল চল্লিশ পৃষ্ঠ এক২ নম্বরে ছাপান যাইবে ইতি।

মূল্য প্রতি সংখ্যা পূর্ব্ববৎ দুই টাকাই ধার্য্য হয়। 'স্মৃতিশাস্ত্রে'র ২য় সংখ্যা যথারীতি মার্চ মাসেই বাহির হয়, কিন্তু মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই "ইস্তিহার" দেওয়া হয়—

> স্বাক্ষরকারিরদের অভাবপ্রযুক্ত এই বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থ এই অবধি করিয়া মাসে২ নম্বর২ রূপে ছাপা না হইয়া উত্তরোত্তর অল্পে২ ছাপা হইয়া এক২ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বই বান্ধিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

অর্থাৎ 'বিদ্যাহারাবলী'র প্রকাশ এইখানেই সমাপ্ত হয় এবং 'স্মৃতিশাস্ত্র'ও এই পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।

'স্মৃতিশাস্ত্র' বিষয়টিই এরূপ দুরূহ যে, বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করা এক প্রকার অসাধ্যসাধন। ফেলিক্স কেরী সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সাহায্য লইয়া সেই অসাধ্যও যে কি ভাবে সাধন করিয়াছিলেন, নীচের উদ্ধৃতিগুলি হইতে তাহা প্রমাণ হইবে—

> (ক) এতদ্রূপে যখন স্রষ্টা সংসার সৃষ্টি করিলেন এবং অবস্তু হইতে বস্তু সৃষ্টি করিলেন তখন ঐ বস্তুতে তিনি কতকগুলি মূল নিয়ম নিরূপণ করিলেন ঐ বস্তু ঐ নিয়মবহির্ভূত হইতে পারে না হইলে সে লুপ্ত হয়। যখন স্রষ্টা প্রথমতো বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে গতিশক্তি প্রদান করিলেন তখন তিনি কতকগুলি কার্য্যনিয়ম নিরূপণ করিলেন তাহাতে গতিবিশিষ্ট তাবদ্বস্তু তন্নিয়মাধীন জানিবেন। অপর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্য অনুধাবনকরণানন্তর ক্ষুদ্র কার্য্য অনুধাবন

করি বিশেষতো যখন কোনো শিল্পকর ব্যক্তি ঘড়ী কিম্বা অন্য কোনো কল নির্ম্মাণ করে তখন সে সেই কলের গতির নিয়মার্থে স্বেচ্ছানুসারে তৎকলস্বভাবাধীন কতগুলি নিয়ম নিরূপণ করে…। (পৃ. ১-২)

(খ) প্রাচীন রাজনীতিরচকেরা কহেন যে প্রভুত্ব বিষয়ে কেবল মতত্রয় হইতে পারে তাহা বিশেষিয়া কহি প্রথমতঃ যখন প্রভুত্ব প্রজাতে অর্পিত হয় তখন তাহারে প্রজাপ্রভুত্ব বলি দ্বিতীয়তঃ যখন কুলীন সঙ্ঘেতে অর্পিত হয় তখন তাহাকে কুলীনপ্রভুত্ব কহি তৃতীয়তঃ যখন এক ব্যক্তিতে অর্পিত হয় তখন তাহারে একপ্রভুত্ব কহি এতদ্ভিন্ন অন্য২ সমস্ত রাজশাসন মত কথিত মত হইতে উৎপন্ন হয় ইহা পণ্ডিতেরা কহেন। (পৃ. ১৬)

(গ) ইংলণ্ডীয় রাজ্যের করণীয় প্রধান শক্তি এক ব্যক্তিতে অর্পিতা বিশেষতঃ রাজাতে কিম্বা রাণীতে অর্পিতা।

রাজপদাভিষিক্ত ব্যক্তির এই২ বিষয় বিবেচনার্হ বিশেষতঃ তাঁহার পদবী তাঁহার বংশ তাঁহার মন্ত্রী তাঁহার করণীয় তাঁহার স্বত্ব বা শক্তি তাঁহার কর।

রাজার পদবী বিষয়ে কহি ইংলণ্ডীয় মূল ব্যবস্থাদ্বারা রাজমুকুট সর্ব্বদা উত্তরাধিকারিগামি হয় এবং তদ্রূপে থাকে। (পৃ. ৭৪)

পীয়ার্স কেরীর মতে ফেলিক্স শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া [সম্ভবতঃ শ্রীরামপুর] কলেজের জন্য ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। প্রথমটির মূল জেম্‌স্ মিলের ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল ; দ্বিতীয়টির মূল গোল্ডস্মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাস। ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের ফেলিক্স-কৃত অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কোনও বিবরণীতেই ইহার উল্লেখ

পাওয়া যায় না। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মৃত্যু-সংবাদে ফেলিক্সের রচনাবলীর মধ্যে এই দুইটি পুস্তকের এইরূপ উল্লেখ আছে—(১) Translation into Bengalee of an abridgement of Goldsmith's History of England printed at the Serampore Press for the School Book Society, (২) Translation into Bengalee of an abridgement of Mill's History of British India, for the School Book Society, now in the Press* ।

'সমাচার দর্পণে'র মৃত্যু-সংবাদে দ্বিতীয় বইখানির কোনই উল্লেখ নাই। মনে হয়, ইহা মুদ্রিত করিবার সুযোগ ঘটে নাই। প্রথম পুস্তকখানি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির পক্ষ হইতে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। টাইটেল-পেজটি এইরূপ—

> ব্রিটিন্ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়. / অর্থাৎ / জুলিয়স্ কাইসরের ব্রিটিন্ দেশাতিক্রমসময়াবধি, / আইমেন্স নামে প্রসিদ্ধ সন্ধিসময়পর্য্যন্ত, / মহাব্রিটিনের বিবরণ সঞ্চয়. / তন্মধ্যে জুলিয়স্ কাইসরের কালাবধি দ্বিতীয় জর্জ্জ নামে রাজার মৃত্যুপর্য্যন্ত, / গোল্‌দস্মিৎউপাধ্যায়কর্ত্তৃক বিবরণীকৃত : / এবং ঐ জর্জ্জের মরণাবধি ১৮০২ শালের আইমেন্স নামক সন্ধিসময়পর্য্যন্ত, / অন্য এক প্রথিত প্রজ্ঞোপাধ্যায়কর্ত্তৃক বিবরণীকৃত. / ফিলিক্স কেরিকর্ত্তৃক বাঙ্গালাভাষায় কৃত. / C. S. B. S. / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল, ইতি. / শন ১৮১৯.

* "Several years ago, the Committee entered into an engagement with Mr. J. C. Marshman for 80 additional numbers of the Digdorshun. These were to be compiled from Mill's celebrated History of British India, so as to contain a complete epitome of that important subject. of this work 1000 copies of each of the first ten numbers have been received into the depository."—*The Sixth Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings*, 1826, p. 8.

ইংরেজীতে অনুরূপ একটি টাইটেল-পেজ আছে, শুধু প্রকাশ-সন ১৮১৯ স্থলে ১৮২০ ছাপা হইয়াছে। পুস্তকটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা—সূচী ৬, শব্দ-সূচী ১৯ এবং মূল পুস্তক ৪১২।

এই পুস্তকের ভাষা লইয়া 'লিটারারি গেজেট' নামক সংবাদপত্রে কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮৩০) বিস্তর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সমাচার দর্পণ' জবাবে লেখেন—

> ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লণ্ডদেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় নাম ও ইংগ্লণ্ডীয় উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং অনেকের অগ্রাহ্য হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গলা ভাষার মর্ম্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাঙ্গলা কথা ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রূপ তৎকালে অন্য কোন ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ক্ষমতাপন্ন ঐ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্য কোন সাহেব ছিলেন না অবিকল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় ইংগ্লণ্ড দেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে পারে।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, ৩য় সং পৃ. ৬০

এই পুস্তক পরবর্ত্তী কালে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়, কিন্তু তাহাতে উপরোক্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল

কি না জানি না। এই বহুনিন্দিত পুস্তকের* তিনটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) রূমীয়দিগের অধিকার হওনের পূর্ব্বে ব্রিটন্ দেশ পৃথিবীর অপর২ অংশেতে অত্যল্প খ্যাত ছিল. অপর গাল্ দেশের সম্মুখস্থতটে সকল তদ্দেশীয় প্রজাগণেরদের উদ্যোগদ্বারা যে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত, তাহারি বাণিজ্যের কারণ অনেক২ সওদাগর সর্ব্বদা সে দেশে যাইত. ইহাতে অনুভব হয়, যে ঐ সকল সওদাগরেরা, যে সকল সমুদ্রতীরেতে প্রথমতো বাস করিয়াছিল, কিছুকাল পরেতেই সে সকল স্থান অধিকার করিয়া লইল; পরে সে দেশ অতিরমণীয় এবং বাণিজ্যোপযুক্ত দেখিয়া বাণিজ্যহেতুক সমুদ্রসান্নিধ্যবাস করিয়া প্রজারদের মধ্যে কৃষিকর্ম্মাদি বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইল. কিন্তু সমুদ্রতটের দূরবাসী লোকেরা সে ভূমি অধিকার করিয়া রাখা আপনারদিগের ধর্ম্ম ইহা বোধ করিয়া, এবং উহারা আমারদিগের অর্থের অপহারক এই বিবেচনাতে, ঐ নূতন আগত লোকেরদিগের সহিত সমুদায় ব্যবহার ত্যাগ করিল. (পৃ. ১)

(খ) যখন চার্ল্‌স রাজা সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, তখন ত্রিংশদ্বৎসরবয়স্ক ছিলেন, দেখিতে সুন্দর এবং আচারেতে বিচক্ষণ, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রজারদের মর্য্যাদাধারহওনোপযুক্তপাত্র ছিলেন; এবং বন্ধনদশাতে আত্মমন্ত্রিবর্গেরদের সহিত নিত্যাহ্লাদামোদস্বভাবপ্রযুক্ত, সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেও, ঐ সাদরস্বভাব ত্যাগ করিলেন না; এবং বাল্যাচরণপ্রযুক্ত তাঁহার পূর্ব্বীয় দ্বেষজন্ত অনিষ্টাচরণে কোনহ কাহারো শঙ্কা পাইবার আশঙ্কাও ছিল না. (পৃ. ২২৯)

* রেভারেণ্ড লং ও তাঁহার ক্যাটালগে এই পুস্তকের নামানুবাদের নিন্দা করিয়াছেন।

(গ) পরে কোনো ভেদ না করিয়া রাজ্যের তাবৎস্থানহইতে মহাসভ্যেরদিগকে একত্র করিয়া, রাজ্যের রক্ষার এবং তদ্ধিতের নিমিত্তে চেষ্টা পাইতে লাগিল. ঐ সভ্যেরা একত্র হইয়া, হানোবর রাজ্যের মনোনীত কর্ত্তার নিকটে পত্র প্রেরণ দ্বারা, মরণাপন্ন রাণীর সংবাদ জ্ঞাত করাইয়া, হলণ্ড রাজ্যে তাঁহাকে আগমন করিতে প্রার্থনা করিলেন এবং কহিয়া পাঠাইলেন, যে সেই স্থানে পঁহুছিলে আপনাকে ইংলণ্ডরাজ্যে আনিবার নিমিত্তে, ইংলণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজসমূহ প্রস্তুত থাকিবে. (পৃ. ২৮১)

ফেলিক্স কেরীর সর্ব্বশেষ পুস্তক যাহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাও অনুবাদ—বানিয়ানের 'পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেসে'র অনুবাদ। এই পুস্তক 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' নামে দুই খণ্ডে বাহির হয়। প্রথম খণ্ড বাহির হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৯৭ ; দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ফেলিক্সের মৃত্যু-বৎসরে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪০।

বইখানির ইংরেজী ও বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

The / Pilgrim's Progress / From This World / to / That which is to come. / By John Bunyan. / Part I. / Translated into Bengalee, / By F. Carey. / Serampore : / Printed at the Mission Press, / 1821.

যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ। / অর্থাৎ / ইহলোকহইতে পরলোকে গমনবিবরণ। / বিশেষতঃ / ॥১॥ যাত্রিরা কোন বিষয়দ্বারা প্রথমে চালিত হইয়া যাত্রারম্ভ করিয়াছিল। / ॥২॥ পথে তাহারদের কিং দুঃখকষ্ট ঘটিয়াছিল। এবং / ॥৩॥ বাঞ্ছিতদেশ কিরূপে স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক প্রাপ্ত হইয়াছিল এতদ্বিবরণ। / য়োহন্ বন্ধ্যান্‌কর্ত্তৃক তৎস্বপ্নলভ্য এই গ্রন্থবিবরণ রচিত হইয়াছে। / ॥ আমি দৃষ্টান্তব্যবহার করিয়াছি ॥ হোশিআ বাক্য ১২ প। ১০ পদ ॥ / এতৎগ্রন্থের দুই ভাগ। / প্রথম

ভাগে যাত্রির স্বীয় অগ্রেসরণ বিবরণ। / দ্বিতীয় ভাগে তাহার পরিবারের অগ্রেসরণ বিবরণ। / এবং গ্রন্থান্তে গ্রন্থকর্ত্তার সংক্ষেপতো বিবরণ। / ফিলিক্স কেরকর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অর্থসংগৃহীত। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ইংগ্রণ্ডীয় সন ১৮২১ শাল। বাঙ্গালা সন ১২২৮ শাল।

ভাষার নমুনা এইরূপ :

কান্তাররূপ এই জগতে ভ্রমণ করত যেখানে এক গুহা ছিল এমত এক স্থানে আমি উপস্থিত হইয়া শয়ন করত নিদ্রায় পড়িলাম। পরে দেখ স্বপ্নে দর্শন করত ছিন্নবস্ত্র পরিহিত আপন গৃহের দিগে বিমুখ এক পুস্তক হস্তে এবং পৃষ্ঠে এক ভারি বোঝা এমত এক লোককে স্বপ্নে দেখিলাম। পরে দৃষ্টি করত সেই লোককে সেই পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিতে দেখিলাম এবং পাঠ করত সে ব্যক্তি ক্রন্দমান ও কম্পমান হইতে লাগিল। পরে অধিক ধৈর্য্যকরণে অসমর্থ হইয়া সে ব্যক্তি এক মহাবিলাপ শব্দ করিয়া আমি কি করিব এই কথা কহিয়া চেঁচাইতে লাগিলঃ।

অপরঞ্চ ঐরূপ দশাপন্ন হইয়া সে ব্যক্তি স্বগৃহে ফিরিয়া গেল। পরে তাহার স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি তাহার দুঃখ না জানে এই নিমিত্তে সে সাধ্যপর্য্যন্ত ধৈর্য্য করিয়া রহিল। পরে তাহার মনোদুঃখ অধিক বৃদ্ধি হওয়াতে সে বহুকাল মনোধারণ করিতে পারিল না তাহাতে অবশেষে সে স্বমনের কথা ভাঙ্গিয়া আপন স্ত্রী পুত্রাদির সহিত এতদ্রূপ কথোপকথন করিতে লাগিল যে ওহে আমার প্রিয়াস্ত্রী ওহে আমার ঔরসের সন্তান যে তোমরা আমি তোমারদের নিতান্ত মঙ্গলেচ্ছুক জানিবেন মৎপৃষ্ঠের উপরে যে এই অতি ভারি বোঝা ইহাতে আমি আপনাহইতেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিলাম। তদ্ভিন্ন আরও কহি স্বর্গস্থ নির্গতাগ্নিদ্বারা আমারদের এই নগর ধ্বংস হইবে ইহার নিশ্চয়

সম্বাদ পাইয়াছি এবং আমারদের উদ্ধারের জন্ত কোন এক পথ যদি না পাওয়া যায় এবং তাহা পাইবার ভরসাও দেখি না তবে সেই ভয়াবহ ধ্বংসের মধ্যে আমি এবং তুমি যে আমার স্ত্রী এবং তোমরা যে আমার বালক আমরা সকলেই বিনষ্ট হইব॥ ॥ঐ সকল কথা তাহার কুটুম্ববর্গেরা শুনিয়া বড় চমৎকৃত হইল সে যে ঐ সকল কথা সত্যজ্ঞান করিয়া কহিল ইহাতে নহে কিন্তু এঁহার মনোবিকার প্রযুক্ত এমত হইয়াছে এবং রাত্রি উপস্থিতা হইলে এঁহার নিদ্রা হইলে ভাল হইতে পারে ইহা বোধ করিয়া তাহার কুটুম্ববর্গেরা তাহাকে শীঘ্র শয়ন করাইল। কিন্তু নিদ্রা না যাইয়া সে ব্যক্তি দিবসের ন্তায় রাত্রিতেও উৎকণ্ঠিত হইয়া সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিল। অপর প্রভাত হইলে সে কিপ্রকার ছিল তাহা কুটুম্বেরা জানিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল তাহাতে সে তাহারদিগকে কহিল যে আমি অধিকোদ্বিগ্ন আছি। ঐ কথা কহিয়া সে পুনর্ব্বার কুটুম্ববর্গের নিকটে কথোপকথন করণে আরম্ভ করাতে তাহারদের মন অধিক কঠিন হইতে লাগিল। অপর তাহারা ভাবিল যে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরাচরণদ্বারা এঁহার পীড়া দূরীকৃতা হইতে পারে ইহা ভাবিয়া তাহারা কখনো২ তাহাকে বিদ্রূপ করিত ও কখনো২ বিমর্ষ করিত এবং কখনো২ তাহাকে ফিরিয়াও দেখিত না অতএব সে তাহারদের নিমিত্তে প্রার্থনা করণার্থে ও তাহারদের নিমিত্তে দুঃখিত হইয়া আপন দুর্দ্দশাতে বিলাপকরণার্থে স্বকীয় কুঠরী মধ্যে একাকী যাইত। এবং কখনো২ একাকী ক্ষেত্রে যাইয়া পুস্তক পাঠ করিত ও কখনো২ কুটুম্বের নিমিত্তে প্রার্থনা করিত এতদ্রূপে সে কতক দিবস কাল যাপন করিল।

অপরঞ্চ কোনো এক সময়ে আমি দেখিলাম যে সে ব্যক্তি ক্ষেত্রের মধ্যে গতায়াত করত ও পূর্ব্বরীত্যনুসারে পুস্তক পাঠ করত

মনোমধ্যে বড় দুঃখ উপস্থিত হইলে আমি পরিত্রাণের নিমিত্তে কি করিব এইরূপ কথা কহিয়া পূর্ব্বানুরূপ রোদন করিতে লাগিল।

অপর আমি দেখিলাম যে সে চতুর্দিগে দৃষ্টি করত এবং দৌড়িয়া পলায়নোদ্যুক্ত মনুষ্যের প্রায় অথচ স্তম্ভিত প্রায় দণ্ডায়মান হইল কেমনা সে কোনদিগে যাইবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। পরে তুমি কি জন্যে রোদন করিতেছ এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এমন মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক জনকে আমি তাহার নিকটে আসিতে দেখিলাম।

অপর সে ব্যক্তি উত্তর করিল যে হে মহাশয় আমার হস্তে যে পুস্তক আছে তদ্দ্বারা আমি দেখিতে পাইতেছি যে আমি দোষীকৃত হইয়াছি। তদর্থে আমার মরণ হইবে এবং মরণানন্তর আমার বিচারে যাইতে হইবে তাহাতে পূর্ব্ববিষয়েতে আমার কোনো বাঞ্ছা নাই এবং শেষ কথিত বিষয় সহ্য করিতেও আমার সাধ্য নাই।

তখন মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন। এই সংসারে পদে২ দুঃখ হয় অতএব মরণের ইচ্ছা তোমার নাই কেন। সে ব্যক্তি কহিল আমার আশঙ্কা আছে যে মৎপৃষ্ঠের এ বোঝার ভারেতে আমি কবরহইতে নীচস্থানে ক্ষিপ্ত এবং তোফেৎ নাম স্থানে পতিত হইব এইহেতুক। এবং আরও কহি যে হে মহাশয় আমি যদি কারাগারে যাইতে সসজ্জ নহি তবে বিচারেতে এবং বিচারস্থানহইতে দণ্ডস্থানে যাইতেও প্রস্তুত নহি। অতএব এসকল বিষয়েতে ভাব্যভাবনাপ্রযুক্ত রোদন করিতেছি।

তখন মঙ্গলব্যঞ্জক কহিলেন। তোমার দশা যদি এমত তবে কি জন্যে এই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ। সে ব্যক্তি বলিল আমি কোথায় যাইব তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি না এইহেতুক। তখন আগামিক্রোধহইতে পলায়ন কর এ কথা লিখিত এক চর্ম্মপুস্তক মঙ্গলব্যঞ্জক তাহাকে দিলেন।

পরে সে ব্যক্তি ঐ পুস্তক পড়িয়া এবং মঙ্গলব্যঞ্জকের দিগে স্থির দৃষ্টি করিয়া আমি কোনদিগে পলায়ন করিব এ কথা অতি চেষ্টাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল। তখন মঙ্গলব্যঞ্জক এক বড় প্রশস্ত মাঠের মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ঐ দ্বার দেখিতে পাইতেছ কি না তাহাতে সে কহিল যে না। তাহাতে মঙ্গলব্যঞ্জক কহিলেন যে ঐ জাজ্বল্যমান আলো দেখিতে পাও কি না তাহাতে সে বলিল বুঝি দেখিতে পাই। পরে মঙ্গলব্যঞ্জক কহিলেন যে ঐ আলোকে দৃষ্টিতে রাখিয়া বেগে যাও পহুঁছিলে ঐ দ্বার দেখিতে পাইবা সেই দ্বারেতে ঘা মারিলে তোমার করণীয় তোমাকে কহা যাইবেক। (১ম ভাগ, পৃ. ১-৪)

যাত্রির আপদ্ কত কত বা তাহার।
না জানি বিপক্ষ আছে সংখ্যা নাহি তার॥
আর পাপ করিবার পথ শত শত।
ইহা কোনো মনুষ্যেতে নহে অবগত॥ ১॥
খানায় পড়িয়া কেহ নষ্ট হইয়াছে।
পথে পড়ি গড়াগড় কেহ বা দিতেছে॥
কেহ বা বৃশ্চিক মুখে যাইতে না পারে।
কিন্তু অনায়াসে অহিমুখে গিয়া মরে॥ ২॥...

যাত্রাপ্রসরণবিবরণ গ্রন্থ এবং অন্য২ অনেক গ্রন্থরচনাকর্ত্তা যোহন্ বন্যান্ নামক অতিখ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তি ১৬২৮ শালে বেদ্‌ফোর্ড নামক নগরহইতে ক্রোশার্দ্ধান্তর এল্‌ষ্টোনামক গ্রামে অতিনীচ কুলে জন্মিয়াছিলেন তাঁহার পিতা তৈজসপাত্র ঝালিয়া বেড়াইতেন। তথাপি তাঁহার পিতামাতা লেখাপড়া বিষয়ে আত্মসংস্থানানুসারে তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দুষ্টমতি এই মত বর্দ্ধিতা হইয়াছিল যে তিনি অল্পদিনের মধ্যে লেখাপড়া তাবৎ প্রায় ভুলিয়া গেলেন এবং বালক-

কালাবধি সমস্ত প্রকার নীচব্যবহারেতে বিশেষতঃ পয়ের শাঁপ দেওনেতে এবং সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিন্দাকরণে তিনি এইমত রত ছিলেন যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্টাস্বঙ্গিরদের অপেক্ষা অধিক দুষ্ট ছিলেন। তিনি আপনার বিষয় কহিতেন যে আমি নগরস্থ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পাষণ্ড এবং অল্পকালমধ্যে অসৎকার্য্যেতে এই মত নিপুণ হইলেন যে তাঁহার পরিচিত সৎপ্রতিবাসিরা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং তিনি সমস্ত প্রকার অসৎ এবং পাষণ্ড কার্য্যকারিরদের অগ্রগণ্য ছিলেন।

তথাপি ঐ সমস্ত অসঙ্গত দুষ্ট কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বর তাঁহার মনোমধ্যে আপনাকে সাক্ষ্যরহিত রাখিলেন না। ঐ য়োহন্ বস্তানের অন্তঃকরণে অনেক বাধা এবং নরকবিষয়ক অনেক ভয়জনক আশঙ্কা উপস্থিতা হইল। অপর পাপকর্ম্মে অনেক কালযাপন করাতে তাঁহার স্বপ্নপ্রভৃতি কখনো২ অতিভয়ঙ্কর হইত এবং দুষ্কর্ম্মেতে এবং অপকর্ম্মেতে নিমগ্ন তাঁহার অত্যাহ্লাদসময় মৃত্যু বিষয়ক এবং বিচার-দিবসবিষয়ক চিন্তা তাঁহার মনে উপস্থিতা হইত। কথিতরূপে দুষ্ট হইলেও ঈশ্বর অত্যাশ্চর্য্যরূপে অনেক বার তাঁহাকে মৃত্যুহইতে রক্ষা করণেতে তাঁহার প্রতি দণ্ডের সহিত অনুগ্রহও অতিকৃপাপূর্ব্বক মিশ্রিত করিলেন তাহা বিশেষিয়া কহি একবার বেদ্‌ফোর্ডনামক নগরসমীপে ঔস্‌নামক নদীতে পতনদ্বারা এবং অন্য এক বার সমুদ্রের এক খালেতে পতনদ্বারা তিনি প্রাণমাত্র লইয়া বাঁচিয়াছিলেন। অপর ১৬৪৫ শালে সতের বৎসর বয়স্ক সময়ে তিনি মহাসভ্যেরদের সৈন্যকার্য্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং লিস্তরনামক নগর আক্রমণসময়ে অস্ত্র প্রহর দেওনার্থে ব্যূহস্থ সৈন্যহইতে ভিন্ন হওয়াতে এবং তাঁহার সম্মতিতে অন্য এক সেনা তৎপদে নিযুক্ত হওয়াতে তিনি বাঁচিয়া

গেলেন যেহেতুক তাঁহার পদে নিযুক্ত সেনা গোলার দ্বারা মস্তকে বিদীর্ণ হইয়া মরিল।

কিন্তু দণ্ডেতে বা অনুগ্রহেতে তাঁহার কঠিন অন্তঃকরণে কিছু স্থির প্রবোধ জন্মিল না। পাপের আপদ্ এবং দুষ্টতাবিষয়ে তিনি অচেতনমাত্র ছিলেন না কিন্তু সর্ব্বপ্রকার ভারি বিষয়ের শত্রু ছিলেন। অধিক কি কহিব ধর্ম্মাবলম্বী হওনের চিন্তা বা তৎপ্রকার চিন্তায় নিমগ্ন অন্ত কোনো কাহাকে দেখিলেও তাহা তাঁহার প্রতি অত্যসহ্য-ভারবদ্বিষয় বোধ হইত।

অপর ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এইমত পিতা মাতাবিশিষ্টা এক স্ত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়াতে তাঁহার নূতন সচ্ছীত্যবলম্বনের প্রথম কারণ ছিল। তাঁহারা দুই জনে অতিদরিদ্র ছিল এবং বক্তান্ আপনি কহিয়াছেন যে আমারদের দুই জনের দুই পাত্র বা দুই চামচের সংস্থান ছিল না ঐ স্ত্রীর আত্মপিতার মরণকালে তাঁহাকে দত্ত ধর্ম্মানুশীলনধারা এবং স্বর্গগমনে সরললোকপথনির্ণয় নামে দুই গ্রন্থ ছিল। ঐ গ্রন্থ তাঁহারা উভয়ে কখনো২ পাঠ করিতেন এবং ঐ কালেও আপন নষ্টবিষয়ে এবং বহিয়া যাওন অবস্থাবিষয়ে আত্মমনো-মধ্যে নিশ্চিত না হইলেও ঐ গ্রন্থদ্বয় পাঠ করণেতে এবং শাবতদিবস না মাননবিষয়ে এক উপদেশ শ্রবণেতে তিনি পূর্ব্বরীতি ত্যাগ করণে এবং আমাকে স্বর্গে পহুঁছাওনে যথেষ্ট এমত তৎকালে তৎকর্ত্তৃক অনুমের কতগুলিন ধর্ম্ম আচার করণে বাঞ্ছা করিলেন।...

তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরাত্মকস্নেহ স্বভাবাবলম্বনে পণ করিয়া পুণ্যবানেরদের সহিত পক্ষপাতী না হইয়া সম্ভাষ করিতেন এবং বারম্বার পৃথক্২ মতাবলম্বি খ্রীষ্টীয়ানেরদের উপাধিবিষয়ে এবং মত-বিষয়ে বহু দুঃখিত ছিলেন। তিনি সাহায্যেতে অতিশয় বীর্য্যবান্ ছিলেন বিশেষতঃ খ্রীষ্টের জন্তে এবং মঙ্গলসমাচারের জন্তে তিনি বড়

স্থিরচিত্ত ছিলেন এবং প্রকাশ বা গুপ্তরূপে পাপবিষয়ে অনুযোগ করণে অতিনির্ভর ছিলেন তথাপি সকলের প্রতি অতিকোমল নম্র এবং মিতাচারী ছিলেন। তিনি কায়েতে দীর্ঘ এবং বড় বলবান কিন্তু বড় স্থূলকায় নয় তাঁহার বদন কিঞ্চিৎ লালবর্ণ তাঁহার চক্ষু কিঞ্চিৎ চকুচকীয় এবং তাঁহার কেশ কিঞ্চিৎ কটা ছিল কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত শেষাবস্থায় কিঞ্চিৎ শুক্লবর্ণ হইল। তাঁহার বদন প্রগলভ এবং অতিভারি ছিল তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সাংসারিকেরদের এবং ধর্ম্মহীনেরদের মনেতে সর্ব্বদা আতঙ্ক জন্মিত। কথিতরূপে জীবধারি মনুষ্যের চরিত্র এবং আচার এবং সফলতা ধর্ম্মগ্রন্থের বক্ষ্যমাণ বাক্যে অতিসুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে বিশেষতঃ যেহেতুক হে ভ্রাতারা তোমরা আপনারদের আহ্বান দেখিতেছ যে সংসারের মতানুযায়ি অনেক পণ্ডিত বা অনেক পরাক্রান্ত বা অনেক মহল্লোক আহুত নয় কিন্তু জ্ঞানবানেরদের পরিহানিনিমিত্তে ঈশ্বর এ জগতের মূর্খবস্তু মনোনীত করিয়াছেন এবং পরাক্রান্ত বস্তুর পরিহানিনিমিত্তে ঈশ্বর জগতের দুর্ব্বলবস্তু মনোনীত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ঈশ্বর এ জগতের নীচবস্তু এবং নিন্দ্যবস্তু মনোনীত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানবস্তুর পরিহানিজন্যে অবর্ত্তমানবস্তুও মনোনীত করিয়াছেন যে তাঁহার সাক্ষাৎ কোনো প্রাণী দর্প না করে। প্রথম করিন্থির প্রথম পর্ব্ব ২৬ পদাবধি ২৯ পদ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া দেখুন। ইতি যাত্রাপ্রসরণনামক গ্রন্থ রচনাকর্ত্তার বিবরণ সমাপ্ত। (২য় ভাগ, পৃ. ২০৫, ২২১-২৩, ২৪৯-৫০)

ফেলিক্সের আর দুইটি বাংলা রচনার খবর মাত্র আমরা পাইতেছি। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মৃত্যু-সংবাদে "Translation into the Bengalee of a chemical work by the Rev. John Mack,

for the Student of Serampore College. The work is partly brought through Press." 'সমাচার দর্পণ' সংবাদ দিয়াছেন, "শ্রীরামপুরের কলেজের কারণ রসায়ন বিদ্যা"। জন ম্যাকের 'কিমিয়া বিদ্যার সার' ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, ভূমিকায় ম্যাক্ ফেলিক্সের ঋণ স্বীকার করেন নাই। ফেলিক্সের অনুবাদ যদি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হইয়া না থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ জন ম্যাকের পুস্তকের মধ্যে ফেলিক্সের কীর্ত্তি আত্মগোপন করিয়া আছে। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য' পুস্তকে পাদটীকায় এক স্থানে 'ডিক্সনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি'র নজিরে ফেলিক্স কেরী-কৃত গোল্ডস্মিথের 'ভিকার অব ওয়েকফিল্ডে'র অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের মনে হয় ইহা ভুল—গোল্ডস্মিথের ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের সহিত 'ভিকার অব ওয়েকফিল্ডে'র স্বতঃই গোলযোগ ঘটিয়াছে।

উপসংহার

বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে ফেলিক্স কেরীর এই দান আজ নূতন করিয়া আমাদের স্মরণীয়; কারণ, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ফেলিক্স কেরী তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা এতাবৎ কাল পান নাই। বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞানরচনার কৃতিত্ব তাঁহার, তিনি তাহা যে-ভাবেই করিয়া থাকুন। দুরূহ স্মৃতিশাস্ত্রের তত্ত্ব তিনি স্বয়ং বৈদেশিক হইয়াও যে-ভাবে বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয় কাশীনাথ রামমোহন ছাড়া সে যুগে দেশী ও বিদেশী আর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' তাঁহাকে "undoubtedly the best Bengali scholar

among his countrymen, especially in his knowledge of the idioms and construction of that language" বলিয়া কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নাই। ভারতের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য যে সকল বৈদেশিক প্রয়াস করিয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহাদের অন্যতম প্রধান—এ কথাও সত্য। 'সমাচার দর্পণ' নীচের উক্তিতে তাঁহার যে যে গুণের উল্লেখ করিয়াছিলেন, বৈদেশিকদের মধ্যে তাহাও দুর্লভ—

> ইঁহার পরলোক হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে ইনি অতিশয় বিদ্বান ও পরোপকারী ও পরদুঃখে কাতর ও শরণাগত প্রতিপালক ও অতি বড় আলাপী ছিলেন।

বাংলা ভাষার সহিত ফেলিক্স কেরীর ঘনিষ্ঠতার কথা তাঁহার দীর্ঘকালের সহকর্ম্মী জন ক্লার্ক মার্শম্যান সকুণ্ঠভাবে যাহা বলিয়াছেন, ফেলিক্সকে স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। তিনি বলিয়াছেন—

> He was, unquestionably the most complete Bengalee scholar among the Europeans of his day, but his style wanted simplicity, and the unrestrained admixture of Sanscrit words made his translations difficult of comprehension to ordinary readers.
> —'শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস,' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

মিশনরী-শ্রেষ্ঠ রেভারেণ্ড কেরীর পুত্র হইয়াও তিনি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষায় উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন; এই ভাষাতে প্রথম বিশ্বকোষ রচনার দুঃসাহসিক কল্পনা তাঁহাতেই দেখা গিয়াছিল। মাত্র দেড় বৎসরের অমানুষিক পরিশ্রমে ব্যবচ্ছেদবিদ্যার মত দুরূহ শাস্ত্রকে তিনি পরিভাষা সহ বাংলায় রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছিলেন—এই

ভাষার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক আকর্ষণ ছিল বলিয়া। তাঁহার কথা স্মরণ করিলেই মন প্রীতিতে প্রসন্ন হইয়া উঠে, কল্পনায় দেখিতে পাই, এই পথভ্রষ্ট তরুণ পাদরি ব্রহ্মদেশীয় অভিজাতের বিচিত্র রঙিন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পশ্চাতে ছত্রধারী ভৃত্য ও পঞ্চাশ জন বর্ম্মী অনুচর লইয়া কলিকাতার রাজপথে অভিনব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার হস্তচ্যুত 'ধর্ম্মপুস্তক'—'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা,' 'স্মৃতিশাস্ত্র' ও 'কিমিয়া-বিদ্যা'য় রূপান্তরিত হইয়াছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা
সম্বন্ধে অভিমত

যুগান্তর (৪ মার্চ ১৯৫২):—"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বাঙালীর ইতিহাসের নূতন দিক লইয়া আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা গ্রন্থাবলীতে। সমাজ ও সাহিত্য পরস্পর সম্পর্কিত। বাংলাদেশে যাঁহারা সাহিত্য সাধনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটিয়াছিল বাঙালী মনীষী ও সাহিত্যিকবৃন্দের অবদানের ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রচেষ্টায় সাহিত্য-পুরাতাত্ত্বিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সাহিত্য-সাধকদের অলিখিত জীবনচরিত ও সমাজসেবার ইতিহাস বহু যত্নে ও পরিশ্রমে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। বাঙালীর ইতিহাসে এই স্বনামধন্য পুরুষদের জীবনকাহিনী অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।...বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই মহাব্রত দেশবাসীর আগ্রহ ও উৎসাহ সঞ্চার করিবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৮১

চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা

হটী বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার, দ্রবময়ী

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার

চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা
লিপিতত্ত্ববিশারদ কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫৮

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
৭.২—২৩।৩।১৯৫২

চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা

আধুনিক কালে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্গললনার কৃতিত্বের কথা সুবিদিত। ইহা যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল তাহাতে সন্দেহ নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নারীহিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের (বেথুনের) প্রচেষ্টায় কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা-ক্ষেত্রে নব যুগের সূচনা হয় তাহা ঐতিহাসিক সত্য; তৎপূর্বে এ দেশে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের জন্য প্রকাশ্য বালিকা-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই। সম্ভ্রান্ত কুলকন্যাগণ কেহ কেহ ঘরে বসিয়া শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে অল্পস্বল্প বিদ্যাচর্চা করিতেন—এইটুকুই মাত্র আমাদের জানা আছে। স্ত্রীজাতি বুদ্ধিহীনা, সুতরাং অবজ্ঞেয়—এই ধরণের একটা মনোভাব তখনকার দিনে অনেকেই পোষণ করিতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার না হওয়ার জন্য পুরুষ জাতিই যে দায়ী সে-কথা বুঝাইতে গিয়া ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সহমরণ-বিষয়ক বাদানুবাদে রাজা রামমোহন রায় প্রসঙ্গক্রমে প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?"

কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম যে ছিল না তেমন নয়। সে যুগেও "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" এই শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ

করিয়া কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিজ নিজ কন্যাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ কাব্য ইত্যাদি সযত্নে শিক্ষা দিতেন। সে ছিল টোল-চতুষ্পাঠীর যুগ। এখনকার মত স্কুল-কলেজের অস্তিত্ব সেকালে ছিল না। কোন কোন বঙ্গললনা তখন ছাত্রদের সঙ্গে গুরুর নিকট যথারীতি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন। এই ভাবে জ্ঞানানুশীলনের ফলে সেকালে কয়েক জন বঙ্গমহিলা বিবিধ শাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন যে তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়। এই সকল বঙ্গললনা শুধু নিজেরা বিদ্যালাভ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজেদের অর্জ্জিত বিদ্যা-বিতরণের জন্য তাঁহারা টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া রীতিমত অধ্যাপনা করিয়াছেন, শাস্ত্রবিচারে পুরুষ-প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়াছেন—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইঁহারা গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী, খনা প্রভৃতি ভারতীয় বিদুষীদের সহিত এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য।

বাংলার স্ত্রীশিক্ষার সেই অন্ধকার যুগে যে-সকল বঙ্গমহিলা ভাস্বর তারকার ন্যায় আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানের বিমল রশ্মিচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া কয়েক জনের পরিচয় প্রধানতঃ প্রাচীন সাময়িক-পত্রের সাহায্যে দেওয়া যাইতেছে।

হটী বিদ্যালঙ্কার

নব্যন্যায়ের শেষ পরিণতিকালে শঙ্কর তর্কবাগীশ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণ যখন বঙ্গদেশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজমান, সেই সময়ে "অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, হটী বিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমণী বারাণসীক্ষেত্রে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া ভূরি ভূরি ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়াছেন।" বঙ্গদেশে—বিশেষ করিয়া রাঢ়দেশে হটী বিদ্যালঙ্কারের নাম প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল।

হটী ছিলেন রাঢ়দেশের কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা। তাঁহার পিতা এক কুলীন পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। অধিকাংশ কুলীনকন্যার ন্যায় বিবাহের পর হটীকেও পিত্রালয়ে দিন কাটাইতে হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত; কন্যাকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিতা করেন। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে বিধবা হয়, তখনকার দিনের এই ধারণা কুসংস্কারের পরিচায়ক সন্দেহ নাই; হটীও কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পরে বিধবা হন। অল্প দিন পরে তাঁহার পিতারও পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। পিতৃবিয়োগের পর হটী দুরবস্থায় পড়িলেন। সংসারে বীতরাগ হইয়া তিনি কাশীবাসের সঙ্কল্প করেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি স্মৃতি ব্যাকরণ ছাড়া নব্যন্যায়েও পারঙ্গম হইয়া উঠেন। অবশেষে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া হটী অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন; দেশ-বিদেশ হইতে আগত বহু ছাত্রকে তিনি নব্যন্যায় পড়াইতে সুরু করিলেন। এই সময়ে তিনি "বিদ্যালঙ্কার" এই উপাধিতে ভূষিতা হন। মনস্বী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'সেকাল আর একাল' পুস্তকে লিখিয়া

গিয়াছেন :—"হটী বিদ্যালঙ্কার একজন বিদ্যাবতী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কন্যা। ইহাঁর জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার সোঞাই গ্রাম। ইনি বৈধব্য অবস্থায় বৃদ্ধবয়সে কাশীতে টোল করিয়া সভায় ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বিদায় লইতেন।"

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে হটী বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হয়। শ্রীরামপুর-মিশনের উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৮০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁহার 'হিন্দু' গ্রন্থের ১ম খণ্ড রচনা করেন, তখন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (মৃত্যু : অক্টোবর ১৮০৭) ও হটী বিদ্যালঙ্কার উভয়েই জীবিত ; তিনি ইহাঁদের দু-জনেরই কথা স্বীয় গ্রন্থে* লিখিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে হটী বিদ্যালঙ্কারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। সেকালে একজন সহায়সম্বলহীনা বাঙালী বিধবা বারাণসীর মত বিদ্যাকেন্দ্রে গিয়া অধ্যাপনা দ্বারা বিপুল যশের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, এ কথা ভাবিয়া বাঙালী মাত্রেই গৌরব বোধ করিবেন।

* *Account of the Writings, Religion, and Manners of the Hindoos,* Vol. I, Jan. 1811, pp. 195-96.

হটু বিদ্যালঙ্কার

হটী বিদ্যালঙ্কার ছিলেন ব্রাহ্মণকুলসম্ভূতা। কিন্তু তদানীন্তন বাংলায় ব্রাহ্মণেতর সমাজেও যে বিদুষী মহিলা একেবারে বিরল ছিলেন না, তাহার প্রমাণ—রূপমঞ্জরী, ওরফে হটু বিদ্যালঙ্কার। রূপমঞ্জরীর পিতা যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে নিজের একমাত্র কন্যার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ছাত্রদের সহিত একত্রে গুরুগৃহে বাস করিয়া রূপমঞ্জরীর বিদ্যা অর্জন, চিরকুমারী থাকিয়া তাঁহার অক্লান্তভাবে জ্ঞানের সাধনা—এই সমস্ত কাহিনী রূপকথার মত বিস্ময়কর মনে হয়। শুধু সাহিত্য ব্যাকরণ শাস্ত্রাদি নয়, জটিল বৈদ্যকশাস্ত্র পর্য্যন্ত অধিগত করিয়া রূপমঞ্জরী যে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, বাংলার নারীসমাজে বাস্তবিকই তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এই প্রতিভাশালিনী মহিলার চিত্তাকর্ষক জীবনকথা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"রাঢ় প্রদেশে বর্দ্ধমান জেলাতে কলাইঝুটি নামে একটি পল্লীগ্রামে, বাঙ্গলা দ্বাদশ শতাব্দীতে, নারায়ণ দাস নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। সুধামুখী নামে এক রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সকলেরই অকালে কালপ্রাপ্তি ঘটে। অবশেষে বাঙ্গলা ১১৮১ কি ৮২ সনে তাঁহাদের এক কন্যা সন্তান জন্মে। পিতা মাতা মড়াঞ্চে সন্তান বলিয়া কন্যাকে হটি বলিয়া ডাকিতেন—কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম রাখিয়াছিলেন রূপমঞ্জরী। রূপমঞ্জরী কিরূপ রূপবতী ছিলেন, তাহা আমরা বলিতে

পারি না ; কিন্তু তিনি যে গুণবতী ছিলেন, তাহা আমরা বেশ বলিতে পারি।

বালিকা বয়সে রূপমঞ্জরীর ওরফে হটির মাতৃবিয়োগ হয়। তখন নারায়ণ দাসই তাহার মাতৃ-পিতৃ উভয় স্থানীয় হইলেন। নারায়ণ দাসের ঘরে সুধামুখী গৃহিণী নাই,—বার্দ্ধক্যের অবলম্বন পুত্র সন্তান নাই। নারায়ণ দাস যেমন রূপমঞ্জরীর মাতৃ-পিতৃ স্থানীয় হইয়াছিলেন, রূপমঞ্জরীও তেমনি তাঁহার পুত্র-কন্যা স্থানীয় হইয়া দাঁড়াইল। বৈষ্ণব নারায়ণ দাসের বিষয়কর্ম্ম কিছু ছিল না, তাঁহার অবসরকাল কাটে না। সংসারের একমাত্র বন্ধন কন্যাকে অবসর কাটানের উপায় করিয়া লইলেন,—হটিকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। হটির বেশ প্রখরা বুদ্ধি ছিল ; তিনি যা কিছু শিখাইতেন, সে তাই টপ্ টপ্ করিয়া শিখিয়া ফেলিত। কন্যার এরূপ মেধা-শক্তি দেখিয়া পিতা অধিকতর আগ্রহের সহিত শিক্ষা দানে প্রবৃত্ত হইলেন,—প্রতিবেশী পরিজনেরা হটির বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাহাকে, ব্যাকরণ অধ্যাপনার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিল। স্ত্রীলোকে বিদ্যা শিক্ষা করিলে বিধবা হয়, যেদেশে এরূপ কুসংস্কার, সেই দেশের লোকে হটির পিতাকে কেন এরূপ সদুপদেশ দিয়াছিল, বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, হটির যখন ১৬।১৭ বৎসর বয়স, তখন নারায়ণ দাস তাহাকে নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে এক বৈয়াকরণিকের গৃহে রাখিয়া আইসেন। বৈয়াকরণিক জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন,—তাঁহার এক টোল ছিল। ষোড়শবর্ষীয়া রূপমঞ্জরী সেই টোলের ছাত্রদের সঙ্গে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। এখানেও আর এক দেশাচারবিরুদ্ধ ঘটনা দেখা যাইতেছে। ষোড়শবর্ষীয়া

যুবতী অবিবাহিতা রহিয়াছে,—পুরুষের সঙ্গে একই বিদ্যাগারে শিক্ষা লাভ করিতেছে। জানি না, বৈষ্ণবসন্তান বলিয়া এরূপ হইয়াছিল কি না। কিন্তু রূপমঞ্জরী কেবল এই গুরুগৃহে নহে,—আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্কভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন,—তিনি মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত কুমারী ছিলেন, অথচ নীচতম শত্রু পর্য্যন্তও তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন দিন একটি কথাও বলিতে অবসর পায় নাই।

তিনি যখন গুরুগৃহে ব্যাকরণ অধ্যয়ন জন্য বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যুসংবাদ আসিল। তিনি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য স্বগ্রামে গমন করিলেন। পিতার সৎকারান্তে আবার গুরুগৃহে ফিরিয়া গেলেন। ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ হইলে, তিনি গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কার নামক এক অধ্যাপকের নিকট সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। সাহিত্য অধ্যয়ন শেষ হইলে, তিনি পিতামাতার প্রেতঃকৃত্য সম্পন্ন জন্য গয়াধামে গমন করেন,—তথা হইতে কাশীধামে যাইয়া কিছু কাল বাস করেন। কাশী বাস কালে তিনি দণ্ডীদের নিকট নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যাপকেরা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে আগ্রহের সহিত শিক্ষা দিতেন। এইরূপে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি জন্মভূমি রাঢ়দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন,—দেশে আসিয়া "হটু বিদ্যালঙ্কার" নামে অভিহিত হইলেন।

কিন্তু কেবল বিদ্যালোচনাতে তাঁহার প্রাণে শান্তি দিতে পারিল না;—নারীর কোমল হৃদয়ের স্নেহধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণে জন-সেবা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন মানসে সরগ্রাম নিবাসী সাহিত্য-গুরু

গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের নিকট আবার গমন করিলেন। তাঁহার নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি এরূপ সুখ্যাতি ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, অনেকে আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, চরক, নিদান প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে আসিত ;—অনেক খ্যাতনামা কবিরাজ চিকিৎসা সম্বন্ধে সময় সময় তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

দু-একটি বিষয়ে ইহাঁর একটু ক্ষেপামি ছিল। তিনি বেশভূষা অনেকটা পুরুষের মত করিতেন। রমণী-সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ কেশের উপর তাঁহার তত শ্রদ্ধা ছিল না,—মাথা মুড়াইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত শিখা রাখিতেন ; পুরুষের মত করিয়া উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন।

বাঙ্গলা ১২৮২ সনের ১৫ই পৌষ তারিখে প্রায় এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাধারমণ দাস নামে এক ব্যক্তিকে তিনি পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তিনি আজও জীবিত আছেন,—আমাদের এই "হটু বিদ্যালঙ্কারের" গৃহেই তিনি বাস করেন। সুতরাং কাল্পনিক গল্প বলিয়া চিরকুমারী রূপমঞ্জরীর কথা উড়াইয়া দেওয়ার যো নাই। বঙ্গদেশের—বাঙ্গালীর অধঃপতনের চূড়ান্ত সময়ে রূপমঞ্জরীর ন্যায় বিদুষী রমণীর ইতিবৃত্ত শুনিলে প্রাণে কতই না আনন্দ হয়!... এরূপ রমণী যে সমাজে—যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সমাজের ও সেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়।" (গগনচন্দ্র হোম : "হটু বিদ্যালঙ্কার"—'সখা,' আগস্ট ১৮৯০)।

দ্রবময়ী

এবার যে বিদুষী ব্রাহ্মণ-কন্যার পরিচয় দিতেছি, তিনি মাত্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে শুধু যে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিনী হইয়াছিলেন তাহা নহে, বিচারে সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। বিচার-বিতর্কে প্রাচীন ভারতের গার্গী এবং উভয়ভারতীর সমগোত্রীয়া এই বিদ্যাবতী বঙ্গললনা কিরূপ সহজাত প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন, তাহা সে-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ১৮৫১, ১৯এ এপ্রিল তিনি দ্রবময়ীর প্রসঙ্গে স্বীয় পত্রিকায় লেখেন :—

"খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রাম নিবাসি ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীযুত চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী দ্রবময়ী দেবী…বালিকা কালে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সাতখানা মূল সাতখানা টীকা এবং অভিধান পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার স্বকন্যার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কাব্যালঙ্কার পড়াইলেন এবং ন্যায়শাস্ত্রের কিয়দংশও শিক্ষা দিলেন, পরে দ্রবময়ী গৃহে আসিয়া পুরাণ মহাভাগবতাদি দেখিয়া হিন্দুজাতির প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলেন, এইক্ষণে দ্রবময়ীর বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর, পুরুষেরা বিংশতি বৎসর শিক্ষা করিয়াও যাহা শিক্ষা করিতে পারে না, দ্রবময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা করিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার বৃদ্ধ

হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাঁহার টোলে ১৫।১৬ জন ছাত্র আছেন, দ্রবময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার টোলে ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়াইতেছেন, তাঁহার বিদ্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ অধ্যাপকেরা অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া গিয়াছেন, দ্রবময়ী কর্ণাট রাজার মহিষীর ন্যায় যবনিকান্তরিতা হইয়া বিচার করেন না, আপনি এক আসনে বৈসেন, সম্মুখে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বসিতে আসন দেন, তাঁহার মস্তক এবং মুখ নিরাবরণ থাকে, তিনি চার্ব্বঙ্গী যুবতী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া বিচার করিতে শঙ্কা করেন না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত বিচারকালীন অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার তুল্য সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারেন না, গৌড়ীয় ভাষায় বিচারেতেও পরাস্ত হয়েন, দ্রবময়ীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষ্মী কিম্বা সরস্বতী হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পায়, এ স্ত্রীলোককে দেখিবার জন্য কাহার উৎসাহ না হয় এবং তাঁহার আহারাচ্ছাদনাদির সাহায্যার্থ কোন দয়াশীল মহাশয় ব্যগ্র হইবেন না, প্রত্যক্ষের অপলাপ নাই, যাঁহার ইচ্ছা হয় বেড়াবাড়ী গ্রামে যাইয়া দ্রবময়ীকে দেখুন, তাঁহার সহিত বিচার করুন, আমরা দ্রবময়ীর বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে যাহা দেখিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ্যা হয় তবে আমারদিগকে মিথ্যাজল্পক বলিবেন, এরূপ সতী বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে এদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।"

উপরে যে-কয়জন বঙ্গীয় বিদুষীর জীবন ও কীর্ত্তিকথা বর্ণিত হইল তাহা বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের উপর

কতকটা আলোকপাত করিতে সক্ষম হইবে। এই ধরণের অন্যান্য কোন কোন বাঙালী কন্যা ও বধূর বিদ্যাচর্চ্চার কথা হয়ত সেকালের পত্র-পত্রিকা-পুস্তকাদির পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া আছে; ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে হইলে বিস্মৃতির যবনিকান্তরাল হইতে সেগুলিকে পুনরুদ্ঘাটিত করা একান্ত প্রয়োজন।

লিপিতত্ত্ববিশারদ

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার

?—১৮৪৩

কলিকাতায় বর্ত্তমানে আমরা যে এশিয়াটিক সোসাইটি দেখিতেছি, তাহার সূচনা হয় ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়াপত্তনের অল্প দিন পরে—১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সার্ উইলিয়ম জোন্স কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিতের সহায়তায় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। জোন্সের লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাচ্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্রস্থল-রূপে গড়িয়া তোলা। এ বিষয়ে তাঁহার বাণী উদ্ধারযোগ্য :—

> "It will flourish, if naturalists, chemists, antiquaries, philologers, and men of science, in different parts of *Asia*, will commit their observations to writing, and send them to the Asiatic Society at Calcutta ; it will languish, if such communications shall be long intermitted ; and will die away, if they shall entirely cease."

উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা নানা ভাবে সাহায্যদান করিয়া প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চেষ্টায় সোসাইটির মিউজিয়মটি প্রত্নদ্রব্য ও জীববৃত্তান্ত-সম্পর্কীয় উপকরণে দিন দিন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। প্রত্নদ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত বহু তাম্রশাসন ও শিলালেখের প্রতিলিপি

ছিল। কিন্তু প্রাচীন লিপি-জ্ঞানের অভাবে সেগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক মূল্য যাচাই করিবার উপায় ছিল না। ১৮৩৭ সনে সেগুলির পাঠোদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হয়। এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রণী হন—জেম্‌স প্রিন্‌সেপ, সোসাইটির তদানীন্তন সেক্রেটরী ও এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালের সম্পাদক। তিনি লিখিয়াছেন :—

"Our own attention has been principally taken up this last year with Inscriptions. Without the knowledge necessary to read and criticise them thoroughly, we have nevertheless made a fortunate acquisition in paleography which has served as the key to a large series of ancient writings hitherto concealed from our knowledge . . . 1st January 1838." (*J. A. S. B.*, 1837, Preface.)

প্রকৃতপক্ষে একা প্রিন্‌সেপের চেষ্টায় ১৮৩৭-৩৮ সনে বহু উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপির—বিশেষ করিয়া অশোকের অনুশাসনের পাঠোদ্ধার হইয়াছিল। তিনিই প্রথমে ব্রাহ্মী-লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ভারতেতিহাসের একটি রুদ্ধ কক্ষের দ্বার উন্মোচিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু লিপিতত্ত্ববিশারদ হিসাবে প্রিন্‌সেপের খ্যাতির মূলে যিনি ছিলেন, তিনিও আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়। পরিতাপের বিষয়, "আত্মবিস্মৃত" বাঙালী তাঁহার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে; তিনি এ দেশেরই বহুনিন্দিত প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজের একজন, নাম—কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার।

কলিকাতায় চতুষ্পাঠী

কমলাকান্তের বংশ-পরিচয় বা আদি নিবাসের কোন সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ওয়ার্ডের 'হিন্দু' গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ১৮১৭ সনে কলিকাতায় আড়কুলিতে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল।

সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারের অধ্যাপক

১৮২৪ সনের ১লা জানুয়ারি কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়। ইহা প্রথমে ৬৬ নং বহুবাজারের ভাড়া-বাড়ীতে অবস্থিত ছিল; তখন কলেজের বর্ত্তমান গৃহটি নির্ম্মিত হয় নাই। দুই বৎসর পরে—১৮২৬, ১লা মে সংস্কৃত কলেজ নবনির্ম্মিত গৃহে স্থানান্তরিত হয়। সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চ্চাই এই কলেজ প্রতিষ্ঠার আশু উদ্দেশ্য ছিল। এখানে প্রথমে ব্যাকরণ—মুগ্ধবোধ ও পাণিনি, অলঙ্কার, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্তের অধ্যাপনা হইত। কমলাকান্ত মাসিক ৬০৲ বেতনে প্রথমাবধি অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিত

১৮২৭ সনে রাধাচরণ বিদ্যাবাচস্পতির মৃত্যু হইলে মেদিনীপুর আদালতের পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। এই পদের জন্য বহু পণ্ডিত আবেদন করিয়াছিলেন; কমলাকান্তও তন্মধ্যে অন্যতম। আবেদনকারিগণকে রীতিমত পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' ১৮২৭, ১৪ই জুলাই তারিখে লেখেন :—

"পরীক্ষক ও পরীক্ষার প্রশংসা।—জেলা মেদিনীপুরের আদালতের পণ্ডিত রাধাচরণ বিদ্যাবাচস্পতির মৃত্যু হইলে সে

কর্ম্ম প্রার্থক অনেক পণ্ডিত প্রার্থনাপত্র দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ঐ জেলার জজ সাহেব শ্রীযুত এফ ডিক সাহেব শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত রামমোহন ভট্টাচার্য্য এই পাঁচ জনের নামে শ্রীযুত গবর্ণর কৌন্সলে রিপোর্ট করিয়াছিলেন গবর্ণর কৌন্সলের সাহেবেরা ঐ পাঁচ জন পণ্ডিতের পরীক্ষা করিতে কালেজ কমিটিতে শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব শ্রীযুত উইল্‌সন সাহেব শ্রীযুত প্রাইস সাহেব শ্রীযুত উইস্‌লী সাহেব শ্রীযুত কেরী সাহেব শ্রীযুত টাট সাহেব এই ছয় সাহেবের নিকট ঐ জজ সাহেবের রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। ৯ জুন ২৮ জ্যৈষ্ঠ শনিবার টাট সাহেব ঐ মেকনাটনপ্রভৃতি পাঁচ সাহেবের সম্মতি ক্রমে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালায় দশ ঘণ্টার সময় ঐ পাঁচ জন পণ্ডিতকে আনাইয়া দায়ের দুই উপনিধির দুই সীমাবিবাদের এক ঋণাদানের এক অশৌচের এক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারির লক্ষণ এবং এই আট প্রশ্নের সপ্রমাণ উত্তর লিখিতে আদেশ করিলেন ঐ পাঁচ পণ্ডিত টাট সাহেবের সাক্ষাৎ পুস্তকাবলোকন ব্যতিরেকে যথাজ্ঞান ঐ আট প্রশ্নের সপ্রমাণ উত্তর লিখিয়া দিয়াছিলেন মেকনাটন উইলসনপ্রভৃতি কমিটি সাহেবেরা তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ পাঁচ পণ্ডিতের মধ্যে শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকে প্রশংসাপত্র দিয়া জিলা মেদিনীপুরের আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে তাঁহাকে স্থাপিত করিতে গবর্ণর কৌন্সলে রিপোর্ট করিয়াছেন ইহাতে যাবদ্বিশিষ্ট লোকেরা কালেজ কমিটি সাহেবেরদিগের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন যে এ সাহেবেরা সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং সদসদ্বিবেচনাসাগরপারগামীতি।"

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিয়া ১৮২৭ সনের জুলাই মাসে কমলাকান্ত নূতন পদে যোগদান করেন। এই প্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ' (২৮ জুলাই ১৮২৭) লিখিয়াছিলেন :—

"পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিয়োগ।—শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন তিনি জিলা মেদিনীপুরের আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন গত ৭ জুলাই ২৪ আষাঢ় কালেজের কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় গমন করিয়াছেন।"

লিপিতত্ত্বকুশলতা

কমলাকান্ত ঠিক কত দিন জজ-পণ্ডিতী করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। তবে এডামের তৃতীয় রিপোর্টে প্রকাশ, ১৮৩৬ সনে তিনি কলিকাতায় স্বীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। অতঃপর আমরা তাঁহাকে ১৮৩৭ সনে জেম্‌স প্রিন্‌সেপের পণ্ডিতরূপে দেখি। প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধারে তিনি প্রিন্‌সেপের প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৭-৪১ সনের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত বহু লিপির পাঠোদ্ধার কমলাকান্তেরই সাহায্যে হইয়াছিল। কমলাকান্তের সাহায্যের কথা প্রিন্‌সেপ একাধিক ক্ষেত্রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Lt. Kittoe also presented facsimiles of a copper grant in three plates dug up in the Gumsur country, of which the Secretary with the aid of Kamala Kant Pandit supplied a translation." (*J.A.S.B.*, Vol. VI, May 1837, p. 402.)

"Although, as will be seen, the slab [Brahmeswara Inscription, Cuttack] was in a state of considerable mutilation, yet from the inscription being in verse, my pandit, Kamalakanta Vidyalankara, has been able by study of the context to fill up all the gaps, with, as he says, hardly a possibility of error, and indeed where the outline of the letters is preserved I have found his restoration quite conformable. The translation has been effected by Sarodaprasad* under his explanation, but I have not leisure to read it over with Kamalakanta." (*J.A.S.B.*, June 1838, p. 557.)

এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পীড়িত হইয়া প্রিন্‌সেপ এ দেশ ত্যাগ করিলে ডাঃ ওসাগ্‌নেসী সোসাইটির অস্থায়ী সম্পাদক হন। তাঁহার আমলে, ১৮৩৯ সনের আগষ্ট মাসে, কমলাকান্ত এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে (viii. 527) প্রকাশ :—

"The Secretary brought to the notice of the Meeting that the present Pundit, Ramgovind Gossamee, has been found incompetent to decypher the Inscriptions to which the Society are most

* সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীও প্রিন্‌সেপের অন্যতর সাহায্যকারী ছিলেন ; তাঁহার সম্বন্ধে প্রিন্‌সেপ এক স্থলে লিখিয়াছেন :—

"For the translation, instead of adopting Wilkins' words, I present if anything a more literal rendering by Sarodaprasad Chakravarti, a boy of the Sanskrit College, who had studied in the English class lately abolished. I do this to shew how useful the combination of Sanskrit and English grammatically studied by these young men might have been made both to Europeans and to their own country....The same boy assisted Captain Troyer in the translation of many Sanskrit class books. (*J. A. S. B.*, Aug. 1837, p. 673.)

desirous to give publicity, either in their monthly publication, or in their Transactions, he therefore proposed that the celebrated Kamalakantha Vidyalankar be appointed for that office, and also as the Librarian for the Oriental Books. The proposition was unanimously carried." (Proceedings 7 Aug. 1839.)

সংস্কৃত কলেজে পুরাবৃত্ত-শ্রেণীর অধ্যাপক

এশিয়াটিক সোসাইটির কল্যাণে দেশে পুরাতত্ত্বের চর্চা প্রসারলাভ করিতেছিল। সরকারী শিক্ষা-সংসদ্ সংস্কৃত কলেজের একদল ছাত্রকে পুরাতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত কলেজ হইতে স্বতন্ত্র বেদান্ত-শ্রেণী লোপ করিয়া তাহার স্থলে "Ancient Literature and History of the Hindoos" শিখাইবার জন্য ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে "পুরাবৃত্ত" নামে একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। এই শ্রেণীর অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হন—কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। তাঁহার নিয়োগপত্রখানি প :—

"I have the honour to inform you that the Section of the Council of Education for the Sanskrit College has been pleased to appoint you Professor of Ancient Literature and History of the Hindoos at the Sanskrit College on a salary of Eighty Company's Rupees per month. You are immediately to set about preparing a syllabus of your proposed lectures and report progress to me weekly specifying what has been done and what is to be done in the following week to be submitted to the Section monthly. In addition to this you are to teach Vedant to as many students as may wish to learn that Science. (Letter dated 1st Jany. 1842 from Russomoy Dutt, Secy., Section Council of Education, Sanskrit College.)

কমলাকান্তের বয়স হইয়াছিল। ১৮৪৩ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত পুরাবৃত্ত-শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিয়া তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ হইতে পুরাবৃত্ত-শ্রেণীটিও লোপ পাইয়াছিল।

মৃত্যু

১৮৪৩, ৮ই অক্টোবর কমলাকান্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সভাপতি ও সেক্রেটরী হেন্‌রি টরেন্স (Torrens) যে প্রশস্তি করেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি :—

> "I have, with much regret, to report the death of the aged, and highly respected Pundit Kamalakanta Vidhyalankar, the friend and fellow labourer of James Prinsep. With him has expired the accurate knowledge of the ancient Pali and Sanskrit forms of writing; for although we now possess a key to these ancient characters, no Pundit has exercised himself in the act of decyphering to the extent to which has Kamalakanta. Like all learned persons of his class, he carefully avoided the communication of his peculiar knowledge......the Society owes a debt of gratitude to Kamalakanta, and of respect to him as the Collaborator of James Prinsep." (Proceedings 13 Nov., 1843 : *J A S.B.*, 1843, pp. 1013-14)

(বঙ্গানুবাদ): অত্যন্ত দুঃখের সহিত জেম্‌স প্রিন্‌সেপের সুহৃৎ ও সহকর্ম্মী, বহুমানাস্পদ বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন পালি ও প্রাচীন-সংস্কৃত-লিপিপদ্ধতির যথার্থ জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটিল; কেন না,

ইদানীং এই সমস্ত প্রাচীন লিপি পাঠের মূলসূত্রটি আমাদের আয়ত্তগত হইয়াছে বটে, কিন্তু আর কোন পণ্ডিতই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারে কমলাকান্তের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার সমশ্রেণীর পণ্ডিতদের মত তিনিও তাঁহার এই বিশিষ্ট বিদ্যা প্রকাশের সুযোগ পরিহার করিয়া চলিতেন।...জেম্‌স প্রিন্‌সেপের সহকর্ম্মী হিসাবে সোসাইটি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ এবং সেজন্য তিনি উহার শ্রদ্ধার পাত্র।*

* কমলাকান্ত কলিকাতায় ধর্ম্মসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫)। স্বদেশযাত্রার প্রাক্কালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি রেঃ ডবলিউ. এইচ. মিল-কে বিদায়-অভিনন্দন দিবার জন্য যে সভার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে প্রিন্‌সেপের নির্দ্দেশে মিলের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কমলাকান্ত যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন তাহা ইংরেজী অনুবাদ সহ এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে মুদ্রিত হইয়াছে (*J.A.S. B.*, Aug. 1837, pp. 707, 710-11)। ২২ এপ্রিল ১৮৪০ তারিখে, ৪১ বৎসর বয়সে, বিলাতে জেম্‌স প্রিন্‌সেপের মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী ৩০এ জুলাই তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক কলিকাতার টাউন-হলে যে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয় তাহাতে কমলাকান্ত, বাংলা দেশের পণ্ডিতবর্গের প্রতিনিধিস্বরূপ, সংস্কৃতে প্রশস্তি কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন (*Asiatic Journal*, Nov. 1840 : "Asiatic Intelligence," pp. 190-91.)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা
সম্বন্ধে অভিমত

যুগান্তর (৪ মার্চ ১৯৫২):—"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বাঙালীর ইতিহাসের নূতন দিক লইয়া আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা গ্রন্থাবলীতে। সমাজ ও সাহিত্য পরস্পর সম্পর্কিত। বাংলাদেশে যাঁহারা সাহিত্য সাধনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে রেণেসাঁর সূত্রপাত ঘটিয়াছিল বাঙালী মনীষী ও সাহিত্যিকবৃন্দের অবদানের ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রচেষ্টায় সাহিত্য-পুরাতাত্ত্বিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সাহিত্য-সাধকদের অলিখিত জীবনচরিত ও সমাজসেবার ইতিহাস বহু যত্নে ও পরিশ্রমে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। বাঙালীর ইতিহাসে এই স্বনামধন্য পুরুষদের জীবনকাহিনী অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।... বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই মহাব্রত দেশবাসীর আগ্রহ ও উৎসাহ সঞ্চার করিবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৯০

দীনেশচন্দ্র সেন

সখারাম গণেশ দেউস্কর

দীনেশচন্দ্র সেন
সখারাম গণেশ দেউস্কর

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫৮

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
৭.২—২৫।৩।১৯৫২

দীনেশচন্দ্র সেন

১৮৬৬—১৯৩৯

বাংলার সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। প্রথম জীবনে প্রতিকূল অবস্থার সহিত যেরূপ কঠোর সংগ্রাম করিয়া তিনি পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলগুলি হইতে হস্তলিখিত বহু প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে কাহিনী সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই মনে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক করে। দীনেশচন্দ্র শুধু যে কীটদষ্ট পুঁথির একজন অক্লান্ত সংগ্রাহকই ছিলেন তাহা নয়, তিনি কবিত্ববোধ-শক্তিসম্পন্ন প্রকৃত রসবেত্তাও ছিলেন। বৈষ্ণব কবিদিগের, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের পদাবলীর রসধারা তাঁহার রসপিপাসা চরিতার্থ করিত। জীবন-প্রভাতেই তিনি কাব্য-সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর কাব্যচর্চার পথ হইতে সরিয়া আসিয়া বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস রচনার দুরূহ ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। সাধকোচিত নিষ্ঠার সহিত যেভাবে তিনি সারাজীবন বঙ্গবাণীর আরাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল। ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি গুণাবলীর সমন্বয়ে যে কিরূপ দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করা যাইতে পারে, দীনেশচন্দ্রের জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আর একটি বিশেষ কারণে তিনি বাঙালী জাতির চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। সংস্কৃত পুরাণের ভাণ্ডার এবং বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ মঙ্গলকাব্য ও গাথা-কাব্যগুলি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি সরস সুললিত গদ্যে সর্ব্বসাধারণের উপভোগের জন্য সেগুলি সযত্নে পরিবেশন করিয়া তাহাদের সাহিত্য-রসপিপাসা ও গল্প-পিপাসা সার্থকভাবে মিটাইয়া দিয়াছেন। পয়ার-ত্রিপদী ও ভাঙা ছন্দের আবরণ ভেদ না করিয়াও, সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ হইয়াও তাহারা রামায়ণী কথা শুনিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। এমন যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ তাঁহার পূর্ব্বে কেহ করেন নাই। তাঁহারই উৎসাহে ও চেষ্টায় পূর্ব্ববঙ্গের গাথা-কাব্যগুলি মুদ্রিত হইয়া বাংলা-সাহিত্যের পরম সম্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার কাছে এই ঋণ আমাদের অপরিশোধ্য।

জন্ম : বংশ-পরিচয়

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বগজুড়ী গ্রামে মাতুলালয়ে দীনেশচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার জন্ম-তারিখ—১৭ই কার্ত্তিক ১৭৮৮ শক, শুক্রবার, রাত্রি ৪ দণ্ড বাকী থাকতে ; ইংরেজী-মতে ৩রা নবেম্বর ১৮৬৬।* দীনেশচন্দ্রের

* দীনেশচন্দ্রের জন্মতারিখ "৬ই নবেম্বর, ১৮৬৬" বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। দীনেশচন্দ্র ও তাঁহার যমজ ভগিনীর জন্ম সম্বন্ধে পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেনের স্বহস্তলিখিত বাং ১২৭৩ সনের ১৮ই কার্ত্তিক তারিখের স্মারকলিপি এইরূপ :—

Memo. The birthday of my son and daughter is 17th Kartick Friday night at the last part nearly four *Dundo* remaining of that night. এই হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি 'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য' পুস্তকের ৭০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন ঢাকার সুয়াপুর গ্রাম-নিবাসী এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-পরিবারের সন্তান। তিনি ঢাকা জেলা-কোর্টের খ্যাতনামা সরকারী উকীল গোকুলকৃষ্ণ মুন্‌শীর কন্যা রূপলতা দেবীকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল, 'সত্যধর্ম্মোদ্দীপক: নাটক' ও 'ব্রহ্মসঙ্গীত রত্নাবলী' তাঁহারই রচনা। তাঁহার পত্নী ছিলেন ঠিক বিপরীত—প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার গভীর আস্থা ছিল। দীনেশচন্দ্রের জন্মকালে তাঁহার পিতা ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই স্কুলে হেডমাষ্টারি করিতেন। উপর্য্যুপরি নয়টি কন্যার পর জন্মগ্রহণ করাতে দীনেশচন্দ্র পিতামাতার বিশেষ আদরের সন্তান ছিলেন।

বিবাহ

১৮৭৮ সনে মাত্র বারো বৎসর বয়সে দীনেশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। পাত্রী—কুমিল্লা কলেক্টরীর হেডক্লার্ক উমানাথ সেনের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা বিনোদিনী।

বিদ্যাশিক্ষা

সুয়াপুরে গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া দীনেশচন্দ্র মাণিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন—পূর্ণচন্দ্র সেন। ইঁহার কাছে প্রথম তিনি ইংরেজী শেখেন। যে বৈষ্ণব পদাবলী দীনেশচন্দ্রের ভাবজীবনকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে তাহার অফুরন্ত রসমাধুর্য্যের সন্ধান প্রথম তিনি বাল্যজীবনের এই শিক্ষকের নিকট হইতে পান। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"আমার

যখন বারো বৎসর বয়স, তখন আমি তাঁহার কাছে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদের ব্যাখ্যা প্রথম শুনিয়াছিলাম।" মাণিকগঞ্জ স্কুল হইতে ১৮৭৯ সনে তৃতীয় বিভাগে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিয়া দীনেশচন্দ্র উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

অল্প বয়স হইতেই সাহিত্যের প্রতি দীনেশচন্দ্রের অনুরাগ ছিল অপরিসীম। ছাত্র-জীবনে সেই অনুরাগ উত্তরোত্তর যতই বাড়িতে লাগিল, পাঠ্য পুস্তকের প্রতি অবহেলা এবং অমনোযোগিতাও ততই ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া উঠিল। পাঠ্য পুস্তকে মোটেই তাঁহার মন বসিত না, সারাক্ষণ তিনি সাহিত্যালোচনা ও কবিতা রচনা লইয়া মাতিয়া থাকিতেন। সযত্ন অনুশীলন দ্বারা তিনি ইংরেজী সাহিত্য অনেকটা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু গণিতের উপর একটা স্বাভাবিক ভীতি ও মনের বিরূপ ভাব থাকায় অঙ্কশাস্ত্রে বরাবর কাঁচাই রহিয়া গেলেন। ছাত্র-জীবনে স্কুলপাঠ্য বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিলেও তিনি কবি ও সাহিত্যিক পরিচিতি লাভ করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

তাঁহার পরীক্ষাগুলির ফল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইং ১৮৮২ : এনট্রান্স, ৩য় বিভাগ, বয়স "১৪"...জগন্নাথ স্কুল, ঢাকা

ইং ১৮৮৫ : এফ. এ., ৩য় বিভাগ ...ঢাকা কলেজ

ইং ১৮৮৯ : বি. এ., ইংরেজীতে অনার্স, ২য় বিভাগ...Teacher

অন্ন-সংস্থানে

ছাত্র-জীবন শেষ হইতে না হইতেই অদৃষ্টের প্রতিকূলতায় দীনেশচন্দ্রের জীবনে দারুণ বিপর্যায় দেখা দিল; তাঁহার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। এফ-এ পরীক্ষা পাস করিয়া দীনেশচন্দ্র যখন সবে বি-এ পড়িতে সুরু করিয়াছেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল (৩০ আগষ্ট ১৮৮৬); ছয় মাস যাইতে না যাইতে মাতাও স্বামীর অনুগামিনী হইলেন (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭)। শেষ জীবনে ঈশ্বরচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ায় পরিবারের জন্য কিছু সংস্থান করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পিতৃহীন যুবক দীনেশচন্দ্রের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল; শুধু যে তাঁহার ছাত্র-জীবনেই ছেদ পড়িল তাহা নয়, এই অল্প বয়সেই পরিবার প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব-ভার তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল, অন্নসংস্থানের চেষ্টায় তিনি শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জে আসিয়া ৪০৲ টাকা বেতনে স্থানীয় স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের একটি চাকুরী গ্রহণ করিলেন। এইখানে শিক্ষকতাকালেই তিনি ১৮৮৯ সনে বি-এ পরীক্ষা পাস করেন। এই সময়ে কুমিল্লা শম্ভুনাথ ইনষ্টিটিউশনে ৫০৲ বেতনে হেডমাষ্টারের পদের বিজ্ঞাপন দেখিয়া তিনি দরখাস্ত করেন। কুমিল্লার প্রতি তাঁহার আকর্ষণের প্রধান কারণ—উহা তাঁহার শ্বশুরালয়। সুতরাং নিয়োগপত্র পাইবামাত্র তিনি পত্নী ও সদ্যোজাতা কন্যা মাখনবালাকে লইয়া হবিগঞ্জ ত্যাগ করিলেন। শম্ভুনাথ স্কুলে তিনি অল্প দিনই ছিলেন; উন্নতির আশায় তিনি নিকটবর্ত্তী ভিক্টোরিয়া স্কুলে যোগদান করেন; ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন জমিদার আনন্দচন্দ্র রায়।

দীনেশচন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টায় ভিক্টোরিয়া স্কুলের সুনাম দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই স্কুলে যোগদান করিবার পর হইতেই তাঁহার জীবনের মোড় ফিরিল। কুমিল্লায় আসার পরেই তিনি বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি সুরু করিলেন; 'ঢাকাপ্রকাশ,' 'অনুসন্ধান,' 'জন্মভূমি,' 'সাহিত্য' প্রভৃতিতে তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল। পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া তিনি হস্তলিখিত প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন—এমনিভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার অক্ষয় কীর্তি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' জন্মলাভ করিল এবং সাহিত্যিক-মহলে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এই জন্য কুমিল্লার অবস্থানকালটা তাঁহার জীবনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

একে শরীরের প্রতি ঔদাসীন্য, তাহার উপর গুরুতর পরিশ্রম—দীনেশচন্দ্র দারুণ মস্তিষ্ক-পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন (৬-১১-১৮৯৬)। পীড়া যখন ছয় মাসেও সারিল না, তখন চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনাই স্থির হইল। "পাঁচ ছয় মাস পরে, অর্থাৎ পীড়া সুরু হইবার প্রায় এক বৎসর পরে" তিনি অল্প অল্প হাঁটিতে সক্ষম হন। এই সময়ে আবার এক নূতন বিপদ দেখা দিল। কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবে শহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল—কাতারে কাতারে লোক ভয়ে কলিকাতা ত্যাগ করিতে লাগিল। ১৮৯৮ সনের শেষ ভাগে দীনেশচন্দ্রও পলাইতে বাধ্য হইলেন—তিনি অসুস্থ শরীরে অতি কষ্টে ফরিদপুরে গিয়া ভগিনীপতির নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন। ফরিদপুরে অবস্থানকালে—জীবনের চরম দুর্দিনে গুণমুগ্ধ গ্রীয়ারসনের পরামর্শে তিনি মাসিক বৃত্তির জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন। ১৮৯৯ সনে তাঁহার মাসিক ২৫৲ বৃত্তি মঞ্জুর হইয়াছিল।

সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ

দীনেশচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়িল। ১৯০০ সনের শেষার্দ্ধে তিনি ফরিদপুর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।* 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তখন তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে। বহু সাহিত্যিকের সমাগমে তাঁহার কলিকাতার বাসগৃহ মুখর হইতে লাগিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সুধীবর্গ প্রায়ই তাঁহার খোঁজখবর লইতে আসিতেন। ১৯০১ সনে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে চারি দিক হইতেই প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই দুর্দ্দিনে যাঁহারা অযাচিতভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত দীনেশচন্দ্রকে দুশ্চিন্তা-জাল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কুমার শরৎকুমার রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অসুস্থতার মধ্যেও দীনেশচন্দ্র বহু পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া মাসে দেড়-শ দুই-শ টাকা রোজগার করিয়াছেন। এক কথায় দীনেশচন্দ্রের অর্থকষ্ট তখন ঘুচিয়া গিয়াছিল।

* দীনেশচন্দ্র 'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্যে' (পৃ. ২৯৬) লিখিয়াছেন :—"১৯০০ সনের কার্ত্তিক কি অগ্রহায়ণ মাসে আমি সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।" প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ বৎসরের ৩১এ ভাদ্র তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন ; ঐ দিন তাঁহার লিখিত "গোবিন্দদাসের কড়চা" প্রবন্ধ পঠিত হইবার কথা ছিল (দ্র° ৫ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ)।

১৯০০ সনের জুন মাসে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে বি-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইবার আশায় দীনেশচন্দ্র তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হন। তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হয় নাই। এই সময় হইতেই কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। আশুতোষ দীনেশচন্দ্রকে সুনজরে দেখিয়াছিলেন; তাঁহারই অনুকম্পায় দীনেশচন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইতে পারিয়াছিল। ১৯০৯ ও ১৯১৩ সনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার হন, তাহার পর 'রামতনু লাহিড়ী-অধ্যাপকে'র পদ অলঙ্কৃত করেন; শেষোক্ত পদে তিনি দীর্ঘ কাল (১৯১৩-৩২) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও বহু প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ১৯২১ সনে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট্ উপাধি-দানে সম্মানিত করেন; গবর্মেণ্টও এই সময়ে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" খেতাবে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৯৩১ সনে দীনেশচন্দ্রের ভাগ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের "জগত্তারিণী-পদক" লাভ ঘটে।

বাংলা-সাহিত্যও তাঁহাকে কম সম্মান দান করে নাই। তিনি ১৯২৯ সনের ৩০এ-৩১এ মার্চ মাজু—হাওড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতি এবং ১৯৩৬ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের মূল ও সাহিত্য-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

মৃত্যু

রাঁচিতে সভাপতিত্বকালে দীনেশচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়। বাল্যকাল হইতে তিনি যাঁহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিয়োগ-ব্যথা দীনেশচন্দ্রকে বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। পত্নীর লোকান্তর গমনের অল্প কাল পরে ১৯৩৯ সনের ২০এ নবেম্বর জগদ্ধাত্রী পূজার দিন বেহালাস্থিত "রূপেশ্বর" ভবনে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়।

সাহিত্যানুরাগ

বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক দীনেশচন্দ্র জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যেভাবে মাতৃভাষার অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। বস্তুতঃ মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অন্ত ছিল না। এই অনুরাগ শৈশবেই তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে কবিতা-রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—

"আমার সাহিত্য-জীবন অতি শৈশবেই আরব্ধ হইয়াছিল। যখন আমার ৭ বৎসর বয়স, তখন আমি পয়ার ছন্দে সরস্বতীর এক স্তব লিখিয়াছিলাম। তৎপর কত যে কবিতা লিখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ক্লাসে ভাল ছাত্র না হইলেও পাঠ্য পুস্তক ছাড়া বাহিরের সাহিত্য-চর্চ্চায় আমার সমকক্ষ কেহ ছিল না। আমাদের সুয়াপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী নান্নার গ্রাম হইতে কৈবর্ত্ত-জমিদার

অম্বিকাবাবু 'ভারত-সুহৃদ্‌' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। আমার যখন ১০ বৎসর বয়স, তখন সেই পত্রিকায় "জলদ" নামক এক কবিতা লিখিয়া পাঠাই।* …ছাপা হইলে আমি যশের মুকুট মাথায় পরিয়া যেরূপ গৌরব বোধ করিয়াছিলাম —তাহা বলিবার নহে।…

আমি যখন প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন অক্ষয় সরকারের 'নবজীবন' প্রথম প্রকাশিত হয়। সে বোধ হয় ১৮৮৩ সন হইবে, তখন আমার বয়স ১৫। সেই বৎসরই আমার একটা কবিতা— "পূজার কুসুম" 'নবজীবনে' প্রকাশিত হয়।† তখন নীলকণ্ঠবাবু নবজীবনে লিখিতেন। ঢাকার এক পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক এরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন পত্রিকায় লিখিতেছে—দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।…"

বাল্যকাল হইতে কাব্য উপন্যাস ইত্যাদি পাঠেও তাঁহার প্রবল আসক্তি ছিল। সেই অল্প বয়সে কোন্ কোন্ পুস্তক তিনি সযত্নে অধিগত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তিনি বলিতেছেন—

"দশ বৎসর বয়সে মাইনর স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি বাজে বই অনেক পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবুর

* প্রকৃতপক্ষে নায়ার হইতে অম্বিকাচরণ রায়ের সম্পাদকত্বে 'ভারত-সুহৃদ' প্রকাশিত হয় ১২৮৫ সালের ফাল্গুন মাসে (মার্চ ১৮৭৯)। এই সময়ে দীনেশচন্দ্রের বয়স ছিল ১৩,—দশ নহে।

† 'নবজীবন' প্রথম প্রকাশিত হয়—১২৯১ সালের শ্রাবণ (জুলাই ১৮৮৪) মাসে। ইহার ৭ম সংখ্যায় "পূজার কুসুম" কবিতাটি প্রকাশিত হয়; রচনার শেষে লেখকের নাম ছিল না। এই সময়ে দীনেশচন্দ্রের বয়স ১৯ বৎসর,—"১৫" নহে।

উপন্যাস, হেমবাবুর কবিতাবলী, নবীন সেনের অবসর-রঞ্জিনী [অবকাশ-রঞ্জিনী ?] প্রভৃতি পুস্তকে আমি কৃতবিদ্য হইয়াছিলাম। আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল স্বর্গীয় দীনেশচরণ বসু মহাশয়ের 'কবিকাহিনী'—দীনেশ বসু মহাশয় তখন ঢাকা জেলার খ্যাতনামা কবি ছিলেন। ··

তার পর মাইনর ক্লাসে উঠিয়া আমি বাইরণের 'চাইল্ড হেরল্ড' ও 'ডন জুয়ান' প্রভৃতি পাঠ করি। সকলাংশ না বুঝিলেও যেটুকু বুঝিতাম, তাহাতে আমার কল্পনা আমাকে অনেক দূর লইয়া যাইত। আমি খাতার পর খাতা পূর্ণ করিয়া কবিতা লিখিয়া তৃপ্তি বোধ করিতাম।···"

দীনেশচন্দ্র বাল্যকালাবধি উচ্চাভিলাষী ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তিনি উত্তর-জীবনে কবিখ্যাতি লাভের স্বপ্ন দেখিতেন, গ্রন্থকার হইবার বাসনা পোষণ করিতেন। তাঁহার উচ্চাভিলাষ কিরূপ প্রবল ছিল, নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে তাহা সুপরিস্ফুট হইবে—

"দশ বৎসর বয়সে অবিনাশ এবং আমি একদা আমাদের বাড়ীর ধারে চড়ক-উৎসবের খোলা মাঠটায় দাঁড়াইয়া জীবনে কে কি করিব, তাহাই আলোচনা করিতেছিলাম।···আমি বলিলাম—'আমি কবি বা গ্রন্থকার হইব, কুঁড়েঘরেও যদি থাকি, তবে সেই কুঁড়েঘরের নিকট যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি মাথা নোওয়াইবেন।'··· যদিচ জীবনের নানা পথ অভীপ্সিত মত হয় নাই, কিন্তু যাহা শিশুকালে ভাবিতাম, এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই মূল লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছি।···যখন সেকেণ্ড-ইয়ার ক্লাসে পড়ি, তখন একটা নোট বুকে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলাম—'বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি তবে ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি

হওয়া প্রতিভায় না কুলোয়, তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রমলব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে, কার সাধ্য ?”

দীনেশচন্দ্র ছিলেন বৈষ্ণব কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের কবিতার একজন মরমী ভাবগ্রাহী। ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে’ অন্তরের দরদে নিষিক্ত করিয়া চণ্ডীদাসের কবিতার যে ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। বৈষ্ণব কবিতা তাঁহার শৈশব কল্পনাকে কি ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সে কথা তিনি বড়ই চিত্তাকর্ষকভাবে বলিয়াছেন—

“জীবনের একটা ধারা কৈশোর হইতে এক ভাবেই চলিয়া আসিয়াছিল। কাব্যানুরাগ দিদি দিগ্বসনী দেবী আমায় দান করিয়াছিলেন, তিনি যখন বৈষ্ণবপদ মৃদুস্বরে গাইতে থাকিতেন, তখন আমার মনে যে আনন্দ হইত, তাহা শুধু অশ্রুজল-প্লাবিত হইয়া ভাসিয়া যাইত না, তাহা আমার কল্পনার ঘরে আরতির ঘিয়ের বাতি জ্বালাইয়া দিত। তাঁহার কণ্ঠের সেই মধুর ‘রজনী শাঅণ ঘন, ঘন দেওয়া গরজন, রিমি ঝিমি শবদে বরিষে’ গান আমার চক্ষে বর্ষাকে এক নূতন সজ্জায় সাজাইয়া উপস্থিত করিত।”
(‘ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য,’ ইং ১৯২২)

কবিতা রচনা দ্বারা দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থও কাব্যগ্রন্থ—নাম ‘কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ’ (ইং ১৮৯০)। এই কবিতার বই কিন্তু তাঁহার কবিখ্যাতি অর্জ্জনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয় নাই। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘রেখা’ (জানুয়ারি ১৮৯৫); ইহার সন্দর্ভগুলি ১৮৯১-৯২ সনে ‘অনুসন্ধান,’ ‘জন্মভূমি’ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, আদৃতও হইয়াছিল। এ সকল গ্রন্থ রচনা দ্বারা তাঁহার লেখনীকণ্ডূয়নবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছিল বটে, কিন্তু এগুলি তাঁহাকে বিশেষ যশের অধিকারী করে নাই। অন্ধকারে

হাতড়াইতে হাতড়াইতে অবশেষে দীনেশচন্দ্র স্বকীয় পথ খুঁজিয়া পাইলেন। বঙ্গের বহু অখ্যাত পল্লী হইতে বাংলা পুথির উদ্ধারসাধনে তিনি অদম্য উৎসাহে লাগিয়া গেলেন। প্রধানতঃ এই শ্রেণীর উপকরণের সাহায্যে তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানি প্রামাণিক ইতিহাস রচনায় প্রণোদিত হন। ইহারই ফল—১৮৯৬ সনের শেষ ভাগে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,' ত্রিপুরাধিপের আনুকুল্যে কুমিল্লাতেই মুদ্রিত হয়। ইহা শুধু তাঁহার তখনকার নয়, সমগ্র জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কৃত্য। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাকে কি বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, গ্রন্থের ভূমিকায় তাহার আভাস আছে; তিনি লিখিয়াছেন—

"অদ্য ছয় বৎসর গত হইল একদিন আমার পুস্তকাধারস্থিত অতি জীর্ণ, গলিত-পত্র, প্রেমাশ্রুর নীরব নিকেতন চণ্ডীদাসের কবিতাখানা পড়িতে পড়িতে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা জন্মে; ভিক্টোরিয়া স্কুলের সেই সময়ের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থের সাগ্রহ প্রবর্ত্তনায় এই ইচ্ছা সুদৃঢ় হয়। বৈষ্ণব-কবিগণের গীতি, কবি-কঙ্কণের চণ্ডীকাব্য, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান ও অপর কয়েকখানা বটতলার ছাপা পুঁথিমাত্র আমার সম্বল ছিল, আমি তাহা পড়িতাম ও কিছু কিছু নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। ১৮৯২ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতার পিস এসোসিয়েশন হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে "বিদ্যাসাগর-পদক" অঙ্গীকার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, এই সুযোগ পাইয়া তিন মাস কাল মধ্যে আমি সংক্ষেপে বঙ্গভাষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখি, উক্ত

২

সমিতি আমার প্রবন্ধটি মনোনীত করিয়া "বিদ্যাসাগর-পদক" আমাকে প্রদান করেন।

এই প্রবন্ধ রচনার সময় রতিদেব-কৃত 'মৃগলুব্ধের' একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি দৈবক্রমে আমার হস্তগত হয় এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই যে, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে অনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি আছে; এই সংবাদ পাইয়া নিজে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া সঞ্জয়কৃত মহাভারত, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব, রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা, দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদ-চরিত্র, রাজরাম দত্তের দণ্ডীপর্ব্ব, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাসের মহাভারতোক্ত উপাখ্যান প্রভৃতি বিবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করি। তখন বঙ্গভাষার একখানা বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প মনে স্থির হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় হইতে সুদূরে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে সব প্রাচীন পুঁথি কীটগণের করাল দংষ্ট্রাবিদ্ধ হইয়া কথঞ্চিৎ প্রাণরক্ষা করিতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় কি? কীট কর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়া ব্যতীত প্রতি বৎসর কাল তাহাদিগকে বহ্নিযজ্ঞে আহুতি দিতেছেন—যাহা এখনও আছে, তাহা কিরূপে রক্ষা হয়? আমি এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে একদিন এসিয়াটিক সোসাইটির খ্যাতনামা মেম্বর ডাক্তর হোরন্‌লি সাহেবের নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইয়া এক পত্র লিখি। তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে বিশেষরূপ ধন্যবাদ ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য অঙ্গীকার করেন; এই সূত্রে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পত্র দ্বারা পরিচয় হয়; তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য উদ্ধার করিতে ইতিপূর্ব্বেই উদ্যোগী ছিলেন,—আমার প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাঁহার উপদেশানুসারে

এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীমান বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ আমার সহায়তার জন্য কুমিল্লায় আগমন করেন। আমরা উভয়ে মিলিয়া পরাগলী (কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত) মহাভারত, ছুটিখাঁর (শ্রীকর নন্দীর রচিত) অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি আরও অনেক পুঁথি সংগ্রহ করি। বিনোদবাবু মধ্যে মধ্যে আসিয়া কতক দিন কাজ করিয়া চলিয়া যাইতেন; কিন্তু আমি বৎসর ভরিয়া ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের নানা জেলা হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি, মধ্যে মধ্যে আমার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর সেন ডিপুটি মেজিষ্ট্রেট মহাশয়ের সঙ্গে মফঃস্বলে ক্যাম্পে বাস করিয়া ক্রমাগত পর্য্যটন করিয়াছি। এই সময়ে কবি আলোয়াল কৃত পদ্মাবতী, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কৃত কাশীখণ্ড, রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত, মধুসূদন নাপিত প্রণীত নল দময়ন্তী, প্রভৃতি গ্রন্থ আমাকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত পুস্তকের কয়েকখানা ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অপরাপর কোন কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকায় [১৩০১—১৩০২] মল্লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে হস্তলিখিত পুঁথি খোঁজ করা অতি দুরূহ ব্যাপার—বিশেষত প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের ঘরে রক্ষিত, আমাদের সাগ্রহ যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধির কৌশল অনেক সময়েই তাহাদের কুসংস্কারের দৃঢ়ভিত্তি বিচলিত করিতে পারে নাই, তাহারা কোন ক্রমেই পুস্তক দেখাইতে সম্মত হয় নাই; দৈবাৎ পুস্তক ধরা পড়িলে কেহ কেহ ট্যাক্সের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন দিন ১০ মাইল পদব্রজে গমন ও সেই ১০ মাইল পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন কেবল গমনাগমন সার হইয়াছে।...

এই ছয় বৎসরের চেষ্টায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম ভাগ অদ্য পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই পুস্তকে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া, সাময়িক আচার ব্যবহার, দেশের ইতিহাস ইত্যাদি নানারূপ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।"

এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ গুণী, জ্ঞানী ও মনীষীদের নিকট হইতে যে ধরণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিলেন, তাহা আমাদের দেশের সাহিত্য-সাধকদের অদৃষ্টে সচরাচর জোটে না।

কিন্তু শুধু প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস রচনাতেই তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ থাকে নাই। রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের বিশ্লেষণে এবং অনেকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর নব রূপায়ণে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'রামায়ণী কথা' রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

গ্রন্থাবলী

দীনেশচন্দ্রের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিবার চেষ্টা করিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। পুস্তকে প্রকাশকাল নির্দ্দেশের অভাব প্রশ্নচিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে :—

১। **কুমার ভুপেন্দ্র সিংহ** (কাব্য)। (১০ এপ্রিল ১৮৯০)। পৃ. ৫৬।

ইহার কিয়দংশ 'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্যে' (পৃ. ১১৪-১৭) উদ্ধৃত হইয়াছে।

২। **রেখা** (প্রবন্ধ-সমষ্টি)। ১৩০১ সাল (২০ জানুয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ৭২।

সূচী: জন্মান্তর-বাদ ['অনুসন্ধান,' ৩০ ফাল্গুন ১২৯৭], সেক্ষপীয়র বড় কি কালিদাস বড়? ['জন্মভূমি,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮], বাল্মীকি ও হোমার—রামায়ণ ও ইলিয়াড ['অনুসন্ধান,' ৩২ জ্যৈষ্ঠ ও ১৫ আষাঢ় ১২৯৯], বঙ্গে ভক্তি।

৩। **বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,** ১ম ভাগ (ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)। ? (২ ডিসেম্বর ১৮৯৬)। পৃ. ৪০৩।

৪। **তিন বন্ধু** (উপন্যাস)। (১৫ জুলাই ১৯০৪)। পৃ. ১৬৮।

"এই আখ্যায়িকার প্রথমাংশ (রাণী দুর্গাবতীর বিচার পর্য্যন্ত) একটি শৈশব-শ্রুত কাহিনীর অস্পষ্ট স্মৃতির উপাদান লইয়া রচিত হইয়াছে।…পরবর্ত্তী অংশ সম্পূর্ণরূপে লেখকের কল্পনার সৃষ্টি।"

৫। **রামায়ণী কথা**। ১৩১১ সাল (১৬ জুলাই ১৯০৪)। পৃ. ২২১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সহ।

৬। **বেহুলা** (পৌরাণিক কাহিনী)। (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭)। পৃ. ১৩৭।

৭। **সতী** (পৌরাণিক কাহিনী)। ১৩১৩ সাল। (২ মার্চ ১৯০৭)। পৃ. ১০২।

৮। **ফুল্লরা** (পৌরাণিক আখ্যায়িকা)। (৯ মার্চ ১৯০৭)। পৃ. ১২০।

৯। **জড়ভরত** (পৌরাণিক আখ্যায়িকা)। (১ মে ১৯০৮)। পৃ. ১৪১।

১০। **স্বকথা** (সন্দর্ভ-সংগ্রহ)। ১ আগষ্ট, ১৯১২। পৃ. ১৩৩।

সূচী: মাতৃগুপ্ত, সূর্য্য স্থপতি, যশস্করের বিচার, আওরঙ্গজেব ও তাঁহার শিক্ষক, দিগম্বর সান্যাল, হরিহর বাইতি, এদেশের প্রাচীন আদর্শ ও রামকৃষ্ণ পরম হংস।

এই পুস্তকের শেষে 'পত্রসন্দর্ভ' নামে ।/০ মূল্যের একখানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন আছে। ইহা দীনেশচন্দ্রের প্রাথমিক রচনা হওয়াই সম্ভব।

১১। **ধরা-দ্রোণ ও কুশধ্বজ** (পৌরাণিক উপাখ্যান)। (১০ আগষ্ট ১৯১৩)। পৃ. ১০৩।

১২। **গৃহশ্রী**। ১৩২২ সাল (৩ মার্চ ১৯১৬)। পৃ. ৩৫৮।

"বাড়ীর মেয়েদিগকে ঘরকরণা সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ।"

১৩। **সম্রাট্ ও সম্রাট্-মহিষীর ভারত-পরিদর্শন** (সচিত্র)। ২২ এপ্রিল ১৯১৮। পৃ. ২৩৫।

"ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট সঙ্কলিত '১৯১১ সনের রাজদম্পতীর ভারত-পরিদর্শনের ইতিবৃত্ত' নামক ইংরাজি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ।"

১৪। **নীলমাণিক** (পল্লীচিত্র)। ভাদ্র ১৩২৫ (২০-৮-১৯১৮)। পৃ. ১৯৬।

১৫। **সাঁঝের ভোগ** (শিশুপাঠ্য গল্প)।? (১০ মার্চ ১৯২০)। পৃ. ১৪৮।

১৬। **মুক্তা চুরি** (পৌরাণিক আখ্যায়িকা)।? (১৪ এপ্রিল ১৯২০)। পৃ. ৮২।

১৭। **রাখালের রাজগি** (পৌরাণিক আখ্যায়িকা)। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ (২০-৫-১৯২০)। পৃ. ৮০।

১৮। **রাগরঙ্গ** (পৌরাণিক আখ্যায়িকা)। ? (২৪ মে ১৯২০)। পৃ. ৭৭।

১৯। **গায়ে হলুদ**। ১৩২৭ সাল (ইং ১৯২০)। পৃ. ১৩২।

"ছোট্ট কনে বউদের জন্ত এই বইখানি লেখা হয়েছে।"

২০। **বৈশাখী** (শিশুপাঠ্য গল্প)। ? [অগ্রহায়ণ ১৩২৭]। পৃ. ১৬৬।

২১। **সুবল সখার কাণ্ড** (বৈষ্ণবোপাখ্যান)। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ (১০-৬-১৯২২)। পৃ. ৬২।

২২। **সরল বাঙ্গালা সাহিত্য**। শ্রাবণ ১৩২৯ (ইং ১৯২২)। পৃ. ২২৭।

২৩। **ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য**। ? (২৫ জুলাই ১৯২২)। পৃ. ৪৪৯।

লেখক ইহাতে আত্মজীবনের বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তারিখগুলি সর্ব্বত্র নির্ভুল নহে।

২৪। **বৈদিক ভারত**। ? [আশ্বিন ১৩২৯, ইং ১৯২২]। পৃ. ১১৬।

বেদ অবলম্বনে লিখিত গল্প।

২৫। **ভয় ভাঙ্গা** (গল্প)। ? (ইং ১৯২৩)। পৃ. ৩৬।

২৬। **দেশমঙ্গল** (গল্প)। ? (৬ ডিসেম্বর ১৯২৪)। পৃ. ২ + ২০।

"খাঁটি দেশী, সুললিত গল্প। দেয় ভিক্ষা তিন আনা।" পুস্তিকার প্রারম্ভে দুই-পৃষ্ঠাব্যাপী একটি "আবাহন-গীতি" আছে; উহার প্রথম দুই পংক্তি এইরূপ—

"ঘরে ছেলে তোরা, সবে আয় রে ঘরে ফিরে।
মিছে কেন মোহের ঘোরে, ঘুরে বেড়াস্ পরের দোরে।"

২৭। **আলোকে-আঁধারে** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩২ (২৬ আগষ্ট ১৯২৫)। পৃ. ১৪৫।

২৮। **কানুপরিবাদ ও শ্যামলীখোঁজা** (পৌরাণিক আখ্যায়িকা)। ১৩৩২ সাল। (১০ ডিসেম্বর ১৯২৫)। পৃ. ৯২।

২৯। **চাকুরীর বিড়ম্বনা** (উপন্যাস)। ? (১২ জানুয়ারি ১৯২৬)। পৃ. ১৭৫।

৩০। **ওপারের আলো** (উপন্যাস)। ? (ইং ১৯২৭)। পৃ. ৩৪৬।

৩১। **মামুদের শিবমন্দির** (উপন্যাস)। ? (২০ অক্টোবর ১৯২৮)। পৃ. ৩১৭।

গ্রন্থে লেখকের নাম নাই। ইহা হিন্দু-মিশন বাণীমন্দির কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে "বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলমান যে একই বৃক্ষের শাখা, জ্ঞাতিত্ব সূত্রে আবদ্ধ, তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।"

৩২। **পৌরাণিকী**। আগষ্ট ১৯৩৪। পৃ. ৭৫ + ৬২ + ৪৮ + ৫৩ + ২৬ + ১৭।

বেহুলা, জড়ভরত, সতী, ফুল্লরা, ধর্ম্মাদ্রোণ, ও কুশধ্বজ একত্রে মুদ্রিত।

৩৩। **বৃহৎ বঙ্গ** [সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত]:
১ম খণ্ড : ১৩৪১ সাল (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫)। পৃ. ৬০৯।
২য় খণ্ড : ১৩৪২ সাল (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫)। পৃ. ৬১০-১২১৫।

৩৪। **আশুতোষ-স্মৃতিকথা**। ইং ১৯৩৬। পৃ. ২৮৮।

৩৫। **পদাবলী-মাধুর্য্য** (সন্দর্ভ)। মহালয়া ১৩৪৪ (ইং ১৯৩৭)। পৃ. ১৫৮।

৩৬। **শ্যামল ও কজ্জল** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। জন্মাষ্টমী ১৩৪৫ (ইং ১৯৩৮)। পৃ. ২০১।

৩৭। **পুরাতনী** (মুসলিম-নারীচিত্র)। (৯ জুলাই ১৯৩৯)। পৃ. ১৭০।

"এই চিত্রগুলি অন্যূন দুই শত বৎসরের প্রাচীন, অনেকাংশে সত্যঘটনামূলক বাঙ্গালী রমণীর কাহিনী।"

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৩৮। **বাংলার পুরনারী**। ডিসেম্বর ১৯৩৯। পৃ. ৪০০।

"প্রাচীন যুগের কয়েকটি বঙ্গললনার আখ্যায়িকা।" লেখকের জীবনী সহ।

৩৯। **প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান**। অক্টোবর ১৯৪০। পৃ. ২১৭।

১৯৩৭ সনের নবেম্বর মাসে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত চারিটি বক্তৃতার সমষ্টি।

দীনেশচন্দ্র স্বয়ং বা অপরের সহযোগিতায় যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেগুলি—

১। **ছুটীখানের মহাভারত** (অশ্বমেধপর্ব্ব) : শ্রীকর নন্দী। ১৩১২ সাল (ইং ১৯০৫) পৃ. ১৪০।

সম্পাদক : বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও দীনেশচন্দ্র সেন।

২। **শ্রীধর্ম্মমঙ্গল** : মাণিক গাঙ্গুলি। ১৩১২ সাল (ইং ১৯০৫)। পৃ. ২২৭।

সম্পাদক : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন।

৩। **কাশীদাসী মহাভারত**। (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১২)। পৃ. ১১২৪।

৪। **বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়** (Typical Selections from the Bengali Literature from the earliest times to the Middle of the Nineteenth Century :)

১ম খণ্ড : ইং ১৯১৪ (১ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ৯৫৯।

২য় খণ্ড : ইং ১৯১৪ (১ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ৯৬৩—১৯৭৪।

৫। **কৃত্তিবাসী রামায়ণ**। [জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, ইং ১৯১৬]।

৬। **গোপীচন্দ্রের গান** উত্তর-বঙ্গে সংগৃহীত :

গান সঙ্কলয়িতা : শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়।

১ম খণ্ড : ইং ১৯২২। পৃ. ৩১১।

২য় খণ্ড : ইং ১৯২৪ (১৫ জুন)। পৃ. ১৮৭।

৭। **ময়মনসিংহ গীতিকা** [পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা] :

প্রধানতঃ চন্দ্রকুমার দে কর্ত্তৃক সংগৃহীত। দীনেশচন্দ্র "কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত।"

ময়মনসিংহ গীতিকা : ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। ইং ১৯২৩। পৃ. ৩৭৫।

পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা : ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা। ইং ১৯২৬। পৃ. ৪৮৬।

৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা। ইং ১৯৩০। পৃ. ৫৩৪।

৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। ইং ১৯৩২। পৃ. ৫৭৯।

৮। **কবিকঙ্কণ-চণ্ডী** :

সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ বসু।

১ম ভাগ : ইং ১৯২৪। পৃ. ৩৫৩।

২য় ভাগ : ইং ১৯২৬ (২১ আগষ্ট)। পৃ. ১০১৯।

৯। **গোবিন্দ দাসের করচা** (নব সংস্করণ)। ইং ১৯২৬ (১৫ আগষ্ট)। পৃ. ৯৩।

সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র সেন ও প্রভুপাদ বনোয়ারীলাল গোস্বামী।

১০। **হরিলীলা :** লালা জয়নারায়ণ সেন। ? (১ মার্চ ১৯২৮)। পৃ. ১৬৫।

সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

১১। **কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী**। ১৩৩৫ সাল (ইং ১৯২৮)। পৃ. ৩৫৮।

১২। **বৈষ্ণব পদাবলী** (চয়ন)। ইং ১৯৩০। পৃ. ১৫০।

সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

দীনেশচন্দ্র ইংরেজীতে বাংলা-সাহিত্য-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন ইত্যাদি দ্বারা বঙ্গের বাহিরে—বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বাংলা-সাহিত্যের গৌরব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন ইংরেজী রচনার মারফতে গ্রীয়ার্সন, সিলভাঁ লেভি, রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতির মত পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দৃষ্টি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ভাব-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

দীনেশচন্দ্রের ইংরেজী গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

1. **History of Bengali Language and Literature.** 1911. pp. 1030.
2. **Sati.** (10 Oct. 1916). pp. 107.
   গ্রন্থকার-কৃত 'সতী'র ইংরেজী অনুবাদ।
3. **The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal.** 1917. pp. 257. Preface by J. D. Anderson, I. C. S.
4. **Chaitanya and his Companions.** 1917 (28 November). pp. 309.
5. **The Folk-Literature of Bengal.** 1920 (24 March). pp. 362. Foreword by W. R. Gourlay.

6. **The Bengali Ramayanas.** 1920. pp. 305.
7. **Bengali Prose Style : 1800-1857.** 1921. pp. 153.
10. **Chaitanya and His Age.** 1922 (7 October). pp. 417. Foreword by Dr. Sylvain Levi.
11. **Eastern Bengal Ballads Mymensing.** Foreword by Lord Ronaldshay.
    Vol. I, Pt. 1 : 1923. pp. 322.
    II, Pt. 1 : 1926. pp. 469.
    III, Pt. 1 : 1928. pp. 435.
    IV, Pt. 1 : 1932. pp. 446.
12. **Glimpses of Bengal Life.** 1925 (15 Aug.). pp. 313.

সাময়িকপত্র-পরিচালন

দীনেশচন্দ্র সাময়িকপত্র পরিচালনেও কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি একদা রবীন্দ্রনাথকে 'বঙ্গদর্শন' ও সরলা দেবীকে 'ভারতী' পরিচালনে সম্যক্ সহায়তা করিয়াছিলেন—'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য' পুস্তকের ২০শ অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ আছে। তিনি স্বীয় নামেও দুইখানি মাসিক পত্রিকা কিছু দিন সম্পাদন করিয়াছিলেন ; উহা—

(ক) **'বঙ্গবাণী,'** ১ম ও ২য় বর্ষ (ফাল্গুন ১৩২৮—মাঘ ১৩৩০)।

ইহার অন্যতর সম্পাদক ছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(খ) **'বৈদ্য-হিতৈষিণী'** : পৌষ ১৩৩১…

বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির মুখপত্র। দীনেশচন্দ্র শুধু উহার সম্পাদকই ছিলেন না, সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতিও ছিলেন।

সখারাম গণেশ দেউস্কর

১৮৬৯—১৯১২

এই একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক, নির্ভীক সাংবাদিক ও দেশপ্রেমিক 'দেশের কথা'র রচয়িতা সখারাম গণেশ দেউস্করকে আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু একদা বাংলা-সাহিত্যে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ইতিহাস, জীবনচরিত ইত্যাদি এক দিকে যেমন বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিল, অন্য দিকে তেমনি তাঁহার অগ্নিগর্ভ রচনাবলী আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মর্ম্মমূলেও প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল।

বাংলা দেশের অধিবাসী ত্রিবেদী, শুকুল, পাঁড়ে প্রভৃতি উপাধিধারী কণৌজিয়া ব্রাহ্মণ এবং সিংহ-উপাধিধারী রাজপুতদের ন্যায় সখারামও ছিলেন জাতিতে অবাঙালী। কিন্তু বাংলা দেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ভাষা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া তিনি বাঙালী জাতির সহিত একাত্ম হইয়া যান। বস্তুতঃ এই দারিদ্র্যব্রতধারী মরাঠী ব্রাহ্মণ যে-ভাবে বাংলা-সাহিত্যের সাধনায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

বংশ-পরিচয় : জন্ম : বিদ্যাশিক্ষা

সখারাম গণেশ দেউস্কর মহারাষ্ট্রের এক বিদ্যানুরাগী ব্রাহ্মণ-পরিবারের কৃতী সন্তান। ইঁহাদের আদি নিবাস—বোম্বাই প্রদেশের

অন্তর্গত রত্নগিরি জেলায় ছত্রপতি শিবাজীর আলবান নামক দুর্গের নিকটবর্ত্তী দেউস্ গ্রাম। সখারামের পিতামহ সদাশিব, শ্যালকের নিকট হইতে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ বৈদ্যনাথের নিকটস্থ করো গ্রাম প্রাপ্ত হন। "করো গ্রামে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্র গণেশ সদাশিব কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করেন। গিধোড়ের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহ বৈদ্যনাথ দেওঘরে বাস করিতেন। তিনি গণেশ সদাশিবকে আশ্রয় দেন। ১৯২৬ সংবতের পৌষ মাসে শুক্লা-চতুর্দ্দশী তিথিতে (১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯) তাঁহার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে বাঙ্গলা দেশে বিখ্যাত ও দেশবাসীর শ্রদ্ধা-প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন।"

সখারাম গণেশ দেউস্কর—এই নামের মধ্যেই তাঁহার নিজের নাম, পিতৃনাম ও বংশ-পরিচয় নিহিত। তাঁহার নাম সখারাম, পিতার নাম গণেশ এবং বংশের নাম দেউস্কর। সখারামের জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয় নাই। সারা জীবনই প্রতিকূল অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইয়াছিল। এই দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হয় তাঁহার শৈশবেই; সখারামের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বৎসর তখন তাঁহার মাতা লোকান্তরিতা হন। সাধ্বী পত্নীর মৃত্যুর পর সখারামের পিতা আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। সখারামই ছিলেন—একপত্নীব্রত পুত্রবৎসল পিতার নয়নের মণিস্বরূপ।

পত্নীবিয়োগের পর সখারামের পিতা নিজের এক ভগিনীর উপর এই মাতৃহীন শিশুর লালন-পালনের ভার অর্পণ করেন। সখারামের এই পিতৃস্বসা যেমন ছিলেন বুদ্ধিমতী ও বিদ্যানুরাগিণী, তেমনই গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা। "তাঁহার মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার ছিল। তাঁহারই যত্নে, উপদেশে, পরিশ্রমে সখারামের চরিত্র গঠিত

হইয়াছিল।" এই পুণ্যবতী মহিলার আদর্শ ও শিক্ষাদান সখারামের উত্তর-জীবনে পরিপূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইনি শিশু সখারামের হৃদয়ে মরাঠী-সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তী জীবনে তাঁহাকে উক্ত সাহিত্যের রত্নরাজি আহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারের সম্পদ-বৃদ্ধিতে প্রণোদিত করিয়াছিল।

সখারাম শৈশবাবধিই বাঙালী শিশুদের মত বাংলা শিখিতে আরম্ভ করেন। সখারামের পিতা যে কাশীতে অল্প কাল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সে কথা আগেই বলিয়াছি। পুত্রকেও বাল্যকালেই ভারতের অধ্যাত্ম-সম্পদের সহিত পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহার বেদ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন।

কিছু কাল বেদ অধ্যয়নের পর সখারামকে দেওঘর উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। মাইকেলের চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু তখন এই স্কুলের হেডমাষ্টার। তাঁহার শিক্ষার গুণে সখারাম বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠেন। বাংলা ভাষার চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মরাঠী ভাষা এবং সাহিত্যও সযত্নে আয়ত্ত করিতে সুরু করেন। যোগীন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে তাঁহার এই প্রিয় ছাত্রটির মনে শুধু যে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগই উদ্দীপ্ত হইল তাহা নহে, বাল্য-বয়সেই বাংলা রচনায় তাঁহার হাতে-খড়ি হইল। ইতিহাসচর্চ্চায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। সখারাম নানা ঐতিহাসিক সন্দর্ভ লিখিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন। এই তরুণ লেখকের রচনাবলী তখনকার প্রতিষ্ঠাপন্ন মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখনকার দিনে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্যে' লেখা বাহির হওয়া কম কথা ছিল না। 'সাহিত্যে' রচনা প্রকাশিত হইলে তদানীন্তন লেখকেরা বাংলা-সাহিত্যের আসরে জাতে উঠিতেন, এ কথা বলিলে কিছু মাত্র

অতিশয়োক্তি হয় না। সমাজপতির সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া সখারামের রচনা যে খাঁটি সোনা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝা যায়, অনুশীলন দ্বারা রচনার কিরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। দেশাত্মবোধের বীজও দেওঘরে এই সুযোগ্য শিক্ষকের প্রযত্নে ছাত্র-জীবনেই সখারামের হৃদয়ে উপ্ত হয়।

এই দেওঘরেই আর একজন দেশহিতব্রত মনীষীর জীবনাদর্শ সখারামকে তরুণ বয়সে দেশসেবায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল; তিনি দেওঘর-প্রবাসী মনস্বী রাজনারায়ণ বসু। এ বিষয়ে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সখারাম সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"তিনি অবসর পাইলেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে যাইতেন। বসু-মহাশয় পরম ধার্ম্মিক, সুপণ্ডিত, সাহিত্যানুরাগী ও মজলিসী লোক ছিলেন। সখারাম নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন। সেই মজলিসে সখারামের সহিত আমার পরিচয় ঘনীভূত হয়।"*

কর্ম্মজীবন

পারিবারিক অভাব-অনটনের দরুন সখারামকে অল্প বয়সেই জীবিকা সংস্থানের জন্য মনোযোগী হইতে হইল, তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল সামান্য শিক্ষাব্রতীরূপে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘর বিদ্যালয়ে সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে সখারাম মাসিক ১৫৲ বেতনে সেই পদে নিযুক্ত হন। এই সময়েও তিনি অবসরকালে রচনাচর্চ্চা করিতেন, 'হিতবাদী'তে নিয়মিত ভাবে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। তখন

* 'আর্য্যাবর্ত্ত,' অগ্রহায়ণ ১৩১৯।

দেওঘরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন—মিঃ হার্ড। 'হিতবাদী'তে ইঁহার অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে নানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে লিখিতেছেন :—"যোগীন্দ্রবাবু ও সখারাম দুই জনেরই বাঙ্গালা লেখক 'অপবাদ' ছিল। তাই দুই জনে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপানলে পতিত হইয়া চাকরি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।" ঐ হাকিম ছিলেন দেওঘর-বিদ্যালয়ের স্কুল-কমিটির সভাপতি। তাঁহার প্রতিকূলতায় সখারাম কর্ম্মচ্যুত ত হইলেনই, এমন কি দেওঘরে বাস করাও ক্রমশঃ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি ১৮৯৭ সনে সপরিবারে দেওঘর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দেওঘর পরিত্যাগ কিন্তু সখারামের পক্ষে শাপে বর হইল। দেওঘরের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে কলিকাতার বৃহত্তর কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া তিনি নিজের প্রতিভা বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র পাইলেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তখন 'হিতবাদী'র সম্পাদক; তিনিই এই সময়ে বিপন্ন সখারামের সহায়ক হইলেন। "সখারাম 'হিতবাদী'তে লিখিয়াছিলেন সেই সন্দেহে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া বিশারদ তাঁহাকে 'হিতবাদী'তে চাকরি দিলেন।" সখারাম মাসিক ৩০৲ বেতনে 'হিতবাদী'র প্রুফ-সংশোধকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কর্ম্মদক্ষতাগুণে অচিরাৎ তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইল, তিনি ক্রমশঃ বিশারদের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ১৯০৭ সনে পীড়িত কালীপ্রসন্ন যখন স্বাস্থ্যান্বেষণে জাপান যাত্রা করেন, সেই সময়ে সখারামের সবল হস্তেই তিনি 'হিতবাদী'র পরিচালন-ভার ন্যস্ত করিয়া যান। জাপান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বারিধিবক্ষে বিশারদের মৃত্যু হইলে (৪ জুলাই ১৯০৭), 'হিতবাদী'র কর্ত্তৃপক্ষ সখারামকেই স্থায়ী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন; তাঁহার বেতন হয় মাসিক ৯০৲ টাকা।

ইহার চার পাঁচ মাস পরেই সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত

হয়। এই অধিবেশন কিরূপে লোকমান্য তিলকের অনুগামীদের দ্বারা দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়, সে কাহিনী সুবিদিত। যেদিন এই কাণ্ড হয়, সেই দিনই সুরাট হইতে হিতবাদীর স্বত্বাধিকারিগণ তিলকের বিরুদ্ধে হিতবাদীতে লিখিবার জন্য সখারামকে তার করেন। তার পাইয়া তেজস্বী মরাঠা ব্রাহ্মণ সখারামের আত্মমর্য্যাদাবোধ মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। তিলকের নিকট তিনি স্বাদেশিকতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন—তিলক ছিলেন তাঁহার গুরু। সেই দেশহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ গুরুকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখনী ধারণ!—এ কথা চিন্তা করিতেই তাঁহার সমস্ত অন্তর কর্ত্তৃপক্ষের এই অন্যায় অনুরোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রীতিমত ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন, বরং ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয় তাহাও স্বীকার, তবু এ কাজ তাঁহার দ্বারা হইবে না। তিনি নিজের দারিদ্র্যের কথা, পরিবার-পরিজনের অন্নসংস্থানের কথা—সকলই ভুলিয়া গেলেন; সখারাম এক কথায় 'হিতবাদী'র চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনায় সখারাম স্ব-মতের প্রতি যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা সাংবাদিক জগতে বিরল। বাস্তবিকই "মতের স্বাতন্ত্র্যে তাঁহার অকপট অনুরাগ ছিল। জীবিকার জন্য তিনি পরমতের অনুবর্ত্তন ও আত্মমতের বলিদানে সম্মত হন নাই।"

ইতিহাসে সখারামের গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সারা জীবন প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের সহিত ইতিহাসের চর্চ্চায় রত ছিলেন। 'হিতবাদী'র সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার অল্প দিন পরেই তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল স্কুল—জাতীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপকের পদ লাভ করেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লেখেন নাই। জীবনে বার বার স্বেচ্ছায় তিনি দুঃখ-দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছেন,

তবু আত্মমর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। তাঁহার জাতীয় বিদ্যালয়ের চাকরিটিও বেশী দিন স্থায়ী হইল না। এই বিষয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিতেছেন :—

"সরকার হইতে তাঁহার সামান্য আয়ের উপায় 'দেশের কথা' ও 'তিলকের মৌকদ্দমা' পুস্তকের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে 'জাতীয় পরিষদে'র শঙ্কিত কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের ভাব বুঝিয়া সখারাম অধ্যাপক-পদ ত্যাগ করিলেন।"

দেশ-সেবা

মহারাষ্ট্রের সন্তান হইয়া সখারাম বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে আপন জন বলিয়া মনে করিতেন। বাঙালীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত ছিল তাঁহার নাড়ীর যোগ; বাঙালীদের তিনি স্বজন বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বাংলা দেশের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল গভীর। এই স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় তিনি বঙ্গব্যবচ্ছেদ-আন্দোলন—বাঙালীর সর্ব্বপ্রকার জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। সখারাম 'যুগান্তরে'ও মাঝে মাঝে লিখিতেন। এই দলের সহিত তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁহারই উদ্যোগে বঙ্গদেশে ১৯০২ সনে সর্ব্বপ্রথম শিবাজী-মহোৎসবের সূচনা হয়।

জীবন-সায়াহ্নে

দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল সখারামের নিত্য সহচর। একে ত নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার জীবন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর

দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে তাঁহার শরীরও ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে আবার পুত্র ও পত্নী—উভয়েই তাঁহার মায়া কাটাইয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বেশী দিন তাহাদের বিয়োগ-ব্যথা সখারামকে সহ্য করিতে হইল না,—১৯১২ সনের ২৩এ নবেম্বর (৮ অগ্রহায়ণ ১৩১৯, কার্ত্তিক-শুক্লাচতুর্দ্দশী) দেওঘরের করো গ্রামের বাড়ীতে তিনি অকালে দেহরক্ষা করিলেন।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন সখারামের একজন গুণগ্রাহী। সখারামের মৃত্যুর পর তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়া সুরেশচন্দ্র যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে এই দরিদ্র সাহিত্যসেবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যেন একেবারে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সেই কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর আর ইহজগতে নাই। ইনি দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইনি সংবাদপত্রের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সখারাম বাবু কর্ম্মী ছিলেন—ইনি কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। ইনি মহারাষ্ট্রীয় হইলেও বঙ্গদেশকে এবং বাঙালীকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা সেই ক্ষতিতে মর্ম্মাহত হইয়াছি।...

"সাহিত্যসেবীর চিরন্তন অভিশাপ দারিদ্র্য দেউস্করের চির-জীবনের সঙ্গী ছিল। মৃত্যুশয্যায় সেই দারিদ্র্যের যাতনা ও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার প্রভাতে তিনি

ধরার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছেন। ভগবান্ কর্ম্মক্লান্ত, পথশ্রান্ত পথিকের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া করুণার পরিচয় দিয়াছেন। পরলোকে তিনি তাঁহাকে শান্তি দান করুন।"
('বসুমতী' হইতে ১৩১৯ সালের মাঘ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' উদ্ধৃত)

রচনাবলী

সখারাম তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত জীবনের স্বল্প অবসরটুকু বাংলা-সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি সরল ও বিশুদ্ধ বাংলা লিখিতেন। তাঁহার রচনার মারফতে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ভারতবর্ষীয় শিল্প-বাণিজ্যাদির অধোগতির ইতিহাস—'দেশের কথা' সমধিক প্রসিদ্ধ। এই পুস্তকখানি এদেশবাসীকে ব্রিটিশ শাসনের ও শোষণের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করিলে তেজস্বী সখারাম গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, মামলা শুনানির পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সখারামের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি ; বন্ধনী-মধ্যে উদ্ধৃত সাল-তারিখযুক্ত ইংরেজী প্রকাশ-কাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। **এটা কোন্ যুগ?**। ১৮ ভাদ্র ১২৯৯ (২-৯-১৮৯২)। পৃ. ২৪ + ১ শুদ্ধিপত্র।

"যুগকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার।" "'এটা কোন্ যুগ?' (প্রথম প্রস্তাব) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধের এই

প্রথম প্রস্তাবটি গত বৎসরের কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্য ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রস্তাবটি সংশোধিত এবং স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংপ্রতি তাহা পুনঃ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেল।...বৈদ্যনাথ দেওঘর ১২৯৯ সাল শ্রাবণ।"

২। **মহামতি রানাডে।** ? (২৩ জানুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ৩৬।

"এই প্রস্তাবের অধিকাংশ পূর্ব্বে প্রদীপ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

৩। **ঝাঁশীর রাজকুমার।** ১৩০৮ সাল (২৭ ডিসেম্বর ১৯০১)। পৃ. ৬০।

"এই কাহিনীর সংগ্রহে আমার শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক সুহৃৎ সাতারা-রাজের পারসীনবীশ শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস মহোদয়ের রচিত 'মহারাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের জীবনচরিত' নামক উৎকৃষ্ট মারাঠী গ্রন্থ হইতে আমি অশেষ সাহায্য পাইয়াছি।"

৪। **বাজী রাও।** ১৩০৮ সাল (২৪ জানুয়ারি ১৯০২)। পৃ. ১৬২।

"রাও বাহাদুর কাশীনাথ নারায়ণ সানে বি, এ, (ডেক্যান কলেজ), শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস মহোদয়ের নিকট আমার একান্ত কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ প্রয়োজন। ইঁহাদিগের অক্লান্ত চেষ্টায় মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস সংক্রান্ত দুর্লভ প্রাচীন কাগজপত্র সংগৃহীত না হইলে এই পুস্তক রচনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত।"

৫। **আনন্দী বাঈ।** ? (২৫ মার্চ ১৯০৩)। পৃ. ৯১ + ৵০।

"শ্রীমতী কাশী বাঈ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আনন্দী বাঈর যে অতি প্রকাণ্ড—রয়াল আট পেজী ৪২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ জীবনচরিত রচনা

করিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন। উহার সারসংগ্রহ করিয়া ভূতপূর্ব্ব 'সখী' পত্রিকায় [১৩০৭, মাঘ-চৈত্র ; ১৩০৮, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়] আমি ইতঃপূর্ব্বে কয়েকটি প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। এক্ষণে যথাসম্ভব পরিবর্দ্ধন ও সংশোধনানন্তর তাঁহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম।"

৬। **শিবাজীর মহত্ত্ব**। আষাঢ় ১৩১০ (জুলাই ১৯০৩)। পৃ. ২০।

শিবাজী-মহোৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা শিবাজী-উৎসব-সমিতির দ্বারা বিনামূল্যে বিতরিত। ইহা প্রথমে "কলিকাতা ১৩০৯ সালের শিবাজী মহোৎসব উপলক্ষে রচিত" হয়।

৭। **দেশের কথা**ঃ

১ম ভাগ। ১৩১১ সাল (১৬ জুন ১৯০৪)। পৃ. ৩৪২।

পরিশিষ্ট ভাগ। (২৩ অক্টোবর ১৯০৭)। পৃ. ৩৭।

"জাতীয় মহাসমিতির আরব্ধ কার্য্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে 'দেশের কথা' প্রচারিত হইল। মিঃ উইলিয়াম ডিগ্‌বী সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত দাদা ভাই নৌরোজী ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, ভারতের দারিদ্র্য ও শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান পুস্তকের রচনায় তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থত্রয়—মিঃ ডিগ্‌বীর *The Prosperous British India*, শ্রীযুক্ত নৌরোজীর *Poverty and un-British rule in British India* এবং দত্ত মহাশয়ের *The Economic History of British India* প্রত্যেক ভারত-সন্তানের অবশ্যপাঠ্য। অনেকেই এই সকল গ্রন্থের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসমূহ পাঠ করিবার সুবিধা অতি অল্প লোকেরই আছে। অবকাশের অভাবেও অনেকে এই অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে

পারেন না। যাহারা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের অসুবিধা আরও অধিক। এই সকল শ্রেণীর পাঠকেরা যাহাতে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থনিচয়ের সারমর্ম্ম অবগত হইতে পারেন তজ্জন্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তক সর্ব্বজন-বোধগম্য ভাষায় রচিত হইল। বিবিধ সরকারি রিপোর্ট ও অন্তান্ত গ্রন্থ হইতেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।"—ভূমিকা।

৮। **কৃষকের সর্ব্বনাশ**। ইং ১৯০৪ (২৮ জুলাই)। পৃ. ৯৭-১৪৪।
"দেশের কথা হইতে পুনর্মুদ্রিত।"

৯। **শিবাজীর দীক্ষা**। ভাদ্র ১৩১১ (৭-৯-১৯০৪)। পৃ. ৪০।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "শিবাজী উৎসব" কবিতা সহ। শিবাজী মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শিবাজী-উৎসব-সমিতির দ্বারা বিনামূল্যে বিতরিত।

১০। **শিবাজী**। বৈশাখ ১৩১৩ (১-৬-১৯০৬)। পৃ. ২৪।
শিবাজী-মহোৎসব উপলক্ষে...বিনামূল্যে বিতরিত।

১১। **তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত**। আশ্বিন ১৩১৫ (৪-১০-১৯০৮)। পৃ. ২১০ + ৪০।

১২। **বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?**। আশ্বিন ১৩১৭ (১০-১০-১৯১০)। পৃ. ১২৪।
'ধ্বংসোন্মুখ জাতি'র প্রতিবাদ। "কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর-প্রণীত।"

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা:—মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় সখারামের এমন অনেক প্রবন্ধ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে যেগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার একটি তালিকা দিতেছি :—

১২৯৮,	আশ্বিন-পৌষ	'বেদব্যাস'	কৃষ্ণাবতার কোন্ যুগে ?
১২৯৯,	বৈশাখ	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব
	ভাদ্র-আশ্বিন	'প্রতিভা' ···	জয়দ্রথ বধ (সমালোচনা) ।
		···	শাস্ত্রের অশুদ্ধ অনুবাদ
	অগ্রহায়ণ-চৈত্র	'সাহিত্য'	পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ
	ফাল্গুন	ঐ	বাজীরাও ও মস্তানী
১৩০০,	আষাঢ়, ভাদ্র	'সাহিত্য'	ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী
	ভাদ্র	'ভারতী'	যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল
	পৌষ	'সাহিত্য'	প্রাচীন মহারাষ্ট্র
	মাঘ	'ভারতী'	শঙ্করাচার্য্য
১৩০১,	বৈশাখ, শ্রাবণ,		
	কার্ত্তিক, পৌষ	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র সাহিত্য
	জ্যৈষ্ঠ	ঐ	শূদ্রের আলোচনা
	মাঘ	'ধরণী'	মনুপ্রোক্ত সনাতন ধর্ম্ম
	ফাল্গুন	ঐ	শিবাজীর স্বার্থত্যাগ
১৩০২,	বৈশাখ	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র সাহিত্য
	শ্রাবণ-আশ্বিন	ঐ	নারায়ণ রাওএর বধর
	আশ্বিন	ঐ	আফ্জল খাঁর অভিযান
	অগ্রহায়ণ	'ভারতী'	বৈদিক আলোচনা
১৩০৩,	আষাঢ়	'ভারতী'	সুরাপান (শাস্ত্রীয় বিচার)
১৩০৪,	বৈশাখ	'ভারতী'	বালুকেশ্বর (১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বিলাতযাত্রা
	পৌষ	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ

১৩০৫, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ,		
ভাদ্র, চৈত্র	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র সাহিত্য
অগ্র., ফাল্গুন	ঐ	সমর্থ রামদাস স্বামী
১৩০৬, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র সাহিত্য
ভাদ্র	'ভারতী'	কিষ্কিন্ধ্যা
আশ্বিন	'সাহিত্য'	আওরঙ্গজেবের ধর্ম্মভাব
চৈত্র	'ভারতী	বঙ্গীয় শব্দোৎপত্তি রহস্য
১৩০৭, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়
আষাঢ়	'সাহিত্য-সংহিতা'	ভাস্করাচার্য্য
শ্রাবণ	ঐ	ব্রহ্মদেশের আচার ব্যবহার
কার্ত্তিক	'সাহিত্য'	ঐতিহাসিক কাগজপত্র
মাঘ	'ভারতী'	ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা
১৩০৮, জ্যৈষ্ঠ	'প্রদীপ'	গ্রীকজাতির স্বাধীনতালাভ
ভাদ্র, পৌষ	'সাহিত্য-সংহিতা'	আন্ধ্র সাহিত্য
১৩০৯, জ্যৈষ্ঠ	'বঙ্গদর্শন'	ভারতে আব্দালী
শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ	'প্রদীপ'	ভূষণ
১৩১২, শ্রাবণ	'সাহিত্য'	শিবাজী প্রসঙ্গ
১৩১৩, ভাদ্র	'সাহিত্য'	বোপদেবের পরিচয়
১৩১৫, ফাল্গুন	'সাহিত্য'	রাজা কৃষ্ণ রাও খটাওকর
চৈত্র	'বঙ্গদর্শন'	প্রাচীন ভারতে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক
১৩১৬, শ্রাবণ	'সাহিত্য'	মালবে মহারাষ্ট্র অধিকার
ফাল্গুন	'বঙ্গদর্শন'	গুজরাথে মহারাষ্ট্র অধিকার

১৩১৭, বৈশাখ-আষাঢ়	'বঙ্গদর্শন'	ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ
বৈশাখ	'আর্য্যাবর্ত্ত'	বাজী রাও ও মস্তানী (বাজী রাওয়ের কলঙ্কমোচন)
শ্রাবণ	ঐ	সিদ্ধিদাতা গণেশের বয়স
১৩১৮, জ্যৈষ্ঠ	'সাহিত্য'	পৃথ্বীরাজ-রাসো
আষাঢ়	ঐ	ভারতে শক-শোণিত
মাঘ	ঐ	মহারাষ্ট্রে শক-শোণিত

সখারাম ও বাংলা-সাহিত্য

প্রাঞ্জলতা, সহজবোধ্যতা, প্রসাদগুণ ইত্যাদি যে সকল গুণে রচনা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়, সখারামের রচনাবলীতে তাহা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'দেশের কথা' হইতে উদ্ধৃত রচনাংশসমূহে ইহার প্রমাণ মিলিবে—

"ভারতীয় কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি বৃটিশ শাসনের —ইংরাজের প্রদত্ত পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রধানতম সুফল। এরূপ অনুষ্ঠান এদেশে পূর্ব্বে ছিল না। সুতরাং, ইহা যে-দেশের সামগ্রী, সেই দেশের রীতির অনুকরণে ইহাকে পরিচালিত করিতে না পারিলে, সুফললাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রজার রাজনীতিক আন্দোলনে যে আশু সুফল-লাভ হয়, তাহার কারণ এই যে, তত্রত্য প্রজাসমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত এই সকল আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করে। আমাদের দেশে অজ্ঞতার জন্য অনেকেই এই সকল আন্দোলনের সংবাদ পর্য্যন্ত রাখেন না, সমাজের সকলে জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যে সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কাজেই ক্ষমতাপ্রিয় যথেচ্ছাচার

রাজপুরুষেরা আন্দোলনকারীদিগের মুষ্টিমেয়তা বা সংখ্যার অল্পতা অনুভব করিয়া প্রতীকারে ঔদাস্ত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতীয় মহাসমিতির অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন হয় না, আমাদিগের অকর্ম্মণ্যতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।

যদি জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি প্রকাশ পায়, এতদুপলক্ষে যদি সমগ্র সমাজ আমূল আলোড়িত হয়, রাজপুরুষেরা যদি বুঝিতে পারেন যে, মহাসমিতির প্রার্থনাসমূহ সমগ্র দেশবাসীর অনুমোদিত, সে প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে ভারতীয় সমাজের অন্তস্তল পর্য্যন্ত মর্ম্মবেদনায় বিক্ষোভিত হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে তাঁহারা কংগ্রেসের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে অবশ্যই আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। এই কারণে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া, দেশের বর্দ্ধনশীল দুঃখদারিদ্র্যের কথা, আমাদের শোচনীয় অধোগতির কথা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া, কংগ্রেসের প্রতি সকলের অনুরাগ-বর্দ্ধনপূর্ব্বক এই শুভানুষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধি করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর অবশ্যকর্ত্তব্য। দেশের প্রত্যেক সুসন্তানের এই কর্ত্তব্যভার স্কন্ধে গ্রহণ করা উচিত। ১৮৩৩ সালের পার্লামেণ্টের প্রণীত বিধানে ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণা-পত্রে আমরা যে সকল অধিকার পাইয়াছি, যে সুশাসনের আশ্বাস পাইয়াছি, তাহা দেশের অনেকেই সম্যক্ অবগত নহেন। তাই আমরা সেই সকল অধিকারে বঞ্চিত হইয়া অবনতির খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি। বৃটিশ ভারতের সকল প্রজা, অতি নিম্নশ্রেণীর প্রজা পর্য্যন্ত, যাহাতে আমাদের রাজদত্ত প্রকৃত অধিকারের বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারে, সে অধিকারের পূর্ণফললাভের

জন্য যাহাতে সকলে ব্যাকুল হইয়া উঠে, দেশের প্রত্যেক সুসন্তানকে সে চেষ্টা করিতে হইবে। অজ্ঞতার জন্যই এত দিন আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু বহুদিন পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না, সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।...বাঙ্গালায় ছয় কোটী যাটি লক্ষ (এক্ষণ প্রায় ৮ লক্ষ) লোকের দ্বারা যে কোনও কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোক-শিক্ষা নাই।' ["লোকশিক্ষা" : 'বঙ্গদর্শন,' অগ্রহায়ণ ১২৮৫]

এক্ষণে যাহাতে সে অজ্ঞতার নিরাকরণ হয়, দেশের আপামর জনসাধারণে আপনাদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে, জাতীয় মহাসমিতির সহিত প্রতিকার-প্রার্থনায় সকলে সাগ্রহে যোগদান করিতে পারে, রাজপুরুষেরা যাহাতে মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারী বলিয়া আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে না পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই সুমহান্ পবিত্র কর্ত্তব্য-সাধনে উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া যাঁহারা জাতীয় মহাসমিতির প্রতি উপহাস বা উপেক্ষা-প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা দেশের শত্রু ও সমাজের শত্রু বলিয়া চিরকাল সুধী-সমাজের ঘৃণার ভাজন হইবেন।

বৃদ্ধ ভারতহিতৈষী হিউম সাহেব জাতীয় মহাসমিতির বিগত অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবাসীকে যে সারগর্ভ উপদেশ

প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন,—

'তোমরা কি মুহূর্ত্তের জন্য মনে কল্পনা কর যে, কোন রাজ-শক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাদিগকে রাজনীতিক অধিকার প্রদান করিবেন? যে সকল অধিকার তোমাদিগকে প্রদান করিলে শক্তিপ্রিয় শাসকদিগের শক্তির হ্রাস ঘটে, ন্যায়ের হিসাবে তোমাদের সহস্র দাবী থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট কি সে সমুদায় সহজে ছাড়িবেন? যে ক্ষমতা ত্যাগ করিলে রাজার স্বদেশবাসিগণ উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইবেন, রাজা কি তাহা বিনা বাক্য-ব্যয়ে ত্যাগ করিবেন? তোমরা কি স্বপ্নেও ভাব যে, ঔদারনীতিক অথবা যে কোন গবর্ণমেণ্টই হউক, শুদ্ধ ন্যায়ের অনুরোধে তোমাদিগের দুঃখ-বিমোচনে অগ্রসর হইবেন? এরূপ অলীক চিন্তায় আত্ম-বঞ্চনা করিও না। ভারতে এবং বিলাতে অবিশ্রান্ত ভাবে, অদম্য অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে আন্দোলন করিতে হইবে, বিলাতেই আন্দোলনের মাত্রা অধিক হওয়া আবশ্যক। এইরূপে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গবর্ণমেণ্টকে যদি ক্রমাগত উত্ত্যক্ত ও জ্বালাতন করিতে পার, তবেই তোমাদিগের ইষ্টসিদ্ধির পথ প্রসারিত হইবে। রাজনীতিক আন্দোলনের সুফলে আমার অবিশ্বাস নাই, কিন্তু তোমরা যেরূপ ঔদাসীন্য সহকারে আন্দোলন কর, তাহাতে কিছুই হইবে না। আন্দোলনে একাগ্রতা অবলম্বন কর, তোমাদিগের অর্থ, সামর্থ্য সমস্তই জাতীয় উন্নতিকল্পে উৎসর্গ কর, ভারতে সংবৎসর-ব্যাপী মহাসমিতির আন্দোলন প্রদীপ্ত রাখ, বিলাতের প্রত্যেক নগর

ও গ্রাম তোমাদিগের প্রার্থনার ধ্বনিতে মুখরিত কর, কর্তৃপক্ষের ভ্রূভঙ্গীতে ভীত হইও না, প্রাণপণে ইংরাজ জাতির হৃদয়ে এই ধারণা অঙ্কিত কর যে, তোমরা যাহা ধরিয়াছ, তাহা কিছুতেই ছাড়িবে না, তোমাদিগের প্রার্থনার পূরণ না হইলে, ইংরাজ জাতিকে এক দিনের জন্যও বিশ্রাম দিবে না। জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন কর যে, তোমরা সময়, অর্থ, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পাত করিয়া সঙ্কল্প-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কার্য্য দ্বারা আপনাদিগের যোগ্যতা প্রতিপাদন কর। দেখিবে, গ্রীষ্মাগমে তুষারের ন্যায় তোমাদিগের উন্নতি-পথের কণ্টক তিরোহিত হইয়াছে।

'ভারতের সংবাদপত্রসমূহকে প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের দোষ কীর্ত্তন করিতে দেখি। গবর্ণমেণ্টের অনেক দোষ আছে সত্য, কিন্তু তোমাদিগের নিজেব দোষই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তোমরা নিজে কর্ত্তব্য পালন করিবে না, স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর উন্নতিকল্পে সর্ব্বস্ব-পণে আত্ম-বিসর্জ্জন করিবে না, শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের দোষ দিলে চলিবে কেন? তোমাদিগের উন্নতি তোমাদিগেরই উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা সমস্ত সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত মতভেদ বিস্মৃত হও, পরস্পরকে বিশ্বাস কর, ভণ্ডামি ও কপটতা পরিত্যক্ত হউক, সকলে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, রাত্রিদিন ভুলিয়া এক মনে, এক ধ্যানে উদ্দেশ্য-সংসাধন-পথে অগ্রসর হও, অবিচলিত, অক্ষুব্ধ ও অসন্দিগ্ধচিত্তে কার্য্যে ব্যাপৃত হও, দেখিবে, আশু তোমাদিগের কামনা পূর্ণ হইবে। নচেৎ এক্ষণে তোমাদিগের

আন্দোলনে যেরূপ একাগ্রতা ও আন্তরিকতার অভাব প্রবল রহিয়াছে, তাহা থাকিলে কিছুই লাভ হইবে না।

'আবার বলি, গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিলে, তোমাদের নিজের দোষ চাপা পড়িবে না; অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টের ন্যায় তোমাদের গবর্ণমেণ্টও আপনাকে সর্ব্ববিষয়ে সমধিক জ্ঞানবান্ ও শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা ইচ্ছা করিয়া কখনই তোমাদিগকে এক তিলার্দ্ধ অধিকার প্রদান করিবেন না, বরং উত্তরোত্তর প্রদত্ত অধিকারের সঙ্কোচে প্রয়াস পাইবেন। যে দেশে প্রজাশক্তি হীনবল, সে দেশে রাজশক্তির এইরূপ ব্যবহার ঘটিয়াই থাকে। রাজশক্তির এরূপ অত্যাচার-নিবারণে প্রজাসাধারণের সর্ব্বদা চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রজারা যদি রাজার অবিচার বন্ধ করিতে না পারে, তবে সে দোষ প্রজাদিগের—রাজার নহে, এ কথা স্মরণ রাখিও।'

ফলতঃ আমরা অবনতির চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মিঃ ডিগ্‌বী মহোদয় গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীর দৈনিক আয় গড়ে জন প্রতি দুই আনা ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উহা ছয় পয়সায় পরিণত হয়। অধুনা উহা দৈনিক তিন পয়সায় দাঁড়াইয়াছে! অন্নপূর্ণার সন্তানদিগের আর কি দুরবস্থা হইতে পারে! অতএব আর ঔদাস্য প্রকাশের সময় নাই। ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরুষদিগের কুটিলতায় আমরা যে বৈধ অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য সময় থাকিতে বদ্ধপরিকর ভাবে চেষ্টা না করিলে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে। মিঃ ডিগ্‌বী বলিয়াছেন,—

"India is not far from collapse."

সংশোধন ও সংযোজন

৮ম খণ্ড

চরিতমালা নং ৮৩ঃ ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন

পৃ. ৪৫, পংক্তি ১৬ঃ "তিনখানি" স্থলে "চারিখানি" পড়িতে হইবে।

৪৯, ৫ম পংক্তিটি এইরূপ হইবে :—"লাভ করিয়াছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সাহিত্য' (১৩০০, ১৩০৯), 'প্রদীপ' (১৩০৮-১০) ও 'জন্মভূমি'র (১৩০৮-১০, ১৩১৩) উল্লেখ করা"

৪৯, পংক্তি ৭ :—"তিনখানি" স্থলে "চারিখানি" পঠিতব্য।

৪৯, ৯ম পংক্তির পূর্ব্বে এই অংশ বসিবে :—১। নীতিপাঠ (পাঠ্য)। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০। পৃ. ১১৪।

৪৯, পংক্তি ১৩ :—"শিক্ষা এবং উপদেশ" স্থলে "উপদেশ ও শিক্ষা" পড়িতে হইবে।

চরিতমালা নং ৮৪ঃ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পৃ. ৮, ৭ম পংক্তির পর এই প্যারা বসিবে :—

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন—"সময়ে সময়ে ভুবনচন্দ্র, কিছু কিছু 'হুতোমে' লিখিয়া দিতেন। স্বভাব-সিদ্ধ ঔদার্য্য-গুণে 'সিংহ' সেগুলিকে সমাদর-সহকারে গ্রহণ করিতে, কুণ্ঠিত কি সঙ্কুচিত হইতেন না।..."দুর্গা-বিজয়া"-বিষয়ে সংগীত সং-রচিত করিতে করিতে উপদেশ দিয়া—'সিংহ' বাবু, একদা বিচারালয়ে গমন করিলেন। ওদিকে ভুবনচন্দ্রও, আদিষ্ট গান রচনা করিলেন। আদালত হইতে প্রত্যাগত হইবামাত্রই গানটি তাঁহার দর্শন-পথে পতিত হইল। 'সুর' ও কতক কতক 'ভাব' বা 'পদ'